ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনরগঠন

আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনরগঠন

আবদুল মান্নান তালিব

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. আবদুল খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২০১

২য় প্রকাশ

রবিউল আউয়াল	১৪২৯
চৈত্র	১৪১৪
মার্চ	২০০৮

বিনিময় মূল্য ঃ ১৩০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISLAMI JIBAN-O-CHINTAR PUNARGATHAN by Abdul Mannan Talib. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 130.00 Only.

পূর্বকথা

ইসলামী চিন্তার ভিত্তিতে যে জীবন গড়ে ওঠে সেটাই ইসলামী জীবন। আর ইসলামী চিন্তার মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহ ও রসূলের দেয়া পথ-নির্দেশনা–কুরআন ও হাদীস। আজো এই কুরআন ও হাদীস অপরিবর্তিত আকারে মুসলমানদের কাছে সংরক্ষিত আছে।

মুসলমানরা সঠিক ইসলামী জীবন যাপন করতে চায়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর উৎসর্গীতপ্রাণ সাহাবায়ে কেরাম যে স্বচ্ছ, সুন্দর ও শান্তিময় ইসলামী জীবন যাপন করেছিলেন সেই আদর্শ জীবনই মুসলমানরা কামনা করে। সে জীবন ছিল রসূলের নিজের হাতে গড়া। একটি সম্পূর্ণ কুফরী ও মুশরিকী সমাজ থেকে তাঁদের উত্তরণ ঘটেছিল একটি সম্পূর্ণ ইসলামী সমাজে। এজন্য রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কি কাজ করেছিলেন?

এক : তিনি একটি ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করেছিলেন। একটি আকীদা-বিশ্বাস, একটি দৃষ্টিভংগী ও দৃষ্টিকোণ গড়ে তুলেছিলেন। তিনি এমন একটি চিন্তার রাজ্য তৈরী করেছিলেন যে রাজ্যের অধিবাসী ছিল মুসলমান। এ রাজ্যের চৌহদ্দী ও দূর দিগন্ত সম্পর্কে মুসলমানদের স্পষ্ট ধারণা ছিল। কোন্‌টা ইসলামী চিন্তা এবং কোন্‌টা অনৈসলামী চিন্তা, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কোন্ বিষয়টিকে কিভাবে দেখতে হবে, জীবনের বিভিন্ন প্রশ্নে কোন্ বিষয়কে কি ভাবে গ্রহণ করতে হবে– এসম্পর্কে তাঁদের ধারণা সুস্পষ্ট ছিল। মোটকথা জীবন চিন্তার কোন ক্ষেত্রেও তাঁদের মধ্যে অনৈসলামী ভাবধারার কোন স্পর্শও ছিলনা।

দুই : তিনি একটি সুদক্ষ ও হক পরস্ত জনবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। এই জনগোষ্ঠীর ন্যায়–অন্যায়বোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর। সত্যকে ধারণ করা এবং অসত্যকে শুধু বর্জন করাই নয়, দুনিয়ার বুক থেকে তাকে উৎখাত করার ব্যাপারেও তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এই গোষ্ঠীর প্রত্যেক ব্যক্তিই ছিলেন নিজের জায়গায় মানবিক ও ইসলামী মূল্যবোধের মূর্ত প্রতীক এবং সত্য ও ন্যায়ের নির্ভীক সৈনিক।

তিন : তিনি একটি আদর্শ সমাজ গঠন করেছিলেন। এই সমাজে মানবিক গুনাবলীর পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। মানুষ চিরকাল যে ধরনের সমাজ গঠন করার

স্বপ্ন দেখে এসেছে এবং আজো দেখে থাকে এটি ছিল তেমনি একটি উন্নত ও পূর্ন ইসলামী গুনাবলী সম্পন্ন মানবিক সমাজ।

চার ঃ তিনি একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রত্যেকটি মানুষের মৌলিক অধিকার সে রাষ্ট্রে পুরোপুরি সংরক্ষিত ছিল, যা সেই রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আজো সম্ভব হয়নি এবং কোনদিন হবেও না। এ ব্যাপারে মানুষ শুধু বড় বড় বুলিই আওড়াতে থাকবে কিন্তু বাস্তবে কোনদিন তা কার্যকর হবেনা। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রত্যেকটি নাগরিককে তার ন্যায্য পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে দিয়েছিল। জুলুম ও নিপীড়নের কণামাত্রও সেখানে ছিল না, যা আজকের যুগের মানুষের কাছে একেবারেই কল্পনাতীত। শুধু এখানেই শেষ নয়, সারা দুনিয়ার কোথাও মানবতার ওপর জুলুম-শোষণ বরদাশ্‌ত করতেও সে রাষ্ট্র ব্যবস্থা রাজী ছিলনা। কোন পরাশক্তি হবার স্বপ্ন না দেখে, অন্যের ন্যায় সংগত অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে এবং পররাজ্য দখলের লোভী মানসিকতায় আচ্ছন্ন না হয়ে সে রাষ্ট্র ছিল সারা দুনিয়াব্যাপী জুলুম, শোষণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও সোচ্চার কন্ঠ।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে এভাবেই ইসলামী জীবন ও চিন্তা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। রসূলের নবুওয়াতী শাসন এবং তাঁর সাহাবাগণের খেলাফতী (খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত) শাসনের পর সারা মুসলিম জাহানে যে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন হয় সেখানেও প্রচলিত রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে তার পার্থক্য ফুটে উঠেছিল। সেখানে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বাদশাহ ছিলেননা বরং ছিলেন আল্লাহ। আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ছিলেন শারে' (شارع) তথা সর্বোচ্চ আইন প্রণেতা। মুসলমানদের হাজার বছরের রাজতান্ত্রিক শাসনে ধীরে ধীরে ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি থেকে বিচ্যুতি বেড়ে গেলেও মূলগতভাবে ইসলামী চিন্তা ও জীবনধারার সাথে তুলনামূলকভাবে মুসলমানদের যোগ ছিল বেশী। কিন্তু বিগত তিন চারশো বছরে পাশ্চাত্য চিন্তা ও সভ্যতার উত্থান ও বিস্তার মুসলমানদের পতনশীল চিন্তা ও জীবনধারায় বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে নিয়ে বিশ শতকের প্রথম দিকের অর্ধ শতকের বেশী সময় মুসলিম চিন্তায় এক ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে। এ মহাবিপর্যয়ের রেশ এখনো চলছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো মুসলিম দেশে ইসলামী আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। এর মাধ্যমে ইসলামী পুনরুজ্জীবনের কাজ চলছে।

এখন ইসলামী জীবন দর্শন ও চিন্তাদর্শের ভিত্তিতে মুসলমানদের চিন্তাদর্শন ও জীবনধারা পুনরগঠনের সময় এসে গেছে। এ গ্রন্থে আমি যে নিবন্ধগুলোর অবতারণা করেছি এগুলো মূলত এ প্রচেষ্টারই একটি অংশ। এর অধিকাংশ নিবন্ধই বিগত ১৯৮১-৮২ সাল থেকে ১৯৮৬-৮৭ সালের মধ্যে মাসিক পৃথিবীর সম্পাদকীয় ও দৈনিক সংগ্রামের উপ-সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এর মধ্যে পাঁচ ছয়টি নিবন্ধ ১৯৬৯-৭০ সালের মাসিক পৃথিবীর সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত হয়।

আবদুল মান্নান তালিব
১০-২-৯০

সূচীপত্র

মিল্লাতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ

জ্ঞান—গবেষণা

আন্ত ধর্মীয় সম্পর্ক

আধুনিক সভ্যতার সংকট

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১
ঈমানের হেফাজত অপরিহার্য

মুমিনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে তার ঈমান। ঈমান মূলত আল্লাহর দান। দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ ঈমানের সম্পদ থেকে বঞ্চিত। অথচ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও যোগ্যতার দিক দিয়ে তাদের অনেককে অসাধারণই বলা যায়। কিন্তু নিজেদের যোগ্যতার বলে তারা ঈমানের সম্পদ লাভ করতে পারেননি। নিজের ইচ্ছা, আকংখা ও প্রচেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্য ও তৌফিক মুমিনের সহযোগী হয়েছে, তাই সে ঈমানের মূল্যবান সম্পদ লাভে সক্ষম হয়েছে। তার ওপর আবার আমরা যারা বংশগত মুসলমান তাদের জন্য এ সম্পদটি আরো সহজলভ্য হয়েছে। ঠিক সেই বাংলা প্রবাদটির মতোঃ গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। অর্থাৎ কোন অনুসন্ধান, প্রচেষ্টা, সাধনা ছাড়াই অনায়াসে অল্পায়াসে এটি এসে গেছে আমাদের হাতের মধ্যে। বাপ–দাদাদের কাছ থেকে আমরা এটি পেয়েছি মীরাস হিসেবে। তারপর একে সামান্য নবায়ন করে নিয়েছি মাত্র।

অনায়াসে ও অল্পায়াসে পাওয়ার কারণে এর কদর করতে আমরা জানিনা। একে সঠিক অর্থে জীবন্ত ও তরতাজা রাখার চেষ্টা করিনা। এর গোড়ায় পানি সেচ করে এর যথাযথ বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও চালাইনা। বরং উল্টো অহরহ আমরা এমন সব কাজ করে যাই যা আমাদের ঈমানের পরিপন্থী। এসব ঈমান বিরোধী কর্মকাণ্ডের ফলে আমাদের ঈমান আহত হয় এবং এ ধরণের কাজ দিনের পর দিন করে যাওয়ার ফলে একদিন আমাদের ঈমান নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এরপর এমন একদিন আসে যখন ঈমান বিরোধী আহবান আসে এবং তাতেও আমরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে সাড়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করিনা। এভাবে ঈমানের সম্পদের হেফাজত না করার কারণে একদিন এ মহামূল্যবান সম্পদ আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেবার সম্ভাবনাও দেখা দেয়।

আধুনিক চিন্তাধারা, যুগ–পরিবেশ এবং এই চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসার পদ্ধতি আমাদের এ ব্যাপারে সজাগ করে দেয়। আধুনিক বিশ্বে মানুষ এমন এক পর্যায়ে ও পরিবেশে পৌঁছে গেছে যেখানে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হচ্ছে যুক্তি। এক সময় মানুষ যুদ্ধাস্ত্রকে ভয় করতো। কিন্তু আজকের যুগের মতো এতো ভয়াবহ যুদ্ধাস্ত্র তখন ছিলনা। তবুও এই যুদ্ধাস্ত্র ভীতি আজকের মানুষের মনের সামান্য একটি সূতোর মতো সূক্ষ্ম ও দুর্বল চিন্তাকেও এদিক

থেকে ওদিকে নড়াতে পারেনা। কিন্তু যুক্তির সামান্যতম ফুৎকারে বিরাট পাহাড় নড়ে যাচ্ছে, বিশাল সাগরে পর্বত প্রমান তরংগ সৃষ্টি হচ্ছে। হাদীসে এই সময়টিকে কিয়ামতের পূর্ববর্তী এমন একটি সময় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যখন সকালের ঈমানদার সন্ধ্যে বেলায় কাফেরে রূপান্তরিত হয়ে যাবে (يصبح مومنا ويمسى كافرا) । অর্থাৎ যুগটি হবে সম্পূর্ণ যুক্তিবাদিতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক যুগ। কিন্তু যুক্তিবাদিতার পেছনে শুধু বুদ্ধি একাই কাজ করেনা। এর পেছনে কাজ করে ইতিহাস, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, বিজ্ঞান এবং দুনিয়ার অন্যান্য বিভিন্ন শাস্ত্র ও জ্ঞান।

ঈমানের বিরুদ্ধে যে যুক্তিবাদিতা এগিয়ে আসে সেও এইসব শাস্ত্র ও জ্ঞান থেকে শক্তি সঞ্চয় করে এবং এখান থেকে অস্ত্র কিনে নেয়। কিন্তু এই জ্ঞান অপূর্ণাংগ এবং এই অস্ত্র ভোঁতা। তাই সত্যিকার মুমিন তার ঈমানকে এই তথাকথিত যুক্তিবাদিতার অনেক ওপরে স্থাপন করতে সক্ষম হয় এবং এর ওপর বিজয় লাভ করে। মুমিনের এই ঈমানী শক্তিকে হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে– اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰهِ –'মুমিনের বুদ্ধি ও বিচারশক্তিকে ভয় কর, কারণ সে দেখে আল্লাহর আলোকে।' তাই আজকের যুগে নিজের ঈমানকে সংরক্ষিত রাখতে হলে মুমিনকে এই তথাকথিত যুক্তিবাদিতার ভোঁতা অস্ত্রগুলো সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে, এই অস্ত্রগুলো চিনতে হবে, এগুলোর ধার পরীক্ষা করে নিতে হবে।

নিজের ঈমানকে পাকাপোক্ত করার জন্য সর্ব প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের মধ্যে কোন অভাব বা গলদ থাকলে সেই ফাঁক দিয়ে কুফরী অনুপ্রবেশ করবে। যেমন ধরুন ইসলামের নবী ও মুজাদ্দিদ সম্পর্কে যদি সঠিক জ্ঞান না থাকে তাহলে সেই অজ্ঞানতার ফাঁক দিয়ে নতুন নবী প্রবেশ করতে পারে। পূর্ণাংগ নবী না হলেও 'ছায়ানবী' হিসেবেও কোন ভণ্ড নবীর আবির্ভাব হতে পারে। আর একজন কাঁচা ও আধকাঁচা ঈমানদার মুসলমান তার শিকারে পরিণত হতে পারে। আবার মুজাদ্দিদ যেমন মেহদীর ছদ্মাবরনেও কোন ব্যক্তি নিজের জাল–নবুওয়াতের জাল ছড়িয়ে দিতে পারে আর কাঁচা ও আধকাঁচা ঈমানের অধিকারী মুসলমানরা তার জালে নিজেদের পা জড়িয়ে ফেলতে পারে।

আমাদের এই উপমহাদেশে বিগত প্রায় একশো বছর থেকে এই জাল ও ভণ্ড নবুওয়াতের কাজ কারবার কোথাও কোথাও বেশ চলছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের দেশের প্রতিটি মুসলমানকে সতর্ক হতে হবে। বুখারী ও মুসলিমের সহী হাদীসে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে ঃ لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ

-'আমার পরে আর কোন নবী নেই।' কোন প্রকারের কোন নবী নেই, সে ছায়া নবী হোক বা অন্য যে কোন ধরণের নবী। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াতকে এমন একটি দালানের সাথে তুলনা করেছেন, যে দালানটি নির্মীয়মান ছিল এবং তার দেয়ালে তখন আর মাত্র একটি ইঁটের জায়গা খালি ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আমিই সেই ইঁট।" অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের সাথে সাথেই সেই দালানটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে গেছে। তিনিই শেষ নবী। তাঁরপর আর কোন প্রকারের কোন নবী নেই। এ ব্যাপারে বিশ্বাসের মধ্যে সামান্যতম হেরফের হলেই মুসলমানের ঈমানে ফাটল ধরার সম্ভাবনা রয়েছে।

কাজেই মুসলমানদের এ ব্যাপারে সব সময় সজাগ থাকতে হবে। তাদের ঈমানকে হেফাজত করতে হবে সব রকমের প্রতারণা, জালিয়াতি ও মূর্খতা থেকে। মুসলমানের অবস্থা যেন এমন না হয় যে, সে মনে করছে তার মধ্যে ঈমান আছে অথচ কার্যক্ষেত্রে অর্থাৎ মৃত্যুর পর তার মধ্যে দেখা গেলো শুধু অন্ধকার, তাহলে দুনিয়ায় এর চাইতে বড় অসাফল্য তার জন্য আর কিছুই হবেনা।

২
চিন্তা ও কর্মের ঐক্য ও পুনরগঠনে মিল্লাতের দায়িত্ব

চিন্তা ও কল্পনার জগতে মানুষের স্বাধীনতা অবাধ। কল্পনার পাখা মেলে মানুষ পাখির মতো যেদিকে ইচ্ছা উড়ে যেতে পারে। তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। এমনকি তার এই রক্ত–মাংসের দেহটিকে যখন লৌহপিঞ্জরে বন্দী রাখা হয় তখনো তার চিন্তা ও কল্পনার পংখীরাজটি সাত আকাশের সীমা পেরিয়ে দূরে বহু দূরে উড়ে যেতে পারে। তার স্বাধীনতা কোন বাধা মানে না। কর্মের ক্ষেত্রেও মানুষের স্বাধীনতা প্রায় একই পর্যায়ভুক্ত। মানুষ নিজের ইচ্ছামতো যে কোন কাজ করতে পারে। তবে তার জানার সাথে কাজ করার রয়েছে নিবিড়তম সম্পর্ক। যা বা যতটুকু সে জানে তাই বা ততটুকুই সে করতে পারে। জানার বাইরে কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

অন্যদিকে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সমাজে মিলেমিশে বাস করতে বাধ্য। মানুষের কোন একটি কাজও তার নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বিভিন্ন পর্যায়ে তা অন্যকে প্রভাবিত করে। এ ক্ষেত্রে সমাজ জীবনের স্বাভাবিক চাহিদা অনুযায়ী মানুষের নিজের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতাকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হয় যাতে অন্যের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না হয়। নিজের কাজ করতে গিয়ে যাতে অন্যেরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে মানুষকে অবশ্যি নজর রাখতে হয়। তাইতো বিস্রস্ত চিন্তার অধিকারী বা চিন্তাবিহীন ও দায়িত্বহীন লোকদের সাহায্যে কোন সুষ্ঠু সমাজ গঠনের আশা করা যেতে পারে না। চিন্তাধারার বহুমুখীনতা এবং বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হবার পথে বাধা দেয়া এবং তাকে কয়েকটি বাঁধা ধরা পথে এগিয়ে যেতে অভ্যস্ত করাই হচ্ছে উন্নত সমাজ জীবনের দাবী। চিন্তা ও কর্মের ওপর এ বিধিনিষেধ বাইর থেকে আরোপ করা যায় না। তাহলে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। মানুষের ইচ্ছা, খায়েশ, অনুভূতির মধ্যে ভেতর থেকে এর দাবী সৃষ্টি করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি এটাকে নিজের কল্যাণ মনে করে যেন স্বেচ্ছায় একে গ্রহণ করে নেয় এবং একে একটি পবিত্র দায়িত্ব ভেবে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। এই দায়িত্বের অনুভূতি ও এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনই হচ্ছে আসলে এ সমাজের ভিত্তি। যতদিন পর্যন্ত এ ভিত্তি মজবুত থাকে এবং এর মধ্যে কোন খুঁত দেখা দেয়না ততদিন এ সমাজ শক্তিশালী থাকে এবং এর অস্তিত্বও থাকে অপরিবর্তিত। কিন্তু এই ভিত্তিতে চিড় ধরলে বা খুঁত দেখা

দিলে এ সমাজের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেয় এবং পতন শুরু হয়। চিন্তা ও কর্মের ওপর এ বিধিনিষেধকে আধুনিক পরিভাষায় বলা হয় জীবন দর্শন আর ধর্মের পরিভাষায় একে বলা হয় আকায়েদ বা আকিদা-বিশ্বাস। কাজেই আকীদা-বিশ্বাসকে মনে প্রাণে গ্রহণ করা, মেনে নেয়া এবং অন্তরের অন্তস্থলে তাকে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা একটি সমাজের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

একটি শক্তিশালী ও উন্নত সমাজের লোকেরা সেই সমাজের আকীদা বিশ্বাসকে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরে থাকে। এর ওপর তাদের ঈমান হয় অত্যন্ত পাকাপোক্ত। যে কোন অবস্থায় এবং যে কোন পরিবেশে তারা নিজেদের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের ওপর অবিচল থাকে। এই মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসই হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধের উৎস। জাতীয় চরিত্র এখান থেকেই গড়ে ওঠে। এরি মানদণ্ডে ব্যক্তি ও সমাজ চরিত্র পর্যালোচনা করা যায় এবং তাকে ভালো মন্দ ও বৈধ অবৈধের খাতে বিভক্ত করা যায়। এভাবে দেখা যায় যখন কোন সমাজে ভালো ও সদগুণের অধিকারী লোকের সংখ্যা বেড়ে যায়, সে সমাজ উন্নতি লাভ করতে থাকে। বিপরীত পক্ষে মন্দ ও অসৎ চরিত্রের লোকের সংখ্যা বেড়ে গেলে সমাজের পতন ঘটে এবং তার ধ্বংস হয়ে ওঠে অনিবার্য।

এ দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে, চিন্তার ঐক্য ও সমতা, যা জীবন দর্শনের মধ্যে রূপ লাভ করে, মানব সমাজের এবং একটি জাতি ও মিল্লাতের জন্য তেমনি অপরিহার্য যেমন ফুসফুসের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস ও বাতাস। উনবিংশ শতাব্দীর পর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল বন্যায় যখন আমাদের সামাজিক মূল্যবোধগুলো একে একে ভেসে যেতে শুরু করে তারপর থেকে নেমে আসে আমাদের জীবন দর্শন ও আকীদা বিশ্বাসের ওপর মারাত্মক বিপর্যয়। ইসলামী মিল্লাতের মধ্যে চিন্তা ও কর্মের সমতা এবং আকীদা-বিশ্বাস ও জীবন দর্শনের ঐক্য রীতিমতো দর্শনীয় বস্তু হয়ে ওঠে। ইসলামী জীবন দর্শন ও আকীদা-বিশ্বাস বিরোধী এমন কোন চিন্তা নেই যা মিল্লাতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি এবং দ্রুত শাখা বিস্তার করেনি।

এ ব্যাপারে অবশ্যি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বিশিষ্ট অবদান রেখেছে এবং এর মধ্যে তাদের স্বার্থও নিহিত। ইসলামী মিল্লাতের মধ্যে যত বেশী চিন্তার নৈরাজ্য সৃষ্টি করা যায় ততই তাদের সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা নিবৃত্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়া কুরআন আর একটি দিকও তুলে ধরেছেঃ وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ – البقره : ١١٨ -তুমি

ইয়াহুদী ও খ্রীস্টানদের মত ও পথ অবলম্বন না করা পর্যন্ত তারা খুশী হবে না?' তার মানে ইসলামী সমাজের আভ্যন্তরীণ স্বস্তি, শান্তি ও স্থৈর্যকে কাফেররা নিজেদের প্রতি বিশাল বিদ্রূপের প্রতীক মনে করে। তাই এই প্রতীকটি নিশ্চিহ্ন করে মুসলমানদেরকে উন্নত অবস্থান থেকে নামিয়ে এনে নিজেদের সাথে একই সমতলে না বসানো পর্যন্ত তারা মনে স্বস্তি অনুভব করে না।

উনবিংশ শতাব্দীর পর থেকে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ইসলামী বিশ্বকে পদানত করে মুসলমানদের চিন্তা ও কর্মের ঐক্যকে খতম করার প্রচেষ্টা চালায়। এ জন্য তারা ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাকে সমূলে উৎখাত করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন করে। এভাবে মুসলমানদেরকে তাদের জীবন দর্শন, সভ্যতা–সংস্কৃতি ও গৌরবোজ্জ্বল অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। অন্যদিকে তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে পাশ্চাত্য জীবন দর্শন ও সভ্যতা–সংস্কৃতির প্রভাব। মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে তারা পুরোপুরি পাশ্চাত্য কায়দায় গড়ে তোলার চেষ্টা করে। মুসলমানদের মধ্যে তারা এমন একটি শ্রেণী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে আখ্যায়িত করে কিন্তু ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের সাথে তাদের কোনদিন পরিচয় ঘটেনি। পাশ্চাত্যের যে কোন চিন্তা–দর্শনকে তারা নির্দ্বিধায় মেনে নেয় কিন্তু ইসলামের প্রত্যেকটি ব্যাপারে তাদের মনে জাগে সংশয়।

বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম দেশ সাম্রাজ্যবাদের গোলামী মুক্ত হলেও তাদের চিন্তাধারা ও জীবন দর্শনের প্রভাব–মুক্ত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। চিন্তাধারা ও জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে এখনো তারা পাশ্চাত্যের গোলামী করে যাচ্ছে। এ শতকের যে চিন্তাটি মসুলমানদেরকে সবচেয়ে বেশী বিভ্রান্ত, বিক্ষিপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে সেটা হচ্ছে পাশ্চাত্য থেকে আগত কমিউনিজম। এমন মুসলমান দেশ কমই আছে যার ওপর এই নাস্তিক্যবাদী মতবাদটির প্রভাব পড়েনি। এ মতবাদটি মুসলমান দেশগুলোয় এমন এক সংঘর্ষ, বিরোধ ও বিশৃংখলার সৃষ্টি করেছে যা ইতিপূর্বে আর কখনো কোনভাবে সম্ভব হয়নি। মুসলমানদের সমগ্র যোগ্যতা ও প্রতিভা নিঃশেষে নির্মূল করে দিয়ে জাতিগতভাবে তাদেরকে দুনিয়ায় বেঁচে থাকার সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে।

এ অবস্থায় মুসলমানদের চিন্তা ও কর্মের পুনরগঠন ও ঐক্য মিল্লাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে মিল্লাতের সচেতন অংশকে তার যথার্থ ভূমিকা পালন করা উচিত।

৩

মিল্লাতে ইসলামিয়ার ঐক্য

দীন ইসলামের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত। নবুওয়াতে মুহাম্মাদী সমস্ত মিল্লাতে ইসলামিয়াকে একীভূত করেছে। তাওহীদ যেমন এ দীন ও মিল্লাতের প্রাণ তেমনি রিসালাতের বাঁধনে সমগ্র বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মিল্লাত এক দেহ, এক আত্মায় পরিণত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন সাহাবাগণের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তাঁরা সোজা দরবারে নবুওয়াতে চলে আসতেন। সেখান থেকেই নিজেদের প্রশ্ন, সংশয় ও বিরোধের চূড়ান্ত জবাব, সমাধান ও মীমাংসা নিয়ে যেতেন। ফলে মিল্লাতের মধ্যে চিন্তার ঐক্য বজায় থাকতো।

রসূলের (স) ইন্তেকালের পর তাঁর বাণী ও সুন্নাত মিল্লাতের ঐক্যের বাঁধনের কাজ করে। চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা মিল্লাতে ইসলামিয়ার প্রধানতম বৈশিষ্ট। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মৌলিক মতবিরোধ দেখা দিলে কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট ভাষ্যের মাধ্যমে হয় তার মীমাংসা। ইসলামী সমাজ ও ইসলামী দলের জন্য এটিই হচ্ছে একমাত্র পথ। যে কোন সমাজে ও দলে যেখানে একাধিক লোক একত্রিত হয়, সেখানে বিভিন্ন প্রসংগে ও প্রশ্নে বিভিন্ন মত সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক। কোন কোন ক্ষেত্রে এই মতবিরোধ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখীও হতে পারে। কিন্তু এই মতবিরোধকে নিয়ন্ত্রিত করার ও এর মীমাংসার জন্য যদি একটি শক্তিশালী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎস থাকে, তাহলে তা সংশ্লিষ্ট সমাজ ও দলের ঐক্যে ফাটল ধরাতে সক্ষম হয় না। ইসলামী সমাজ ও দলের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ এ ধরনের উৎসের কাজ করে। ফলে তাদের সমস্ত মতবিরোধ একটি বিন্দুতে এসে থমকে দাঁড়ায়। সেখানে এমন একটি সীমারেখা নির্ধারিত থাকে যেখানে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেককে বরদাশ্‌ত করে নেয়। ফলে কাজ করার ও সামনে এগিয়ে চলার পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হয়।

কুরআন ও সুন্নাহে যে বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে, সেসব বিষয়ে কারো মতবিরোধ করার কোন অধিকার নেই। সেখানে মুমিনের তথা ইসলামী সমাজের ও ইসলামী দলের একজন সদস্যের শুধুমাত্র امنا وصدقنا (আমরা মেনে নিলাম এবং আমরা সত্যতা স্বীকার করলাম) বলারই অবকাশ আছে। যেমন–কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছেঃ اَقِيْمُو الصَّلٰوةَ অর্থাৎ

সালাত কায়েম করো। আর সালাতটা কি সে সম্পর্কে সহী হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। জিব্রীল আলাইহিস সালাম সশরীরে হাজির হয়ে দিন ও রাতের পাঁচটি সময়সীমার মধ্যে সালাতের পদ্ধতি ও কায়দা–কানুন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। সেই পদ্ধতিতে রসূল ও তাঁর সাহাবাগণ সালাত আদায় করেছেন। রসূলের জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত তিনি এর মধ্যে কোন পরিবর্তন করেননি। কাজেই এ ক্ষেত্রে সালাতের ফরযিয়াত ও তার চেহারা সম্পর্কে ইসলামী সমাজ ও ইসলামী দলের একজন সদস্যের জন্য 'আমান্না ও সাদ্দাকনা' বলা ছাড়া আর কোন গতি থাকে না। এখানে সালাত শব্দের অন্য কোন অর্থ করার যেমন কোন অবকাশ নেই, তেমনি তার চেহারার মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন আনার অধিকারও কারো নেই। যে ব্যক্তি এ ধরনের প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়, সে আসলে ইসলামী সমাজ ও ইসলামী দলের মধ্যে অনৈক্য ও ফিতনার দরজা উন্মুক্ত করে। সে ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণকামী নয়।

ঠিক তেমনি কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, اٰتُو الزَّكٰوةَ অর্থাৎ যাকাত আদায় করো। সহী হাদীসে যাকাতের অর্থ বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিসাব বর্ণনা করেছেন এবং কুরআনে এর ব্যয়ক্ষেত্র উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ যাকাতটা কি, কার কাছ থেকে তা আদায় করতে হবে এবং কোথায় ব্যয় করতে হবে তা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়ে আছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে তার অন্য কোন অর্থ করা এবং তার আদায় ও ব্যয়ের ক্ষেত্র পরিবর্তনে প্রয়াসী হওয়া আসলে মিল্লাতে ইসলামিয়া ও ইসলামী দলের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টি ও তার ঐক্যে ভাঙণ ধরাবার নামান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাই আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স) যে বিষয়গুলো সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দিয়েছেন সেগুলোকে চোখ বন্ধ করে মেনে নেয়াই ইসলামী দলের সদস্যদের কাজ। এ ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি যদি নিজের বুদ্ধি খাটাবার ব্যবস্থা করেন, নিজের তরফ থেকে এই দ্ব্যর্থহীন শব্দগুলোর কোন অর্থ করার চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবেন না ঠিকই কিন্তু তিনি ইসলামী দলের পিঠে ছুরিকাঘাত করার কাজ করবেন।

রসূলের সাহাবাগণ এ ব্যাপারে অত্যন্ত সর্তক ও সজাগ ছিলেন। তাই কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিষয়গুলোর তাঁরা নিজেদের পক্ষ থেকে কোন নতুন অর্থ করার চেষ্টা করেননি। বরং এ ক্ষেত্রে রসূলের বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডকে হুবহু তুলে ধরার চেষ্টা তাঁরা করে গেছেন।

আল্লাহ ও রসূলের এ ধরনের সুস্পষ্ট বিধান সমূহের আনুগত্যকে কুরআনের পরিভাষায় বলা হয় سمع ও طاعة। অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে শোনা এবং নির্দ্বিধায় তার আনুগত্য করা। এ থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বিধানগুলো জানা একজন মুমিন ও ইসলামী দলের সদস্যের দীনি দায়িত্ব। এগুলো জানার পরই তিনি এর আনুগত্য করতে সক্ষম হবেন। এগুলো না জানার কারণে তিনি যে কোন সময় প্রতারিত হতে পারেন। আর এগুলো জানার পর এর ওপর اٰمَنَّا وَصَدَّقْنَا বলা তাঁর ঈমানী দায়িত্ব। তাই মূলত 'সামা' ও 'তাআত'—এর ওপরই মিল্লাতে ইসলামিয়া ও ইসলামী দলের ঐক্যের ভিত গড়ে উঠেছে। সামা ও তাআতের ব্যাপারে মুসলমানরা যখনই গাফলতির শিকার হবে, তখনই ইসলামী দলের ঐক্যে ফাটল ধরবে। 'সামা' হচ্ছে ব্যক্তির এবং 'তাআত' হচ্ছে দলের। ইসলামী দলের পক্ষ থেকে যখন আল্লাহ ও রসূলের সুস্পষ্ট বিধানসমূহ তুলে ধরা হবে, তখন ইসলামী দলের আনুগত্য করাই হবে আসলে সেই বিধানসমূহের আনুগত্য। এই সামা ও তাআতের ব্যাপারে গাফলতির কারণে মুসলমানদের মধ্যে পরবর্তীকালে ফেরকাবন্দি ও ফেরকাবাজীর সৃষ্টি হয়। কাজেই মিল্লাতের ঐক্য বিধান ও ইসলামী দলকে যথার্থ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বর্তমানে ইসলামী সমাজে এই সামা ও তাআতকে যথার্থ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

৪
শুধু শ্লোগানে নয় কাজে

বিশ্ব জুড়ে চলছে আজ শ্লোগানের রাজত্ব। মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকিয়ে দিয়েছে গুটিকয় শ্লোগানের কাছে। উন্নত, অনুন্নত, উন্নয়নশীল সব দেশেই এর সমান প্রতিপত্তি। উন্নত ভবিষ্যত গড়ার, কালকের দিনটিকে আজকের চাইতে ভালো করার, শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার, ভবিষ্যত সুখ ও সমৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করার, এমনকি গরিবী হটাবার ও দ্রব্যমূল্য কমাবার শ্লোগানও এর অন্তরভূক্ত হয়েছে। আর এর জবাবে সারা বিশ্ব জুড়ে দেখা যাচ্ছে হতাশা, অশান্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জুলুম, নির্যাতন, শোষণ, অবিচার, অনাচার, মিথ্যাচার, প্রতারণা, অপপ্রচার, দুর্নীতি, দুঃখ, দারিদ্র, অভাব এবং আরো অনেক কিছুর বর্ধিত কলেবর। শ্লোগান রাজনীতির ক্ষেত্রে, শ্লোগান অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা সব ক্ষেত্রে।

সমগ্র বিশ্ব মানবতা ভূয়া ও ফাঁকা বুলির পেছনে ছুটে চলছে। স্বপ্নের জাল বুনছে শূন্যগর্ভ কয়েকটা শব্দ ও বাক্যকে কেন্দ্র করে। আশার ফলক আঁকা একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যত তার সামনে। রূঢ়,কঠিন, কঠোর বাস্তবের আঘাতে তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে পদে পদে। শূন্যগর্ভ শ্লোগানের ফানুস লক্ষ করে তবুও মানুষের ছুটে চলার বিরাম নেই।

প্রত্যেকটি দেশের লক্ষ আলাদা। এই আলাদা লক্ষের কারণে তাদের সমস্যাও হয়ে গেছে বিভিন্ন। উন্নত দেশগুলোর লক্ষ হচ্ছে নিজেদের উন্নতিকে টিকিয়ে রাখা এবং আরো উন্নত হওয়া। উন্নয়নশীল দেশগুলোর লক্ষ দ্রুত উন্নতি লাভ করা, যাতে উন্নত দেশগুলোর সাথে পাল্লা দেয়া যায়। অনুন্নত দেশগুলোর লক্ষ চিরন্তন অভাব-দারিদ্র থেকে মুক্তিলাভ করা এবং দুনিয়ার বুকে নিজেদের বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। এইসব বিভিন্নমুখী লক্ষে পৌছতে গিয়ে তারা সবাই জটিলতার সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে। এই সমস্যাগুলোই নানা শ্লোগানের জন্মদাতা।

আজকের দুনিয়ায় শ্লোগানের রাজত্ব হলেও এই শ্লোগান মানুষকে শুধু প্রতারিতই করছে। সুখী সমৃদ্ধ ভবিষ্যত গড়ার স্বপ্ন তার স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে। দুনিয়ার ছ'টি মহাদেশের কোথাও বুঝি মানুষের জন্য সুখ নেই। আণবিক অস্ত্র তৈরী করেও সুখ নেই, আণবিক অস্ত্র তৈরী না করেও সুখ নেই। দুনিয়ার প্রতি

মানুষ আগের সব যুগের চাইতে বেশী বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাই আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আগের তুলনায় অনেক বেশী। আর এই সংখ্যা শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলোয় সবচাইতে বেশী।

সম্প্রতি বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো। এতেও ছিল শ্লোগানের ছড়াছড়ি। সমৃদ্ধ ও সুনিশ্চিত ভবিষ্যত গড়ার শ্লোগান। অর্থনৈতিক অভাব-দারিদ্র দুর করার ও জাতীয় আশা আকাংকা পূর্ণ করার রংগীন স্বপ্ন দেখানো হয় ন'কোটি মানুষকে। মাঠ-ময়দান দল ও ব্যক্তির শত শত শ্লোগান মুখরিত করে তোলে। এসব শ্লোগানের পেছনে বাস্তবতা কতটুকু আছে সে সম্পর্কে তারা নিজেরাই ওয়াকিফহাল নয়। অনেক ক্ষেত্রে বিজয়ী দল বা ব্যক্তিরা কিছুদিনের মধ্যেই তাদের শ্লোগানের কথা ভুলে যাবে। তারা এমন সব কাজ করতে থাকবে যা তাদের শ্লোগান ও ওয়াদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। শুধু তাই নয়, তারা যে একদিন এ ধরনের শ্লোগান দিয়েছিল এ কথাও তারা বেমালুম ভুলে যাবে। এইসব লোককে সাবধান করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ - (الصف : ٢-٣)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা করো না তার শ্লোগান দাও কেন? তোমরা যা করো না তার শ্লোগান দিলে আল্লাহর কাছে তা বড়ই অসহনীয় ঠেকে।" (আসসাফ ২-৩)

জাতিকে যদি সত্যিকার অর্থে উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে হয় তাহলে তা লাভ করতে হবে জাতীয় আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ অর্জনের পথে। জাতীয় আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে যথার্থ জাতীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ অর্জিত হতে পারে না। আর জাতীয় আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষকে বাদ দিয়ে যে পার্থিব সমৃদ্ধি তা মূলত কোন সমৃদ্ধিই নয়। এহেন সমৃদ্ধিই বিশ্ব মানবতাকে সুখ ও শান্তি থেকে চিরতরে বঞ্চিত করেছে।

জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য আর একটি বিষয় অপরিহার্য। উন্নতি ও সমৃদ্ধির শ্লোগানের সাথে সাথে শ্লোগানদাতাদের চরিত্রও বিশ্লেষণ করা উচিত। দেখতে হবে তাদের কথাগুলোর কি প্রতিফলন তাদের চরিত্রে ঘটেছে? তারা যা বলে তাদের চরিত্র, কার্যকলাপ, ব্যক্তিগত জীবন তার সাথে সমাঞ্জস্যশীল কিনা। তা যদি না হয় তাহলে তাদের শ্লোগানগুলো ফাঁকা বুলি

ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা যা বলে, চলে তার উল্টো পথে, যারা নিজেদের কথাগুলোকে নিজেদের জীবনে সত্য প্রমাণ করতে পারেনি, তারা জাতিকে পথ দেখাবে কেমন করে? তারা কেমন করে জাতির জীবনে সেগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করবে? মানব জাতির শ্রেষ্ঠ নেতা নবীদের জীবন পর্যালোচনা করলে আমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হবে। তাঁদের জীবনে এই কথা ও কাজের বৈপরীত্য শতকরা এক ভাগও ছিল না। এ জন্যই তাঁরা সার্থক ও সুখী সমাজ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। বিশেষ করে শেষ নবী মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন ও চরিত্র এ ব্যাপারে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় আদর্শ। এত বড় ও এত সুস্পষ্ট আদর্শ সামনে থাকার পর দুনিয়ার অন্য জাতিরা ভুল করতে পারে কিন্তু মুসলমানরা ভুল করবে এ কথা সত্যিই দুর্বোধ্য।

আমরা যদি সত্যিকার অর্থে দেশ ও জাতিকে ভালবেসে থাকি, আমরা যদি যথার্থই নিজেদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি চাই তাহলে আমাদের সম্পর্কিত হওয়া উচিত সেই সব ব্যক্তি ও দলের সাথে যারা শুধু শ্লোগান দেয় না বরং জাতীয় আদর্শকে সমুন্নত রেখে নিজেদের কথা ও কাজ, শ্লোগান ও চরিত্রের মধ্যে কোন বৈপরীত্য সৃষ্টি করেনি। এটাকেই আমাদের জাতীয় চরিত্রের নিয়ামকে পরিণত করা উচিত।

৫
জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়

মানুষ আল্লাহর একটি দুর্বল সৃষ্টি। শৈশব থেকে কৈশোর। কৈশোর থেকে যৌবন। যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব। প্রৌঢ়ত্ব থেকে বার্ধক্য। জীবনের এই প্রতিটি পর্যায়ে মানুষ তার দুর্বলতার ছাপ রেখেছে। তবে প্রথম ও শেষ পর্যায় দু'টিতে তার দুর্বলতার হার শতকরা একশো ভাগ। জন্মের প্রথম মুহূর্তে মানবশিশু একেবারে অসহায়। তার নড়াচড়া থেকে খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত সব কিছুই পরনির্ভর। বড় হবার সাথে সাথে তার পরনির্ভরতা কমতে থাকে। তবুও সমাজ-শাসন-শৃংখলা তাকে নির্ভরশীল করে রাখে। আর শেষ পর্যায়ে বার্ধক্যে সে আবার পুরোপুরি পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যায়ের পরনির্ভরতা চলতে থাকে সজ্ঞানে।

কিন্তু এত দুর্বল মানুষ যৌবনে নিজেকে সবচাইতে সবল মনে করতে থাকে। যৌবন মানুষের মধ্যে এমন একটা কর্মপ্রাণতা ও কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে যা কল্পনাতীত। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করার পর মনে হয় যেন হঠাৎ একটা ঘুমন্ত পাহাড় জেগে উঠলো। একজন যুবক মনে করতে থাকে, সে দুনিয়ায় কী না করতে পারে! সে দুনিয়াটাকে ভেংগে নতুন করে গড়তে পারে। সে আর একটা নতুন জগতও তৈরী করতে পারে। সে আকাশের চাঁদকে হাতের মুঠোর মধ্যে আনতে পারে। সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। এটা যৌবনের সাধ নয়, তার অন্তরের কর্মপ্রেরণা। তাই যৌবনের শক্তি হচ্ছে মানুষের সমগ্র জীবনকালের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ববহ ও মূল্যবান। মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাই বিশেষ করে মানুষের যৌবনকালের কর্মকাণ্ডের হিসেব নেবেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কোন মানুষ আল্লাহর সামনে থেকে পা নড়াতে পারবে না যে পর্যন্ত না সে পাঁচটা প্রশ্নের জবাব দেবে-(১) তার সমগ্র জীবনকালটা সে কিভাবে ব্যয় করেছে? (২) তার যৌবনের শক্তি সামর্থকে কোন্ কাজে লাগিয়েছে? (৩) যে জ্ঞান সে অর্জন করেছিল সে মোতাবেক কি কাজ করেছে? (৪) তার সম্পদ কিভাবে অর্জন করেছে এবং (৫) কিভাবে তা ব্যয় করেছে?

একজনের শাস্তি দেবার সামর্থ নেই, সে একজন অপরাধীকে মাফ করে দিল। আর এক জনের শাস্তি দেবার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও সে একজন

অপরাধীকে মাফ করে দিল। এই দু'জনের অপরাধীকে মাফ করে দেবার নেকী সমান হতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই শেষোক্ত ব্যক্তির নেকীর পাল্লা ভারী হবে। এই শেষোক্ত ব্যক্তিই যেন যুব সমাজের সদস্য। এই বয়সে অফুরন্ত কর্মক্ষমতার কারণে মানুষ সহজেই আল্লাহর নাফরমানির পথে এগিয়ে যায়। শয়তান তাকে যুব শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়ে প্রতারণা করে। তাকে বলে তোমার এতো বিপুল শক্তি, তুমি কেন এক অদেখা শক্তির আনুগত্য করবে? এর পরও যে যুবক আল্লাহর আনুগত্য করে সে আসলে নিজের অন্তরনিহিত বিপুল শক্তির ওপর বিজয় লাভ করেছে। আর যে যুবক আল্লাহর আনুগত্য করে না সে নিজের শক্তির হাতে পরাজিত, তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে। সে নিজের নফ্সের দাসানুদাস। তাকেই বলে নফ্সের বান্দা। আর একজন যুবক আল্লাহর অনুগত। কিন্তু শয়তান তাকে প্ররোচিত করে। এই তো তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। এই সময় আয়েশ, আরাম ও ভোগ না করতে পারলে দুনিয়ার জীবনে আর ভোগে সুখ নেই। আর এই সময় ভোগ করতে না পারলে দুনিয়ার জীবনে আর ভোগে তৃপ্তি নেই। আল্লাহর অনুগত যুবককেও শয়তান প্ররোচিত করে নাফরমানির পথে নিয়ে যায়। এ সময় যে যুবক বিভ্রান্ত হয় না সে আসলে শয়তানের ওপর বিজয় লাভ করেছে। আর যে বিভ্রান্ত হয় সে শয়তানের দাসানুদাসে পরিণত হয়েছে। তাকে বলে শয়তানের বান্দা।

যৌবনের এই শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাবার ওপরই তাই সমগ্র জীবনের সফলতা নির্ভর করছে। একজন যুবক আল্লাহর অনুগত হতে পারে, শয়তানের অনুগত হতে পারে, নফসেরও অনুগত হতে পারে। কিন্তু শয়তানের ও নফ্সের অনুগত হবার মধ্যে তার গৌরবের বা শ্রেষ্ঠত্বের কিছুই নেই। এটা তার যৌবনের অফুরন্ত শক্তির কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। কৃতিত্ব সেখানে যেখানে সে সমস্ত প্রলোভন তুচ্ছ করার হিম্মত রাখে। যৌবন জল তরঙ্গ যেদিকে প্রবাহিত হতে চায় সে যদি সেদিকেই প্রবাহিত হয়ে যায় তাহলে তাতে তার কৃতিত্ব কোথায়? স্রোতের বিপরীতে এগিয়ে চলার মধ্যেই তো সাঁতারুর দক্ষতা প্রমাণিত।

সত্যকে আবিস্কার করা, সত্যকে মেনে নেয়া এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যুবকদের জন্য মোটেই কঠিন নয়। সত্য তো আবিস্কৃত হবার জন্য, প্রস্ফুটিত হবার জন্য, বিকশিত হবার জন্য এসেছে। কিন্তু কোথায় সেই যুব সমাজ যারা একে আবিস্কার করে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত করবে! সত্য তো নিজেকে প্রকাশ করেছে। কিন্তু তাকে গ্রহন করার ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কি যুব সমাজ এগিয়ে এসেছে? আল্লাহ তাঁর শেষ-নবীর মাধ্যমে যে সত্য দীন

পাঠিয়েছেন বাংলার সরজমিনে তার প্রবেশ ঘটেছে হাজার বছর আগে। এ সত্য দীন এ দেশে প্রতিষ্ঠার জন্য যুব সমাজের উদ্যোগের প্রতীক্ষায় আছে। কিন্তু আমাদের যুব সমাজ কোন্ মরীচিকার দিকে ছুটে চলছে! তাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মূল্যবান সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা কি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মূল্যবান কাজ সম্পন্ন করতে পারছে?

৬
নবীর মি'রাজের তাৎপর্য

আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সাথে সম্পর্কিত বিশ্ব–জগতকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন ঃ আরদ ও সামাওয়াত। আমাদের ভাষায় আমরা একে বলি ঃ পৃথিবী ও মহাশূন্য। একটা আমাদের নিকটে আর একটা দূরে। একটা সম্পর্কে আমরা যত বেশী জানি আর একটা সম্পর্কে জানি ঠিক ততটাই কম। তেমনি করে এই বিশ্ব জগতের মধ্যে যত বস্তু আছে তাদের সম্পর্কে আমরা যতটা জানি, জানিনা তার চেয়ে অনেক বেশী। জানার চেষ্টার মানুষের বিরাম নেই। তবুও অজানা থেকে যাচ্ছে অনেক কিছুই। সৃষ্টি জগতের অনেক কিছুই আজো রহস্যাবৃত।

কিন্তু যে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে মানুষের কাছে যাঁকে পাঠানো হয়, তাঁকে অবশ্যি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশী জানতে হয়। অন্তত স্রষ্টা ও মানুষের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলী সম্পর্কে তাঁকে সব কিছু জানতে হয়। স্রষ্টা কি নিয়মে এই বিশ্বজাহান পরিচালনা করছেন, সে সম্পর্কে শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানই তাঁর জন্য যথেষ্ট নয় বরং প্রত্যক্ষভাবে সেগুলোর সাথে পরিচিত হওয়া এবং সেগুলো সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে চাক্ষুস জ্ঞান লাভ করা তাঁর জন্য একান্ত অপরিহার্য। বাহ্যত হৃদয়, বিবেক ও জ্ঞান চক্ষু দিয়ে বিশ্ব জগতের সর্বত্র আমরা একটা প্রচ্ছন্ন নিয়ম–শাসন–শৃংখলা অনুভব করি। সেই নিয়ম–শাসন–শৃংখলা তথা 'মালাকূতুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্'–বিশ্ব জগত পরিচালনার কেন্দ্রীয় নিয়ম–বিধান তাঁকে চর্ম চক্ষে প্রত্যক্ষ করতে হয়। তবেই না তাঁর বক্তব্য হয় আন্তরিক, প্রাণবন্ত ও জোরালো যতদূর প্রয়োজন। তবেই না তাঁর বিশ্বাস অন্য মানুষের বিশ্বাসের জন্য মজবুত বুনিয়াদ সরবরাহ করতে পারে। নবী ও রসূলগণের বিশ্বাস ও দার্শনিকগণের বিশ্বাসের মধ্যে এটিই হচ্ছে বুনিয়াদী তফাত। দার্শনিকদের বিশ্বাস নিছক কল্পনাভিত্তিক জ্ঞানলব্ধ। তাই পরিবর্তনপ্রিয়তা তাদের সহজাত। বিপরীত পক্ষে নবী ও রসূলদের বিশ্বাস প্রত্যক্ষদৃষ্ট জ্ঞান লব্ধ। তাই পরিবর্তনের ঢেউ সেখানে কখনো জাগে না। তাঁদের বিশ্বাসের কেন্দ্র সর্বক্ষণ একই বিন্দুতে স্থির। পৃথিবীর বয়স হাজার লক্ষ বা কোটি বছর যাই হোক না কেন, নবী ও রসূলগণের বিশ্বাসের একাধিক কেন্দ্রের কোথাও কোন প্রামাণ্য দলিল নেই।

আল্লাহ মহান ও সর্বশক্তিমান। তিনি عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر –সব কিছুই তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অন্তরভূক্ত। যে কোন কাজ করার ক্ষমতা তাঁর আছে। এ জন্য তাঁকে কারোর সাহায্য গ্রহণ করতে হয় না বা কোন কালক্ষেপণ করার প্রয়োজনও তাঁর নেই। কাজেই নবীদেরকে তাঁর বিশ্ব জগত পরিচালনার গোপন রহস্য জানাবার জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থাপনার তো প্রয়োজন দেখা যায় না। তবে বিশেষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয় শুধু বিষয়টির ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেবার জন্য। অনেক নবীকে তিনি এই বস্তু জগতেই তাঁর গোপন রহস্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তবে এ জন্য তাঁদের কিছু আত্মশুদ্ধিমূলক কর্মসূচী পালন করতে হয়েছে এবং বিশেষ স্থানে অবস্থান করতে হয়েছে। সম্ভবত তাঁদের যুগের জ্ঞানগত উৎকর্ষতার দিকে লক্ষ রেখে এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। পরবর্তীকালে জ্ঞানগত উৎকর্ষতার চূড়ান্ত অধ্যায়ে পৌঁছে যাবার পর মানুষের ব্যাপক বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের শেষ বিন্দুতে শেষ নবীর আগমন হলো। মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ পৃথিবীতে নয়, এ মহাশূন্যেও নয়, এ বিশ্ব জগতের সীমানা পেরিয়ে তাঁর ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুতে তাঁকে নিয়ে গেলেন। সেখানে তাঁর সাথে কথা বললেন এবং এ বিশ্ব জগতের গোপন রহস্য তাঁর সামনে খুলে ধরলেন। বিশ্ব কারখানার যে যন্ত্রটি যেখানে কর্মরত আছে সেখানে নিয়ে গিয়ে তাঁকে সে যন্ত্রটি দেখালেন।

মহান স্রষ্টার জন্য ক্ষমতার কোন বিশেষ কেন্দ্রের প্রয়োজন হয় না। তাঁর ক্ষমতার কেন্দ্র সর্বত্র। সৃষ্টি জগতের সর্বত্রই তাঁর ক্ষমতা সমানভাবে বিরাজিত। তবে বান্দার সামর্থের সীমাবদ্ধতার জন্য তাঁকে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে বান্দাকে তার তাজাল্লি দেখাতে হয়। মহান আল্লাহর কথা বলার জন্য বিশেষ কোন পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। তিনি সর্বক্ষণ ও সর্বত্র সব কথা বলতে পারেন। কিন্তু মানুষের কথা বলার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে মানুষের সাথে কথা বলার সময় তাকে সীমাবদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। ঠিক তেমনি তিনি যখন তাঁর কোন বান্দাকে সৃষ্টি জগতের কোন নিশানী দেখাতে চান তখন তাঁকে নিয়ে যান এবং যে জিনিসটি যেখানে যেভাবে দেখা যায় তাঁকে সেটি সেখানে সেভাবে দেখান। কারণ বান্দা তার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে সমগ্র বিশ্বজগত ও তার মধ্যকার সমস্ত বস্তুকে মহান আল্লাহর মত একই সময়ে একই স্থানে দেখতে পারে না। আল্লাহকে তো কোন জিনিস দেখার জন্য কোথাও যাবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বান্দাকে যেতে হয়। পৃথিবী ও মহাশূন্যের সীমানা পেরিয়ে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিত হবার

ব্যাপারটিও তেমনি। মহান আল্লাহ যথার্থই কোন স্থানে বসে নেই। কিন্তু তাঁর সাথে দেখা করার জন্য বান্দার কোন স্থানের প্রযোজন। এমন কোন স্থান যেখানে তিনি তাঁর সমস্ত ক্ষমতা সমস্ত তাজাল্লি কেন্দ্রীভূত করে বান্দাকে দেখাতে পারেন। সেটিই হচ্ছে তাঁর আরশ।

মি'রাজ হচ্ছে ওপরে ওঠার যন্ত্র। যে যন্ত্রের সাহায্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওপরে উঠে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করেছিলেন সেটিই হচ্ছে মি'রাজ। নবী করীম (স) ছাড়া সৃষ্টি জগতের আর কেউ, এমন কি আল্লাহর নিকটতম ফেরেশতা জিব্রীলও তাঁর এত বেশী কাছাকাছি হননি। জিব্রীলও এক স্থানে এসে থেমে যান এবং বলেন, এর আগে যাবার আর আমার ক্ষমতা নেই। সেখান থেকে বিশেষ যন্ত্রের বা বাহনের সাহায্যে নবী করীম (স) মহান আল্লাহর দরবারে হাযির হন। তাঁর সাথে কথা বলেন। তারপর বিশেষ পয়গাম নিয়ে দুনিয়ায় চলে আসেন।

মি'রাজের এ ঘটনাটি ঘটে রসূলের নবুওয়াত প্রাপ্তির এগার বছর পর হিজরাতের মাত্র এক বছর আগে নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা), হযরত মালিক ইবনে সা'সাআ (রা), হযরত আবুযার গিফারী (রা), হযরত আবু হুরাইরা (রা), হযরত উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা), হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা), হযরত আয়েশা (রা) এবং আরো অসংখ্য শ্রেষ্ঠ সাহাবী এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। যে সময় এ ঘটনাটি ঘটে সে সময় অনেক দুর্বল ঈমানদারের ঈমানের ভিত নড়ে গিয়েছিল। আজো এ ঘটনার আলোচনায় এসে অনেকের ঈমান নড়বড়ে হয়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ ঘটনার জন্য দায়ী, যিনি নিজের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় মাত্র মুহূর্তকাল সময়ের মধ্যে মহানবীকে কোটি কোটি আলোক বছরের পথ অতিক্রম করান এবং মাত্র মুহূর্তকাল সময়ের মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি জগতের রহস্যগুলো তার সামনে তুলে ধরেন, তাঁকে কি সর্বশক্তিমান বলে স্বীকার করে নেয়া হয়নি? তিনি সর্বশক্তিমান যখন তখন সবকিছুই তাঁর ক্ষমতার মধ্যে। তাঁকে সর্বশক্তিমান বলে স্বীকার করে নেবার পরে আবার এ ধরনের সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতার কোন প্রশ্ন ওঠে না। বাকি থাকে অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন। তাদের বিশ্বাস ও অবিশ্বাস আপেক্ষিক। আজ যেটায় তারা বিশ্বাস করেন, কাল সেটায় অবিশ্বাস। আর তাছাড়া তাদের শক্তি সামর্থই বা কতটুকু, সে সম্পর্কে তারা নিজেরাই ভালোভাবে জানেনা। কাজেই ঈমানের কোন বিকল্প নেই।

হজ্জ শ্রেষ্ঠতম ইবাদাত

পৃথিবীতে আসল ধর্মমাত্র একটি। কেউ কেউ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে একে বলতে চেয়েছেন মানবধর্ম। কিন্তু আসলে এটি হচ্ছে, মানুষের স্বভাবধর্ম। কুরআনে একেই বলা হয়েছে ইসলাম। اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ –আল্লাহ সৃষ্ট ও আল্লাহ্ প্রদত্ত একমাত্র ধর্মই হচ্ছে ইসলাম। হাদীসে একে বলা হয়েছে دِيْنُ الْفِطْرَةِ –প্রকৃতির ধর্ম বা স্বভাব ধর্ম। সমস্ত নবী এবং সমস্ত পয়গম্বর সৃষ্টির আদি থেকে নিয়ে এই একটি ধর্মেরই প্রচার করে গেছেন। নবী ও পয়গম্বরদের প্রচারিত ধর্ম তাদের জীবদ্দশায় সঠিক অবয়বে বিরাজিত ছিল। কিন্তু তাঁদের তিরোধানের পর এগুলোর চেহারা পালটে গেছে। তাদের অনুসারীরা পরবর্তীকালে এগুলোকে নিজেদের মনের মতো করে সাজিয়েছে। কাজেই প্রত্যেকটি ধর্মই এখন আলাদা রূপ নিয়ে দুনিয়ার বুকে বিরাজ করছে। তবুও যেহেতু সব ধর্মের মূলে একটি ধর্মই ছিল এবং সে মূল ধর্মটি এখনও সঠিক চেহারায় দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাই ঐ বিকৃত ধর্মগুলোর মধ্যে স্বভাবধর্মের বেশ কিছু জিনিস এখনো রয়ে গেছে। এ কারণে বিকৃত ধর্মগুলোর মধ্যে ইবাদাত বন্দেগীর একটা ধারা প্রচলিত রয়েছে, যদিও তার মধ্যে বিকৃতি অনেক বেশী। এমনকি কোথাও কোথাও সবটুকুই বিকৃতি।

পবিত্র স্থানের যিয়ারত বা তীর্থযাত্রা এমনি একটি ইবাদাত বলে সব ধর্মে স্বীকৃত। তবে বিকৃত ধর্মগুলোর কোনটিতেই এই তীর্থযাত্রাকে আবশ্যিক বা ফরয গণ্য করা হয়নি। অর্থাৎ এটা তাদের ধর্মের একটা অপরিহার্য অংগ নয়। জীবনের কোন পর্যায়ে এসে বা কোন আবেগময় মুহূর্তে তীর্থযাত্রার প্রয়োজনবোধ করলে তারা মনের প্রশান্তির জন্য বা অতিরিক্ত পূণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে এ পথে পাড়ি জমায়।

কিন্তু অন্যদিকে মানুষের স্বভাবধর্ম ইসলামে এই পবিত্র স্থানের যিয়ারত বা বাইতুল্লাহর হজ্জকে ফরয গণ্য করা হয়েছে সকল সমর্থ মুসলমানের জন্য। ইসলামে ইবাদাতের যতগুলো ধারা আছে তার মধ্যে হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। ইবাদাতের অন্য তিনটি বৃহৎ ধারা নামায, যাকাত ও রোযা। ইবাদাতের এই ধারাগুলোকে দু'ভাবে ভাগ করা যায় ঃ আর্থিক ও কায়িক। হজ্জের মধ্যে

ইবাদাতের এ দু'টি দিকেরই প্রকাশ ঘটেছে। একদিকে হজ্জের জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং অন্যদিকে কায়িক পরিশ্রমও করতে হয়। একমাত্র আল্লাহর হুকুম পালন করার উদ্দেশ্যে তাঁর ঘরের যিয়ারত করার জন্য মুসলমান ঘর থেকে বের হয়। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য তার থাকে না। নতুন দেশ ভ্রমণ বা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য নিয়ে সে হজ্জের সফর করে না। হাজার হাজার মাইলের কষ্টকর সফর করে সে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত ও তাঁর রেজামন্দি লাভ করার উদ্দেশ্যে। আবার দেখা যায়, একজন মুসলমান হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার সময় নিজের পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ি, স্বদেশ-স্বএলাকা পরিত্যাগ করে তার নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য, যা হয়তো খুব ভালোই চলছিল, নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ করে। যতপ্রকার লাভজনক সম্পর্ক ছিল সবগুলো পরিত্যাগ করে সে আল্লাহর ডাকে সাড়া দেয় এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘরের সফর করে। এভাবে তার এ ইবাদাতে হিজরাতও স্থান লাভ করে। তারপর একজন মুসলমান হজ্জের উদ্দেশ্যে সফর করে মক্কা পৌছলে তাকে সেখানে নামাযের সময় নামায পড়তে হয়। এভাবে সালাতের ইবাদাত-এর মধ্যে শামিল হয়ে যায়। এছাড়া বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, হাজরে আসওয়াদকে চুমো দেয়া ইত্যাদি কাজের সাহায্যে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়াদৌড়ি করে সে যেন আল্লাহর পথে দৌড়াদৌড়ি করে। এছাড়া মিনায় যাওয়া, মিনা থেকে আরাফাত এবং সেখান থেকে মুযদালিফা হয়ে আবার মিনায় আসা-এসব কষ্টকর সফর, ছুটাছুটি ও দৌড়াদৌড়ি আসলে জিহাদের সাথে সামঞ্জস্যশীল। একজন লোক যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, সে পথে অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করে, খাবার থাকে অপর্যাপ্ত, শোবার কোন জায়গা থাকে না, আরামের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, কখন-কোথায় কি অবস্থায় থাকে তার কোন ঠিক ঠিকানা থাকে না, প্রায় এমনি ধরনের একটি অবস্থা হয় হজ্জের সফরকালে। কাজেই একজন মুসলমান হজ্জের সফরের মাধ্যমে জিহাদের মধ্যে প্রবেশ করে। তারপর কুরবানীর দিন সে কুরবানী করে। এভাবে হজ্জ একটি ব্যাপক ও সামগ্রিক ইবাদাতে পরিণত হয়। দুনিয়ায় যত ধরনের ইবাদাত আছে সবগুলোই বান্দা তার এই হজ্জের ইবাদাতের মধ্যে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদন করে। এ জন্যই হজ্জকে সবচেয়ে বড় ইবাদাত গণ্য করা হয়ে থাকে। আর এ জন্যই হজ্জের ইবাদাতের মাধ্যমে একজন মুসলমান তার পূর্ববর্তী জীবনের সমস্ত গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। তবে এ জন্য তার হজ্জ হতে হবে সব রকমের ত্রুটিমুক্ত। হজ্জের সফরকালে জেনে বা না জেনে কাউকে কষ্ট না দেয়া, কাউকে গালি না দেয়া, কারোর

সাথে ঝগড়া-মারামারি না করা, কারোর গীবত না করা, কারোর বিরুদ্ধে অপপ্রচার না করা, অত্যন্ত সবর ও সহনশীলতার সাথে সবকিছু বরদাশত করে নেয়া-এসবই হচ্ছে হজ্জকে সর্বাংগ সুন্দর ও নির্দোষ করার উপায়। এ ধরনের হজ্জই একটি ত্রুটিমুক্ত মকবুল হজ্জ হিসেবে আল্লাহর কাছে মর্যাদা লাভ করে।

এই ধরনের মকবুল হজ্জই একজন মুসলমানের কাছে সবচেয়ে বেশী কামনার বস্তু।

মিল্লাতে ইসলামিয়ার ব্যাধি

যে মারাত্মক ব্যাধিগুলো মিল্লাতে ইসলামিয়াকে পংগু করে দিতে পারে আল্লাহ ও তাঁর রসূল সেগুলো চিহ্নিত করে দিয়েছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ব্যাধিটি হচ্ছে 'আসাবিয়াতে জাহেলিয়া'। অর্থাৎ স্ববংশ, স্বগোত্র, স্বজাতি প্রীতির কারণে অন্যায়ভাবে তাদের সমর্থন করা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আসাবীয়াতকে আমি আমার পায়ের তলায় দাবিয়ে দিয়েছি। মুসলমান যেখানকারই হোক না কেন তারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ভাই।"

মিল্লাতে ইসলামিয়ার 'জামঈয়াত' বা সামাজিক বন্ধন ও সম্প্রীতিকে পংগু করে দেয় অন্য যে সমস্ত ব্যাধি সেগুলোর একটি বিরাট অংশ হচ্ছে হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, পরনিন্দা, পরচর্চা ইত্যাদি। এগুলোর উৎস মূলে যে বিষয়টি রয়েছে সেটিকে কুরআন সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে এবং তা থেকে দূরে থাকার জন্য মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে। কুরআনের পরিভাষায় এটিকে বলা হয়েছে ظَنّ বা সন্দেহ–সংশয়–কুধারণা। বলা হয়েছে ঃ "কোন কোন সন্দেহ মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করে, কাজেই তোমার ভাইয়ের ব্যাপার নিয়ে অনর্থক ঘাঁটাঘাঁটি করো না"– فَ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ فَلَا تَجَسَّسُوا

একটা সমাজকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার এবং সামাজিক সম্প্রীতির বাঁধনকে মজবুত করার জন্য সমাজের সদস্যদের পারস্পরিক আস্থা ও পরস্পরের প্রতি সুধারণা পোশণ একটি অপরিহার্য বিষয়। কুরআন এ জন্য মুসলমানদেরকে সরাসরি নির্দেশ দিয়েছে ঃ ظَنُّ الْمُؤْمِنِيْنَ خَيْرًا –"মুমিনদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করো।" আসলে এই সুধারণা অনেক ব্যাধি নিরাময় করে আর কুধারণা অনেক ব্যাধির জন্ম দেয়। কুরআন এ জন্য উড়ো খবরে বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছে এবং বলেছে, ফাসেক–ফাজেররা এ ধরনের কোন খবর আনলে তাদের কাছ থেকে এর সপক্ষে প্রমাণ চাও। যথার্থ প্রমাণ ছাড়া এগুলো বিশ্বাস করা মানে আত্মঘাতি হওয়া। অর্থাৎ সকালে এ ধরনের উড়ো খবরে বিশ্বাস করে নিয়ে সন্ধ্যে বেলায় আসল ব্যাপার জেনে যেন লজ্জিত হতে না হয়। অথচ পানি হয়তো তখন অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। তাকে ফেরাবার আর কোন পথ নেই।

মিল্লাতে ইসলামীয়াকে এই রোগটি আজ সবচেয়ে বেশী পংগু করে ফেলেছে। ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে অতীতেও এই রোগটি ইসলামী জামঈয়াতের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফাটল সৃষ্টি করেছিল। এক দেশ সম্পর্কে আর এক দেশের, এক দল সম্পর্কে আর এক দলের এবং একজন সম্পর্কে আর এক জনের বিরূপ ধারণা এরি ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে। অথচ অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে এর পেছনে কোন সত্যতা নেই।

মিল্লাতে ইসলামিয়ার তৃতীয় মারাত্মক ব্যাধিটি হচ্ছে ইসলামী জামঈয়াতের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রবণতা। এ প্রবণতাটি সমগ্র মিল্লাতের ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দেয়। মিল্লাতকে তার কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরিয়ে দিতে এবং ভিন্নতর কেন্দ্রের দিকে ঠেলে দেবার ব্যাপারে এর ভূমিকা অনন্য। এমনকি এক পর্যায়ে এসে এ প্রবণতাটি মিল্লাতে ইসলামিয়াকে বিজাতির দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এ প্রবণতাটিকে 'ফিত্‌না ও ফাসাদ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কুরআনে ফিত্‌নাকে হত্যার চাইতেও মারাত্মক বলা হয়েছে– اَلْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ । অতীতে এই ফিত্‌নাটি ইসলামকে ও মুসলিম মিল্লাতকে বার বার ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং বর্তমানেও এর ক্ষতিকর প্রভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে বিভিন্ন মুসলিম দেশের ইসলামী দলগুলোর মধ্যে এ ফিত্‌নাটি বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। দলের মতের ওপর নিজের মতকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দেয়ার জিদ এবং নিজেকেই একমাত্র মুখলিস মনে করার প্রবণতাই এর মূল কারণ। এক পর্যায়ে এসে এই জিদ ও প্রবণতাটি ইসলামের পরিবর্তে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহৃত হয়। তখনই তা ফিতনায় পরিণত হয়।

৯
দুনিয়ার লোভ ও মৃত্যুর ভয়

বর্তমান বিশ্বে মুসলিম জাতির ওপর এক সার্বিক বিপর্যয় নেমে এসেছে। নিজেদের আজাদ দেশেও তারা শান্তি ও সমৃদ্ধির জীবন যাপনে সক্ষম নয়। দুনিয়ার চল্লিশটিরও বেশী রাষ্ট্রে নিজেদের স্বাধীন সরকার কায়েম করলেও এবং বিশ্ব জনসমষ্টির এক তৃতীয়াংশের অধিকারী হলেও মূলত বিশ্ব পরিস্থিতি তাদের আয়ত্বের সম্পূর্ণ বাইরে। মানসিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আজাদী তাদের নিকট এখনো স্বপ্নের চাইতেও কম নয়।

এত বিরাট জনসমষ্টি বিশ্বজনমতের ওপর কোনপ্রকার প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম নয় কেন? চল্লিশটির বেশী দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বস্তুগত শক্তি দুনিয়ার কোন শক্তিকে ভীত করতে পারছে না কেন? বস্তুত সংখ্যায় ও শক্তিতে বিপুল হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার মোহ ও মৃত্যুর ভয় মুসলমানদেরকে পংগু করে দিয়েছে। নিছক সম্পদ উপার্জন ও ভোগ করা এবং এ জন্যই বেঁচে থাকা মুসলমানদের জীবনের লক্ষ হতে পারে না। এ বস্তুবাদী জীবন দর্শন হচ্ছে আল্লাহর বিধান অস্বীকারকারী এবং আল্লাহকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র প্রভূত্বের আসন দিতে অসম্মত কাফেরের। মুসলমান সম্পদ উপার্জন করবে, ভোগও করবে কিন্তু তার প্রতি কোনপ্রকার আকর্ষণ ও দুর্বলতা তার থাকবে না। সে ভোগ করার জন্য নয় বরং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী সম্পদ ব্যবহার করার জন্য বেঁচে থাকে। এ জীবনলক্ষ থেকে সরে যাওয়ার সাথে সাথেই মৃত্যুর ভয় তাকে পেয়ে বসে। মৃত্যুর কথা তার কাছে একটি বিরাট দুঃসংবাদ মনে হয়। মনে হয় যেন ভোগের পথে একটি পূর্ণচ্ছেদ। আল্লাহ যে জীবনটি তাঁর কাছে আমানত রেখেছেন সেটি আল্লাহর জন্যে উৎসর্গ করা তার কাছে মহা অন্যায় ও জুলুম প্রতিভাত হয়।

কাফের ও মুমিনের জীবন দর্শনের পার্থক্য এখানেই। মুমিনের জীবন তার কাছে আল্লাহর একটি আমানত। তিনি চাওয়া মাত্রই তা তাঁকে ফেরত দিতে হবে। আর কাফেরের জীবন অর্থলিপ্সু কৃপণের ধনের ন্যায়। তা থেকে একটি কপর্দক খরচ করাও তার অনভিপ্রেত। মুমিন মৃত্যুকে জীবনের চাইতে বেশী ভালোবাসে আর কাফের একমাত্র জীবনকেই ভালোবাসে।

কিন্তু আজকের দুনিয়ায় মুসলমানের অবস্থা ঠিক এ পর্যায়ে নেই। মুসলমানের জীবন আজ আর আল্লাহর আমানত নয় বরং নিছক ভোগের একটি মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। মুসলমান আজ মৃত্যুর চাইতে জীবনকে বেশী ভালোবাসে। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমান আজ দুনিয়ার কোন স্বার্থ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নয়। এ কারণেই তাদের সমাজে এমনকি পাশের অমুসলিম সমাজের তুলনায় স্বার্থের দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রবল। মুসলমান সমাজে এখন দলাদলি, ফেরকাপরস্তি, অনৈক্যটাই মুখ্য। এই একই কারণে মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কোন ঐক্য ও যোগসূত্র গড়ে ওঠেনি। বরং বিভিন্ন শক্তিজোটের ক্রীড়নক হয়ে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভোগবাদী জীবন দর্শনের প্রভাবে মুসলমান এখন মৃত্যুকে ভয় করতে শুরু করেছে। ফলে কুফরীর মোকাবিলায় ইসলামের স্বার্থে প্রাণ উৎসর্গ করার প্রশ্ন যখনই ওঠে মুসলমান তখনই পেছনে সরে আসে। ইসলামের স্বার্থে ধন-মাল কোরবানী করার প্রশ্ন উঠলে মুসলমান লাভ ক্ষতির খতিয়ান করতে বসে যায়। আজকের মুসলমানের এ অবস্থা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক বাণীতে বলে গেছেন ঃ

"আমার উম্মতের ওপর এমন এক সময় আসছে যখন খাদ্যবস্তু আহার করার সময় মনুষ যেমন করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক তেমনি করে আমার উম্মতের ওপর দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ঝাঁপিয়ে পড়বে। জনৈক সাহাবী বললেন, তখন কি আমরা সংখ্যায় এত অল্প থাকবো যে, বিভিন্ন জাতি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পাবে? রসূলুল্লাহ (স) বললেন, না, তখন তোমাদের সংখ্যা কম হবে না বরং তোমরা হবে বিপুল সংখ্যক কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে বন্যার ফেনাপুঞ্জের ন্যায় এবং দুশমনদের দিল থেকে তোমাদের ভয় দূরীভূত হবে আর তোমাদের দিল হবে হিম্মতহারা। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, দিল হিম্মতহারা হবার কারণ কি? রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ এর কারণ হবে এই যে, তোমরা (আখেরাতকে ভালোবাসার পরিবর্তে) দুনিয়াকে ভালোবাসতে থাকবে (এবং আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করার পরিবর্তে) মৃত্যু থেকে পালিয়ে যেতে থাকবে।" —আবু দাউদ

রসূলুল্লাহর এ বাণীর সাথে বিশ্ব মুসলমানের চেহারার আজ হুবহু মিল দেখা যাচ্ছে। বস্তুত এ কারণেই বিশ্ব জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের সর্বত্র মুসলমান আজ নির্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, পদদলিত এবং তাদের এ লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের পরিসমাপ্তি ততদিন হবে না

যতদিন না তারা কাফেরী জীবন দর্শন পরিহার করে সত্যিকার ইসলামী ও মুমিনের জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হবে। পার্থিব ক্ষমতা ও বস্তুগত শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য তারা যতই প্রচেষ্টা চালাক না কেন, এ ভেতরের ব্যাধি তাদের সকল প্রচেষ্টাকে দুর্বল ও নস্যাত করে দেবে। কাজেই মুসলিম জাতিকে এ ভেতরের ব্যাধি নির্মূল করার জন্য সর্বাগ্রে সচেষ্ট হতে হবে।

১০

মুনাফেকী জাতীয় চরিত্রের প্রধান শত্রু

বিগত কয়েকশো বছরে আমাদের সমাজ কাঠামোর চেহারা বদল হয়েছে কয়েকবার। প্রাক ইংরেজ আমলে এ দেশের মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক অস্থিরতা থাকলেও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার অভাব ছিল না কোনদিন। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে মুসলমানরা নিজেদের স্বাতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সক্ষম হয়েছিল। সমাজের একটি অংশের মধ্যে স্বাতন্ত্রবোধের অভাব দেখা দিলেও সে অভাব পূরণ করার মতো ক্ষমতা সমাজের ছিল। মুসলিম উলামা ও মাশায়েখগণ তাঁদের ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালনে তৎপর থাকতেন। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র ইসলামী সমাজের একটি চিরন্তন বৈশিষ্টই শুধু নয়, তার প্রাণও। এই বৈশিষ্ট খতম হবার অর্থ ইসলামের বিলুপ্তি।

ইংরেজ শাসনামলে এই সমাজ কাঠামোয় একটা ব্যাপক ও বৃহত্তর ওলট পালট হয়। সমাজের বৃহত্তর অংশে দারিদ্র শিকড় গেড়ে বসে। সমগ্র সমাজ শিকার হয় রাজনৈতিক লক্ষহীনতা ও দেউলিয়াপনার। ধর্মীয় ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। ইসলামী জ্ঞান চর্চার স্রোত রুদ্ধ হয়। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ধর্মীয় শিক্ষার একটা ধারা প্রবাহিত থাকে, কিন্তু ইসলামী জ্ঞানচর্চা বলতে যা বুঝায় তা মূলত স্তব্ধ হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, বরং বিপরীত ধারা এ ক্ষেত্রে প্রবল হয়ে ওঠে। একদিকে সদ্য আসা পাশ্চাত্য জ্ঞান ও জীবন দর্শন এবং অন্যদিকে স্থানীয় প্রাচীন মুশরিকী জ্ঞান ও জীবন দর্শনের চর্চা বিপুল ব্যাপকতা লাভ করে। ধীরে ধীরে মুসলমানদের মানস জগতে ইসলামী চিন্তার ব্যাপারে সংশয়ের মেঘ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। মুসলিম সমাজে দুর্বল ঈমানদারের সংখ্যা বাড়তে থাকে। দু'শো বছরের ইংরেজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দাসত্ব এ দেশের মুসলমানদের সচেতন শ্রেণীকে মূলত তাদের মানসিক দাসে পরিণত করে। আধুনিক শিক্ষা যতই বিস্তার লাভ করেছে ততই এই দাসত্বের পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিমধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা এই সমাজ পরিবেশে যতটুকু বিস্তার লাভ করতে পেরেছিল তাও পাশ্চাত্য চিন্তার প্রবল জোয়ারের মুখে নিজেকে শুধু টিকিয়ে রাখতেই ব্যস্ত ছিল। অগ্রবর্তী হয়ে পাশ্চাত্য চিন্তার দুর্গে হানা দেবার কোন ক্ষমতাই তার ছিল না। ফলে দু'শো বছরের মধ্যে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা আমাদের দেশের ইসলামী চিন্তার সমস্ত

প্রাচীর তছনছ করে দিয়েছে। ব্যক্তির নামটুকু মুসলমান আছে ঠিকই (আবার আজকাল নামের মধ্য থেকেও মুসলমানিত্বের গন্ধটুকুও উঠে যেতে শুরু করেছে) কিন্তু বুকের খাঁচায় যে ঈমানটুকু তিনি সযত্নে ধরে রেখেছেন তার মধ্যে শিরক ও ইসলামের বিপরীতমুখী চিন্তা ও আকীদা বিশ্বাসের প্রাবল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ঈমানকে নিস্তেজ করে রেখেছে।

এই অবস্থায় আমরা লাভ করেছি স্বাধীনতা আটতিরিশ বছর আগে একবার এবং চৌদ্দ বছর আগে আর একবার।* এই স্বাধীন দেশের মুক্ত পরিবেশে বাস করে আমরা শতকরা পঁচাশি ভাগ মুসলিম জনগোষ্ঠীর এ দেশে ইসলামী জীবন দর্শন ও ইসলামী চিন্তাধারার প্রাধান্য মেনে নিতে আগ্রহী নই। আমাদের শিক্ষিত সমাজের বৃহত্তম অংশ ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের মেধা, অর্থ, শক্তি, সামর্থ সব কিছুই ব্যয় করে যাচ্ছে। আর শিক্ষিত সমাজের একটি অংশ ইসলামী চিন্তা ও জীবন দর্শনের প্রতি তাদের আনুগত্য বজায় রাখতে চায় ঠিকই কিন্তু এর প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে তারা প্রস্তুত নয়। তবে সাম্প্রতিক কালের ইসলামী আন্দোলনগুলোর কারণে মুসলিম সমাজের একটি সচেতন অংশ ইসলামী চিন্তাধারা ও ইসলামী জীবন দর্শনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে উঠছে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা সর্বস্ব কুরবানী করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এটা শিক্ষিত ও সচেতন শ্রেণীর অবস্থা। সাধারণ মানুষ কোথায় অবস্থান করছে? গত দু'-আড়াইশো বছর থেকে সাধারণ মুসলমানদের একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাদেরকে প্রায় সর্বহারার শ্রেণীতে ফেলা যায়। ধর্মীয় অজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক বিকৃতি তাদের যেন আজন্মের পাওনা। ধর্মের প্রতি তাদের আসক্তি বর্তমানে আর আগের পর্যায়ে নেই। ধর্মের সাথে তাদের সংযোগও এখন দ্রুত শিথিল হতে চলেছে। মুসলিম শিক্ষিত সমাজের বৃহত্তর অংশের অবদান এ ব্যাপারে সবচাইতে বেশী। সাধারণ মুসলমানদের জীবনের সকল সমৃদ্ধি-স্বচ্ছলতা-শান্তি হরণ করে নিয়ে মুসলিম শিক্ষিত সমাজের এ বৃহত্তর পাশ্চাত্যবাদী অংশটি তাদের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। নিজেরা ভোগ ও আয়েশে মত্ত হয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে তারা প্রতিদিন কয়েকবার সমৃদ্ধির কল্পলোকে ভ্রমণ করিয়ে আনছে। তারা বড় বড় পরিকল্পনা তৈরী করছে। যার ফলে তাদেরই সমৃদ্ধি বাড়ছে আর এই সাথে বেড়ে যাচ্ছে সাধারণ মুসলমানদের দারিদ্র ও দুরবস্থা।

---

* নিবন্ধটি লেখা হয় ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে।

কিন্তু মুসলিম সমাজের এই বৃহত্তম ইসলাম বিরোধী শ্রেণীটির জন্য বর্তমানে দু'টি বিষয় সবচেয়ে বেশী উৎকণ্ঠা ও ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দু'টি বিষয় তাদের রাতের ঘুম ও দিনের সুখ হারাম করে দিয়েছে। এর একটি হচ্ছে, তাদের কেন্দ্রীয় তথা মৌল প্রাণশক্তি পাশ্চাত্য চিন্তার সারা দুনিয়াব্যাপী ব্যর্থতা এবং বিগত প্রায় অর্ধশতক থেকে কোন সমধর্মী বিকল্প সৃষ্টিতে তার অপারগতা। ফলে সারা বিশ্বের হতাশা ও নৈরাজ্যের শিকার তারাও হয়েছে। এভাবে তাদের শক্তির কেন্দ্রমূল অন্তসারশূন্য হতে চলেছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় সঠিক ও যথার্থ ইসলামী চিন্তার পুনরুজ্জীবন। ইসলামী চিন্তার এ পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টায় সবচেয়ে বেশী অবদান রেখেছে মুসলিম দেশগুলোয় ছড়িয়ে থাকা ইসলামী আন্দোলনগুলো।

অবস্থার এই পটপরিবর্তনে বৃহত্তম মুসলিম ক্ষমতাসীন শ্রেণীটি সর্বত্র নিজেদের পাঁয়তারা বদলাতে ব্যস্ত। এ সময় তাদের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের যে দিকটি বড় হয়ে আমাদের সামনে ভেসে উঠছে তাকে এক কথায় মুনাফেকী বলা যায়। অর্থাৎ তারা যা চায় তা তারা নিজেরা ভাল করেই জানে। কিন্তু সাধারণ জনতার সামনে তারা নিজেদের প্রকাশ করে ভিন্নরূপে। ইসলামের ও মুসলিম জনগণের সহমর্মী, সহযোগী ও সহায়তাকারী হিসেবে তারা নিজেদেরকে পেশ করে চলছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিজেদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামের শিকড় কাটার যাবতীয় ব্যবস্থা পাকা পোক্ত করছে। এই শ্রেণীটির মুনাফেকী চরিত্র সাধারণ মুসলমানদের চরিত্র বিনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই বর্তমানে মুনাফেকী আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি অংশে পরিণত হয়েছে। জাতিকে এই নিফাক থেকে বাঁচানোই হবে বর্তমানের একটি জিহাদ।

১১
মুমিনের কাছে কুরবানীর দাবী

হযরত ইবরাহীমের ওপর আল্লাহর অশেষ নিয়ামত বর্ষিত হোক। আল্লাহ বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে একটি সুসন্তান দান করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে এ সন্তানের প্রতি তাঁর স্নেহ মমতা ছিল সাগরের পানির মতো অথৈ। এই এক সাগর স্নেহ মমতাও তিনি বিসর্জন দিয়েছিলেন নির্দ্বিধায় আল্লাহর একটি মাত্র ইংগিতে। তিনি নিজের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু নিজের প্রিয় সন্তানকে আল্লাহর পথে যবেহ করে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। আল্লাহর প্রতি তাঁর আনুগত্য ও প্রীতি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল।

আল্লাহর শ্রেষ্ঠ অনুগত বান্দা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ কঠিন পরীক্ষা এসেছিল তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে। সারা জীবন তিনি আল্লাহর আনুগত্যের প্রমাণ দিয়ে চলেছিলেন। আর শেষ বয়সে তিনি যে প্রমাণটি দিলেন তা ছিল পাহাড় সমান। আল্লাহর অনুগত বান্দারা এমনি করে আনুগত্যের প্রমাণ দিয়ে যান কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের প্রিয়তম বস্তুগুলোকে আল্লাহর পথে কুরবানী করে দিয়ে ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

'তোমাদের প্রিয়তম বস্তুগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা যথার্থ নেকী অর্জন করতে পারবে না।' (আলে ইমরান ঃ ৯২)।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সারা জীবন এই ত্যাগের মহড়া দিয়ে এসেছেন। নবুওয়াত লাভের সাথে সাথেই তাঁকে নিজের গোত্রের বাঁধন ত্যাগ করতে হয়। বংশ, বেরাদরী সব কিছুর মায়া বিসর্জন দিতে হয়। বিসর্জন দিতে হয় নাম ও যশের মোহ এবং ধনাঢ্যতার অহমিকা। তারপর শেষে নিজের দেশ ও জন্মভূমির মায়া বিসর্জন দিতে হয়। আর নতুন যে সমাজ ব্যবস্থা তিনি কায়েম করেন তাতে পুরাতন জাহেলী সমাজের বহু মূল্যবোধ বিসর্জন দিতে হয়, যেগুলো তাঁরা গ্রহণ করে আসছিলেন যুগ যুগ থেকে বংশ পরম্পরায়, যেগুলো তাঁদের মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। নবীর সাথে সাথে তাঁর সাহাবাগণও এ ত্যাগের মহড়ায় পিছিয়ে পড়েননি। অহী যেভাবে নাযিল হয়েছে তাঁরা তাকে সেভাবেই কবুল করে নিয়েছিলেন। যখন তাদের প্রিয় পানীয় শরাবের আসর জমে উঠেছিল। কেউ সোরাহী টেনে এনেছেন। কেউ

সোরাহী থেকে পেয়ালায় ঢেলেছেন টলটলে পানীয়। আহা, কী মদিরতা! কারোর আর দেরী সয় না। হাতের পেয়ালা গলায় ঢেলে দিতে উদ্যত হয়েছেন। আকণ্ঠ পান করে জীবন ধন্য করবেন। এমন সময় অকস্মাত সব কণ্ঠস্বর সব কোলাহল ছাপিয়ে জেগে উঠলো রসূলের দূতের কণ্ঠবাণী। গমগম করে উঠলো চারদিক। ঘোষিত হলো : মদ জুয়া হচ্ছে শয়তানের কাজ, এসব থেকে তোমরা দূরে থাকো। দেখুন ত্যাগের কি দৃষ্টান্ত। সাহাবীরা শরাবের পেয়ালা, মটকা ও সোরাহীগুলো ভেংগে নর্দমায় নিক্ষেপ করলেন। যারা গলায় ঢেলে দিয়েছিলেন, তারা গলার ভেতর আংগুল দিয়ে হড় হড় করে বমি করে ফেললেন। ড্রেনগুলো দিয়ে বর্ষার পানির স্রোতের মতো তরল পানীয়ের স্রোত বয়ে চললো।

এ ছিল সাহাবীদের ত্যাগ। তাঁরা আজীবন সংস্কার, অভ্যাস, ট্রাডিশন ও প্রগতির কোন পরোয়া করেননি। এ জন্য তাঁরা কোন হীনমন্যতায় ভোগেননি। তাঁরা তাঁদের সমস্ত খাহেশ, হৃদয়ের সমস্ত কামনা, ইচ্ছা, আকাংখা বিসর্জন দিয়েছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের একটি মাত্র হুকুমে। দুনিয়ার মাল-মাত্তা, বাড়ি-গাড়ি, স্ত্রী-সন্তান, নাম-যশ, সভ্যতা-প্রগতি সব কিছুই তাঁরা ত্যাগ করেছিলেন, বিসর্জন দিয়েছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সন্তুষ্ট করার জন্য।

মুমিন ও মুসলিমের কাছে এই ত্যাগ ও কুরবানীই হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের চিরন্তন দাবী। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এই ত্যাগ ও কুরবানী থেকে আমরা আজ অনেক দূরে সরে পড়েছি। বিদেশের ও বিজাতির যে সভ্যতা আমরা সাম্প্রতিককালে গ্রহণ করেছি তার সামান্য মোহটুকু ত্যাগ করতেও আমরা রাজী হচ্ছি না। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা, সামাজিকতার মানদণ্ড, চিন্তা ও মতবাদ সব কিছুই আজ আমাদের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ এর অনেকগুলোই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট জেনেও আমরা তা বিসর্জন দিতে পারছি না। আমরা প্রতি বছর হাজার হাজার লাখো লাখো রক্ত-মাংসের পশুর গলায় ছুরি চালাই কিন্তু আমাদের মাথার ভেতর যে বিদ্রোহী পশুটা বসে আছে এবং আমাদের হৃদয় অভ্যন্তরে যে বিজাতীয় আত্মাটা প্রতিনিয়ত অগ্নিশ্বাস ত্যাগ করে চলেছে তার গলায় ছুরি চালাতে আমরা মোটেই আগ্রহী নই। ফলে এই কুরবানী আমাদের কোন কাজে আসছে না। এই কুরবানী আমাদের যে বৃহত্তর ত্যাগের শিক্ষা দিচ্ছে সেদিকে অগ্রসর হতে না পারলে, বিদেশী সভ্যতা ও বিজাতীয় মতবাদের মোহ ত্যাগ করতে না পারলে আমাদের সমস্ত পশু কুরবানীই বৃথা যাবে।

১২
জাতির বিবেকের কাছে জিজ্ঞাসা

মানুষের সমাজ যখন থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সভ্যতার গোড়া পত্তন হয়েছে তখন থেকেই। এই সমাজকে কায়েম রাখার ও সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে দু'টি জিনিস চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে সব সময়। তার একটি হচ্ছে ভালো কাজ করা এবং অন্যটি মন্দ কাজ না করা। আপাত দৃষ্টিতে একটি ইতিবাচক ও অন্যটি নেতিবাচক মনে হলেও বাস্তবে দু'টিই ইতিবাচক হয়ে দাঁড়ায়। উভয়ের শক্তি মিলে সমাজ ও সভ্যতাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায়।

কুরআনে এই ভালো ও মন্দ কাজকে 'মারূফ' ও 'মুনকার' শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। শব্দ দু'টোর মধ্যেই এদের অর্থ ও পরিসর চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। মারূফ মানে হচ্ছে যা সবাই জানে, সবার কাছে পরিচিত। আর মুনকার মানে হচ্ছে যা সবার কাছে অপরিচিত, কেউ যাকে চিনে না। ভালো কাজকে সবাই জানে। সবাই তাকে আয়ত্ব করতে চায়। সবদেশে, সব যুগে এবং যে কোন সমাজে এটা দেখা গেছে। পৃথিবীর উন্নত সুসভ্য সমাজ থেকে নিয়ে আদিম অসভ্য সমাজেও দেখা যায় এই একই ধারা। আর মন্দ কাজ সমাজের অধিকাংশ মানুষের কাছে অপরিচিত। যে গুটিকয় মানুষ তা করে তারাও প্রকাশ্যে তার সাথে অপরিচিতির ভান করে। ভালো কাজ সবাই করতে চায়, মন্দ কাজ কেউ করতে চায় না। এটিই হচ্ছে মানুষের সমাজের স্বাভাবিক রীতি। এমন কি একদল লোক যদি খারাপ কাজ করতে চায় তাহলে আর একদল লোক তাতে বাধা দেয়। আর ভালো কাজ যদি কেউ করতে চায় এবং করতে থাকে তাহলে অন্যেরা তাতে উৎসাহ দেয় এবং সহযোগিতা করে। এভাবেই মানুষের সমাজ এগিয়ে এসেছে।

কুরআনে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ও হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিমাস সালামের যুগের জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলদের গুনাহ ও পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া এবং আল্লাহ নির্ধারিত সীমা লংঘন করার কারণে তারা বনী ইসরাঈলদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছিল তাদের প্রতি অভিশাপ দেন। তাদের সে গুনাহের কাজটি কি ছিল?

كَانُوْا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

"তারা খারাপ কাজ থেকে পরস্পরকে বিরত রাখা পরিহার করেছিল। তারা যে কর্মনীতি গ্রহণ করেছিল তা ছিল খুবই খারাপ।" —(মায়েদা : ৭৯)

মুমিনদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, মুমিন নারী–পুরুষরা পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী এই অর্থে যে তারা يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ অর্থাৎ "তারা পরস্পরকে ভালো কাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (তাওবাঃ ৭১)। ইসলামী সমাজে একে এতো বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে আল্লাহ তা'আলা এটিকে মুসলিম মিল্লাতের প্রধান দায়িত্ব হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বলা হয়েছেঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ–

"তোমরা শ্রেষ্ঠ মানব গোষ্ঠী। (কারণ) সমগ্র মানব জাতির জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ করবে ও খারাপ কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে।" (তাওবাঃ ৭১)

আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুসলিমাকে এই দায়িত্ব দিয়েই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার–এটিই হচ্ছে উম্মতে মুসলিমার আসল কাজ।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারকে এত বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন যে, এ দায়িত্বটি পালনের আওতা থেকে তিনি একটি মুসলমানকেও বাদ দেননি। এ ক্ষেত্রে সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তিনি মুসলমানদেরকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম দলটি সমাজে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও শক্তিমত্তার অধিকারী। তারা এমন পর্যায়ে অবস্থান করছে 'যেখানে তারা নিজেদের পূর্ণ ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে। দ্বিতীয় দলটির সমাজে কিছু বলার অধিকার থাকলেও পূর্ণ শক্তি প্রয়োগের অধিকার নেই। নিজেদের কোন সিদ্ধান্ত সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার তাদের নেই। আর তৃতীয় দলটির আগের দু'টি দলের মতো কোন ক্ষমতাই নেই শুধু হাত–পা গুটিয়ে নিজেদের খোলসের মধ্যে বসে থাকা ছাড়া। তারা নিজেদের মনের রাজ্যের রাজা কিন্তু অন্যের মনের রাজ্যে প্রবেশের অধিকারই তাদের নেই। এই তিনটি দলের জন্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের দায়িত্ব পালন করাকে ফরয করে দিয়েছেন। প্রথম দলটিকে বলা হয়েছে, সমাজে কোন

'মুনকার'–খারাপ ও অন্যায় কাজ হতে দেখলে শক্তি প্রয়োগ করে তা বন্ধ করতে হবে এবং তার জায়গায় 'মারূফ'–ভালো ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দ্বিতীয় দলটিকে বলা হয়েছে, যেহেতু তাদের শক্তি প্রয়োগের অধিকার নেই তাই তারা নিজেদের অধিকারের মধ্যে অবস্থান করে ক্ষমতার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করবে এবং মুনকারের বিরুদ্ধে হামেশা সোচ্চার থাকবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের কারণে ধীরে ধীরে তাদের কণ্ঠস্বর শক্তি অর্জন করবে এবং অবশেষে একদিন অন্যায়কে উৎখাত করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসে যাবে। আর তৃতীয় দলটির দায়িত্ব সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তারা মনে মনে মুনকারকে ঘৃণা করবে। নিজেদের মধ্যে কোনদিন তাকে প্রশ্রয় দেবে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা আক্রোশে ফুঁসতে থাকবে। এরপর রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ ওয়া যালিকা আদ'আফুল ঈমান–আর এটিই হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়। একে দুর্বলতম পর্যায় বলার একটা বিশেষ অর্থই হচ্ছে এই যে, এই পর্যায়ে কোন মুসলমান অবস্থান করুক এটা ইসলামের অভিপ্রেত নয়। তাকে এই তৃতীয় পর্যায় থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং দ্বিতীয় পর্যায় থেকে প্রথম পর্যায়ে উন্নীত হবার চেষ্টা করতে হবে।

বর্তমানে আমাদের দেশে যে সামাজিক কাঠামোয় ও রাজনৈতিক পরিবেশে আমাদের অবস্থান তাতে ওপরের ঐ দায়িত্ব পালনে আমাদের ভূমিকা কি? আমরা কি আমাদের যথার্থ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি? আমরা তো একটা স্বাধীন মুসলমান দেশে বাস করি। অর্থাৎ রসূলুল্লাহর (স) সমাজ বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে বিচার করলে আমরা প্রথম দলটিতে অবস্থান করছি বলা যায়। তাহলে মুনকারকে উৎখাত করে মারূফকে প্রতিষ্ঠিত করাই হবে আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু আমরা এ দায়িত্ব পালন করতে পারছি না। প্রায় অর্ধশতক আগে প্রায় আমাদেরই মতো নিরুপায় বৃটিশ ভারতের মুসলমানদের জন্য আল্লামা ইকবাল একটা কথা বলেছিলেন। একদল ইংরেজ পরস্ত মুসলমান বলে বেড়াতো, মুসলমানদের আর কি চাই, তারা তো এখানে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন ও ধর্মকর্ম করতে পারছে? এর জবাবে ইকবাল বলেছিলেন ঃ

'হ্যায় মামলিকাতে হিন্দ মেঁ ইয়াক তুরফা তামাশা

ইসলাম হ্যায় মাহবুস মুসলমান হ্যায় আযাদ।'

অর্থাৎ বৃটিশ ভারতে এমন এক অদ্ভুত অবস্থায় আমরা বাস করছি যে, এখানে ইসলাম কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে কিন্তু মুসলমানরা স্বাধীনভাবে

বিচরণ করছে। মুসলমানরা ধর্মকর্ম করতে পারছে ঠিকই কিন্তু সমাজে তারা আমর বিল মারূফ ও নাহী নানিল মুনকারের দায়িত্ব পালন করতে পারছে না।

আমাদের দেশেও ইসলামের এই একই দশা ঘটলো নাকি? জাতির বিবেকের কাছে এটিই আমাদের জিজ্ঞাসা।

১৩
দায়িত্ব কতটুকু পালন করছি

পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালে আমাদের দেশটি এতই ছোট্ট একটা ভূখণ্ড মনে হবে যা প্রথম দৃষ্টিতে নজরে পড়ার মতো নয়। কিন্তু বিপুল জনসংখ্যা ছাড়াও আরো একটি বিষয় আমাদের দেশের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। তা হচ্ছে এর ইসলামী সত্তা। বাংলাদেশে নয় কোটি মুসলমানের বাস, এটিই হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই নয় কোটি মুসলমানের স্বাধীন সত্তা রয়েছে। অর্থাৎ তারা তাদের ইচ্ছা আশা-আকাংখার স্বাধীন ব্যবহার এবং তাদের ব্যক্তি ও জাতি সত্তাকে স্বাধীনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। নয়তো পৃথিবীতে এমন বহু দেশ রয়েছে যেখানে কোটি কোটি মুসলমানের বাস কিন্তু তারা তাদের ব্যক্তি ও জাতি সত্তার স্বাধীন ও যথেচ্ছ ব্যবহারের ক্ষমতা রাখে না।

বাংলাদেশের মুসলমানদের এই স্বাধীন সত্তার কারণে তাদের গুরুত্ব যেমন বেড়ে গেছে তেমনি তাদের দায়িত্বও বেড়ে গেছে। এই দায়িত্বের অনুভূতি তাদের মধ্যে কতটুকু আছে সেটি অবশ্য পর্যালোচনার বিষয়। মুসলমান হবার কারণেই তাদের ওপর এ দায়িত্ব এসে গেছে। দুনিয়ার যেখানেই যে মুসলমান থাক না কেন তার ওপর এ দায়িত্ব অবশ্যি বর্তাবে। তবে একটা স্বাধীন ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধিবাসী অধ্যুসিত দেশের বাসিন্দা হবার কারণে বাংলাদেশের মুসলমানদের দায়িত্ব অনেক বেশী। মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে, যে রব-প্রতিপালক-স্রষ্টা ও বিশ্ব জাহানের সর্বময় কর্তার গোলামী তারা গ্রহণ করেছে সেই রবের সাথে তারা মানুষকে পরিচিত করাবে এবং তাঁর গোলামী, দাসত্ব ও বন্দেগীর দিকে মানুষকে আহবান জানাবে। ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানরা তাদের এ দায়িত্ব পালন করেছে পুরোপুরি। পরবর্তীকালেও কয়েকশো বছর পর্যন্ত এ কাজ অব্যাহত ছিল। তারপর ধীরে ধীরে এর মধ্যে মন্থরতা আসে। এখন অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌছেছে যে, মুসলমানদের মধ্যে এ দায়িত্বের অনুভূতিই খতম হয়ে গেছে। এমনকি অন্যের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া তো দূরের কথা মুসলমানরা নিজেরাই ইসলাম সম্পর্কে খুব কমই অবহিত। ইসলামের বিস্তারিত জ্ঞান এখন খুব কম মুসলমানই রাখে। ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান রাখে এরকম মুসলমানের সংখ্যাও নগণ্য। সত্যিকার অর্থে মুসলমানদের ওপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই হাদীসটি এখন পুরোপুরি প্রযোজ্য যাতে বলা হয়েছে :

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا - سَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ (مسلم)

অর্থাৎ ইসলামের সূচনা হয়েছিল অপরিচিত ও অনাত্মীয় পরিবেশে এবং আবার এমন এক যুগ আসবে যখন ইসলাম তার সেই প্রাথমিক সূচনাকালের পরিবেশে ফিরে যাবে। বর্তমানে আমরা সেই যুগেই অবস্থান করছি। ইসলাম আজ মুসলমানদের কাছেই অপরিচিত।

ইসলামের মতো একটা মহান আদর্শ, বাস্তবমুখী ও পূর্ণাংগ জীবন বিধান আজ মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে গেছে। আর মসজিদ আমাদের কর্মজীবন থেকে আলাদা হয়ে একপাশে আশ্রয় নিয়েছে। তাই ইসলাম সম্পর্কে কোন কথা বলার উদ্যোগ নিলে লোকেরা মনে করে বুঝি তাদেরকে ধর্মীয় কিছু আচার অনুষ্ঠানের কথা শুনানো হবে আর এ অনুষ্ঠানগুলো পালন করতে হবে মসজিদের মধ্যে। লোকেরা এটাই পছন্দ করে। এটাই তাদের অভিপ্রেত। এর বাইরে ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা করতে তারা প্রস্তুত নয়। এর বাইরে যতো বিষয় আছে সবের ব্যাপারে তারা অন্যের দ্বারস্থ হবে। রাজনীতির ব্যাপারে তাদের আদর্শ পশ্চিমী গণতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক শ্রেণী একনায়কতন্ত্র —বাস্তবক্ষেত্রে কোথাও কোথাও বস্তাপচা রাজতন্ত্র বা সামরিক ডিকটেটরশিপ। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাদের আদর্শ পশ্চিমী পুজিবাদ, মার্কসবাদ, কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র—বাস্তবে কোথাও আবার পুজি-সমাজতন্ত্র, অর্থাৎ জোড়াতালি অর্থনীতি। শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পশ্চিমী নীতি, ব্যবস্থা ও ধাঁচই তাদের আদর্শ। সমাজনীতি, যোগাযোগ, প্রচার ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপারে ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু তাদের আদর্শ।

জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র থেকে ইসলামকে এভাবে কেটে মসজিদের মধ্যে কোণঠাসা করে দেয়ার এ ব্যবস্থা আসলে খৃস্টীয় ষড়যন্ত্রের একটি অংশ বিশেষ। খৃস্টীয় চার্চ যেমন তাদের ধর্মকে গীর্জার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে জীবনের অন্য আর যাবতীয় বিষয় রাষ্ট্র ও পার্লামেন্টের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, রাষ্ট্র এবং পার্লামেন্ট যেভাবে চায় সেভাবে মানুষের জীবন পরিচালনা করবে, ঠিক এ ধ্যান-ধারণাটাই তারা মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়েছে। নয়তো অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতেও যখন বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের পতন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তখনও কুরআন ও সুন্নাহই ছিল মুসলিম দেশগুলোর আইনের উৎস। উপমহাদেশে মোগলদের এবং তুরস্কের উসমানী খেলাফতের শেষ দিনগুলোর

ইতিহাস আলোচনা করলে এ কথার যথার্থতা প্রমাণিত হবে। কাজেই ইসলামের মধ্যে এ বিকৃতি সাধন খৃষ্টীয় চার্চেরই কারসাজি এতে সন্দেহ নেই।

এ ষড়যন্ত্রের জাল কেটে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের "সৃষ্টি করেছিলেন মানব জাতির কল্যাণে নিবেদিত করে শ্রেষ্ঠ মানবগোষ্ঠী হিসেবে মানুষকে ভালো কাজের আদেশ করার ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার এবং একমাত্র আল্লাহর ওপর ঈমান আনার জন্য।" আমাদের সৃষ্টির এ উদ্দেশ্য অবশ্যি আমাদের পূর্ণ করতে হবে। এ জন্য আমাদের সজাগ ও সতর্ক শ্রেণীকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে যারা ইসলামের যথার্থ জ্ঞান রাখেন এবং যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আন্দোলন পরিচালনা করে যাচ্ছেন। ইসলামের যথার্থ ও বিস্তারিত জ্ঞান সাধারণ মানুষের পর্যায় পর্যন্ত পৌছিয়ে দিতে হবে। চাকুরিয়া, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, কৃষক, শ্রমিক, মুটে, মজুর থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত দেশের সর্বস্তরে এ জ্ঞানের বিস্তৃতি সাধন করতে হবে। ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভের পর এক ব্যক্তিকে যেমন সহজে ইসলামের ব্যাপারে বিভ্রান্ত করা যাবে না তেমনি তার মধ্যে দায়িত্বের সঠিক অনুভূতিও জাগবে। এভাবে আমরা নিজেরা ইসলামের সঠিক জ্ঞান লাভের পর তবেই না অন্যের কাছে এর দাওয়াত পৌছাতে পারবো। এবং মানুষকে তার রব–আল্লাহর সাথে পরিচিত করাতে এবং আল্লাহর বান্দায় পরিণত করতে পারবো।

১৪
আমরা কি দায়িত্ব পালন করছি?

মুসলমান কোন বিশেষ জাতি বা বিশেষ দেশের অধিবাসীর নাম নয়। একটি আকীদা-বিশ্বাস-চিন্তা-ভাবধারা অবলম্বনকারী জনগোষ্ঠীর নাম মুসলমান। দুনিয়ার যে কোন এলাকায়ই বাস করুক না কেন তারা গভীর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে জড়িত একটি জনসমষ্টি। মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে আহবান করাই হচ্ছে তাদের সার্বিক দায়িত্ব। মুসলমান যেখানেই বাস করুক, যে কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি হোক না কেন মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে আহবান করার দায়িত্ব থেকে তার অব্যাহতি নেই। কুরআনে মুসলমানদের দায়িত্ব বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ -অর্থাৎ তোমাদের উত্থান হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্য। সমগ্র মানব জাতিকে "আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার" করার দায়িত্ব মুসলমানদের ওপর অর্পিত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ যে কাজটা করতে বলেছেন, মানুষকে সেটা করার হুকুম দেয়া ও যেটা করতে মানা করেছেন সেটা থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব হচ্ছে মুসলমানের। আল্লাহর এই বিধি-নিষেধকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় আল্লাহর দীন।

এই আল্লাহর দীনের অনুসারী আমরা এ দেশের নয় কোটি মুসলমান। একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের অধিকারী আমরা। যে কোন অবস্থাতেই আমাদের এই দেশে আমাদের আল্লাহর দীনের আহবায়কের দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে আল্লাহর দীনের অনুসারী করতে হবে। আমাদের সন্তানদেরকে আল্লাহর দীনের অনুসারী করে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের সমগ্র জীবন পরিসরে আল্লাহর দীনই হবে প্রধান প্রতিষ্ঠিত শক্তি।

এবার পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে এসব ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা কোন্ ক্ষেত্রে কতখানি সচল। এমনিতে নিজেদেরকে ভালো মুসলমান বলে দাবী করার অহমিকা আমাদের কারোর মধ্যে কম নেই। ইসলামের ঐতিহ্য আমাদের হাজার বছরের এবং তারো চেয়ে বেশী সময়ের পুরানো। বাংলার নগর-বন্দর-গ্রাম সূফী-দরবেশদের মাজার-কবরে পরিপূর্ণ। মসজিদের সংখ্যাও অগণিত। পাখির কল কাকলির চাইতে মসজিদের আযানের শব্দ অনেক বেশী। মুসল্লী এতো বেশী, যা বুঝি দুনিয়ার আর কোন দেশে নেই। লেবাসে-পোশাকে মুসলমানিত্বের বড়াইও কিছু কম নেই। দূর থেকে

আমাদের দিকে এক নজর তাকালে মনে হবে ইসলামই আমাদের জীবন পরিসরে কেন্দ্রীয় শক্তি, আমাদের সমাজে-রাষ্ট্রে ইসলামী ব্যবস্থাই সচল এবং আমাদের সন্তানরা ইসলামের পথেই গড়ে উঠছে। আবার আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধাররাও যখন উঠতে বসতে ইসলামের জয়গান গেয়ে ফেরেন এবং সভা-সমিতিতে দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা দিতে থাকেন তখন এ ব্যাপারে আর কোন প্রকার সন্দেহই থাকে না।

কিন্তু বাস্তবে আমরা কি অবস্থায় আছি? ইসলাম আমাদের জীবনে কেন্দ্রীয় শক্তি তো দূরের কথা কোন প্রভাবশালী শক্তির ভূমিকা পালন করছে কি? জীবনের বিভিন্ন কাজে-কারবারে আমরা ইসলামী অনুশাসনের কতটুকু পরোয়া করি? কোন একটি কাজ ইসলামী অনুশাসন বিরোধী জানার পরও আমরা তা পরিহার করার কতটুকু চেষ্টা করি? বিভিন্ন কাজকে ইসলামের অনুশাসন মোতাবিক সম্পাদন করার আকাংখাই বা আমাদের কতটুকু? আমাদের জীবনের সবক্ষেত্রে ইসলাম বিরোধী চিন্তা ও ভাবধারা প্রসারিত। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও স্থানীয় মুশরিকী সংস্কৃতি আমাদের সবটুকু গ্রাস করে নিয়েছে। আমাদের শুধু বাইরের প্রলেপটুকু ইসলামী বা মুসলিম কিন্তু ভেতরে বয়ে চলছে অনৈসলামী চিন্তা ও ভাবধারার স্রোত। স্থানীয় মুশরিকী চিন্তা-ভাবধারার সাথে সাথে আবার পাশ্চাত্যবাদের কাছেও আমরা আত্মসমর্পণ করেছি বড় বেশী। আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আচার-আচরণে সর্বত্র এর অপ্রতিহত প্রভাব। আর সবচাইতে মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই প্রভাব সম্পর্কে আমাদের সচেতনতাই যেন বিলুপ্ত। আমরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে জানি কিন্তু আমাদের জীবনে ইসলামী মতাদর্শকে প্রাধান্য দিতে লজ্জা অনুভব করি। অন্য কথায় বলা যায়, অনৈসলামী মতাদর্শই বর্তমানে আমাদের জীবনে প্রধান ও কেন্দ্রীয় শক্তি।

আমাদের সমাজে ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ইসলাম তো কোন শক্তি হিসেবেই গণ্য নয়। সেখানে 'তাগুতী শক্তি'ই মূল ক্ষমতার অধিকারী, যা থেকে আল্লাহ আমাদের দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

أُعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ - (النحل : ٣٦)

"আল্লাহর ইবাদাত করো এবং আল্লাহ বিরোধী তাগুতী শক্তি থেকে দূরে থাকো।"

কিন্তু তাগুতী শক্তি থেকে দূরে সরে না গিয়ে আমরা তাকে মাথায় তুলে নিয়েছি। তার নির্দেশে আমাদের রাষ্ট্রের ও সমাজের সব কাজ-কারবার চলছে।

আইন তার কাছ থেকেই গ্রহণ করছি। বিধান তার কাছ থেকেই নিচ্ছি। ভালো–মন্দের, ন্যায়–অন্যায়ের সব হুকুম সে–ই দিচ্ছে এবং তাই আমরা বিনা বাক্য ব্যয়ে পালন করে চলছি। আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ইসলাম কোন শক্তি হিসেবেই গণ্য হয়নি। কুরআনকে এখানে সযত্নে শেলূফে উঠিয়ে রাখা হয়েছে। শুধু রাষ্ট্রীয় কাজ–কারবার শুরু করার সময় বরকতের জন্য তা থেকে কিছু তেলাওয়াত করা হয়। এভাবেই আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ক্ষেত্রে ইসলামী চিন্তা ও ভাবধারাকে মর্যাদা দান করেছি।

আমাদের সন্তানদেরকে আল্লাহর দীনের অনুসারী করে গড়ে তোলার কোন আকাংখাই আমাদের নেই। বিগত একশো সোয়াশো বছর থেকে তাদেরকে আমরা কুফরী শক্তির জিম্মায় সোপর্দ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি। আগে না হয় ইংরেজরা প্রভুভক্ত কেরাণী ও উপনিবেশবাদীদের স্বার্থ রক্ষাকারী নেটিভ গোষ্ঠী তৈরী করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছিল কিন্তু বর্তমানে এই স্বাধীন দেশে কাদের স্বার্থে এই উপনিবেশবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে? এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতিতে ইসলামকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি কেন? শিক্ষার্থীর মন–মস্তিষ্কে ইসলাম বিরোধী চিন্তার চাষাবাদ করা হচ্ছে। সেখানে অনৈসলামী চিন্তার ফলে ফুলে সুশোভিত হবার সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে সে যা কিছু খোরাক পাচ্ছে তার সবটুকুই তাগুতের ভাণ্ডার থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে। এরপর তার কাছ থেকে ইসলামের ফসল আশা করা যেতে পারে কেমন করে?

এসব দিক পর্যালোচনা করার পর সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলামের আহবায়কের দায়িত্ব পালনে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি। ফলে জীবন ক্ষেত্রে আমরা প্রতিদিন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এখনো সতর্ক না হলে ভবিষ্যত আমাদের জন্য আরো ভয়াবহ দিনের সংকেত বয়ে আনবে।

নবীর ওয়ারিস আলেমগণের দায়িত্ব

ইল্‌ম ও আলেমের গুরুত্ব ইসলামে সবচাইতে বেশী। ইল্‌ম হচ্ছে জানা, জ্ঞান লাভ করা, জ্ঞান অনুসন্ধান করা ও জ্ঞানের চর্চা করা। আর আলেম হচ্ছে যে জানে, যে জ্ঞান লাভ করে, জ্ঞান অনুসন্ধান করে ও জ্ঞান চর্চা করে। আবার ইসলামে সবচেয়ে বড় জ্ঞান বলা হয়েছে কুরআনের জ্ঞানকে। কারণ কুরআনই হচ্ছে যথার্থ ও নির্ভুল জ্ঞানের প্রধানতম উৎস। কুরআনে যে জ্ঞান পরিবেশন করা হয়েছে তার মধ্যে কোন ভেজাল ও মিশেল নেই। সন্দেহের ছিটেফোটাও সেখানে নেই। এ জ্ঞান পরিবেশনার শুরুতেই দৃঢ় কণ্ঠে বলে দেয়া হয়েছে ঃ লা রাইবা ফীহ–এর মধ্যে সন্দেহের কোন প্রকার অবকাশই নেই। তাই কুরআনের জ্ঞান চর্চাকারীদেরকে ইসলামী সমাজে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ – رواه البخارى

"যারা কুরআনের জ্ঞান চর্চা করে মুসলিম উম্মার মধ্যে তারাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।"

মনের মধ্যে আল্লাহ ভীতি সৃষ্টি করাকে ইসলামে জ্ঞান চর্চার লক্ষ স্থির করা হয়েছে। জ্ঞান চর্চার পরেও যদি অহম বৃদ্ধি পায়, আত্মঅহমিকার মধ্যে মানুষ ডুবে যায় তাহলে তো জ্ঞান চর্চা মানুষের অকল্যাণ ও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর কুরআনের জ্ঞান এমন এক সম্পদ, যা মানুষের মনে সত্যিকার আল্লাহ ভীতি সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। আলেমদের সম্পর্কে কুরআনে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা তাঁকে যথার্থই ভয় করে তারা হচ্ছে আলেম সমাজ– اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا । অন্য কথায় বলা যায়, ইল্‌ম অর্জন করার পরও যাদের মনে যথার্থ আল্লাহভীতি সৃষ্টি হয়নি, দীন ও দুনিয়ার বিভিন্ন কাজ করার ক্ষেত্রে যারা আল্লাহ ও রসূলের হুকুম ও শরিয়াতের বিধানের পরোয়া করে না তারা আসলে আলেম নয়, আলেম নামধারী মাত্র।

এই যথার্থ আলেমদের দায়িত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিকে বলেছেন ঃ اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءِ

–আলেমগণ হচ্ছেন নবীদের উত্তরাধিকারী। আবার অন্যদিকে বলেছেন ঃ عُلَمَاءُ اُمَّتِىْ كَاَنْبِيَاءِ بَنِىْ اِسْرَائِيْل –আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীদের সমতুল্য। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বক্তব্য দু'টি থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উম্মতে মুসলিমার মধ্যে নবীদের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করছেন আলেমগণ। নবী যে দায়িত্ব পালন করে চলছিলেন সে দায়িত্ব আলেমদেরকেই পালন করতে হবে। নবী বিদায় নিয়েছেন কিন্তু নবীর কাজ তো খতম হয়নি। কারণ নবী যাদের মধ্যে কাজ করেছিলেন তারা তো দুনিয়ার বুক থেকে অন্তরহিত হয়ে যায়নি। বরং তাদের বংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। যে সমস্যাগুলো নবী সমাধান করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর পরবর্তীকালে সেগুলো আরো জটিল হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সেগুলো আরো জটিল হতে থাকবে। নবী যেমন সেই সমস্যাগুলো সমাধানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তেমনি আলেমদেরকেও এই সমস্যাগুলো সমাধানের দায়িত্ব নিতে হবে।

(১) এই জন্য নবীকে আল্লাহ সরাসরি যে জ্ঞান দান করেছিলেন আলেমগণকে কুরআন সুন্নাহর মাধ্যমে সেই জ্ঞানের উৎসের সন্ধান লাভ করতে হবে।

(২) নবী যে উন্নত চরিত্র গুণে গুণান্বিত হয়েছিলেন আলেমগণকেও সেই চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করতে হবে। নবী ও তাঁর সাহাবীদের একটি শ্রেষ্ঠ চারিত্রিক গুণ বর্ণনা করে কুরআন বলছে ঃ

اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ – الفتح : ٢٩

"তারা কাফেরদের প্রতি অতি কঠোর এবং নিজের মুমিন ভাইদের প্রতি অত্যন্ত কোমল ও সদয়।"

আলেমদেরকেও তাই হতে হবে। যারা মাঠে ময়দানে ইসলামের বিরোধিতা করে, যাদের সমগ্র জীবন ইসলাম বিরোধী চিন্তা ও দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, ইসলামী আদর্শের প্রতি যাদের কানাকড়িও বিশ্বাস নেই, ইসলামকে ধ্বংস করাই যাদের জীবনের মূল লক্ষ, তাদের প্রতি আলেমদের হতে হবে কঠোর আর যারা ইসলামে বিশ্বাস করে, ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতেই যারা নিজেদের জীবন গড়ে তুলছে, ইসলামী জীবন বিধান দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করাই যাদের জীবনের প্রধানতম লক্ষ, তাদের সাথে মত ও পথের হাজারো বিরোধ সত্ত্বেও আলেমদেরকে হতে হবে কোমল। অর্থাৎ ইসলাম বিরোধীদের সাথে যেখানে মতাদর্শের ক্ষেত্রে কোন আপোশ

মনোভাব স্থান পাবে না সেখানে ইসলাম সমর্থকদের সাথে প্রথম পর্বেই আপোশ মনোভাবই হবে মৌল নীতি। আলেমগণ এ নীতি বিচ্যুত হলে তাঁরা নবীর আদর্শ, চরিত্র, নীতি ও পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন বলে প্রমাণিত হবে।

(৩) নবী আল্লাহর যে সত্য দীনকে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন এবং প্রচলিত সমস্ত ধর্ম, মতবাদ ও জীবনাদর্শকে বাতিলের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছিলেন আলেমগণকেও সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। নবীর সত্য দীন আজ মুসলিম দেশ ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত নেই। অন্য মতবাদ, জীবন দর্শন ও সভ্যতার রাহুগ্রাসে তার সমগ্র সত্তা আচ্ছন্ন। তাকে মুসলিম সমাজে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এটা মূলত আলেমদের দায়িত্ব। অন্য কেউ যদি এ দায়িত্ব পালন করে তাহলে আলেমগণ তাদের সাথে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবেন। কিন্তু অন্যেরা এ ময়দানে সংগ্রাম ও সাধনায় প্রবৃত্ত হলে আলেমগণ তাদেরকে বিষ নজরে দেখবেন, এটা আলেমদের দায়িত্ব পালন নয়, দায়িত্বের প্রতি অবহেলা এবং দুনিয়ার স্বার্থের মোহ হিসেবে গণ্য হবে।

১৬

ইসলামের মধ্যে অসংগতি দেখেন যারা

আমাদের দেশে একদল লোক ইসলামী জীবন বিধানের মধ্যে অনেক অসংগতি দেখতে পান। আধুনিক জীবন যাত্রার সাথে ইসলামী জীবন বিধানের অনেক পুরানো রীতি খাপ খায় না বলে তারা মনে করেন। আধুনিক সমাজ পরিবেশে মানুষের মধ্যে যে দুর্নীতি, প্রতারণা ইত্যাদি ঠাঁই নিয়েছে তার মোকাবিলা করার ক্ষমতা ইসলামের সহজ সরল বিধানের নেই। মোটকথা তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ইসলাম স্থবির, প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থার মোটেই উপযোগী নয়।

আবার তাদের একটি দল যারা নিজেদেরকে ইসলামের বুদ্ধিমান সমালোচক বা পর্যবেক্ষক বলে মনে করেন, তারা সরাসরি ইসলামকে অচল না বলে গত সাত আট'শো বছর থেকে তার মধ্যে একটা অনড় স্থবিরতা চিহ্নিত করে তার বর্তমান অবস্থাকে অচল বলে ঘোষণা করেন। আর এরি ভিত্তিতে সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটির বিরুদ্ধে একটি সংশয়ের আবর্ত সৃষ্টি করেন।

ইসলামী জীবন বিধানের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনকারী এই গোষ্ঠীকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এদের একটি দলের ইসলামের ওপর আগা সে গোড়া কোন বিশ্বাস নেই। তারা মুসলমান পরিবারে বাস করে। মুসলমানদের সাথে ওঠাবসা করে। লেনদেনও তাদের মুসলমানদের সাথে হয়। সম্ভবত প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার অনিবার্যতায় এ ক্ষেত্রে তাদের কিছু করার নেই বলে তারা মনে করেন। তবে তাদের ভাবসাব দেখে মনে হয় এই বাহ্যিক মুসলমানিত্বটুকুর (যতটুকু তাদের মধ্যে বাহ্যত আছে বলে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি মনে করতে পারেন) খোলস কেটে বেরিয়ে আসতে পারলেই যেন তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন। দ্বিতীয় দলটির ইসলামের প্রতি সামগ্রিকভাবে বিশ্বাস থাকলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা ইসলামের ওপর ভরসা করতে পারেন না। কি জানি হাজার চৌদ্দ'শো বছর আগে হয়তো এটা মানুষের জীবন-বিধান হতে পেরেছিল। তখনকার সমাজে তেমন জটিলতা ছিল না। সমস্যাও ছিল কম। জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও তেমন উন্নতি হয়নি। আর আজকের বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগে মানুষের অতি অনগ্রসর যুগের একটি বিধান কেমন করে কার্যকর হতে পারে? হাঁ, ইজতিহাদের কথা বলা হয় ঠিকই। কিন্তু কে

ইজতিহাদ করবে? সেই হৃদয়, সেই জ্ঞানবত্তা, সেই দুরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের অভাব। আর সর্বোপরি হাজার বছরের মরচে পড়া ব্যবস্থাকে আবার ঝালাই করে কার্যকর করা সম্ভবপর নয়। কাজেই ধর্মকর্মের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যবস্থাকে ঠিক রেখে জাগতিক বিভিন্ন ব্যাপার-স্যাপারে তার মধ্যে প্রয়োজনমতো কাটাছেঁড়া ও পরিবর্তন করে নেয়া দরকার। তৃতীয় আর একদল লোকের ইসলামের প্রতি বিশ্বাস আছে ঠিকই, কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঝড়-ঝাপটায় তাদের বিশ্বাসের খুঁটি নড়ে যায়। তাদের দৃষ্টিতে ভালোমতো বা উন্নত কিছু ইসলামী ব্যবস্থার সাথে জোড়াতালি লাগিয়ে দিতে পারলে ভালো হয়। তাহলে ইসলাম যুগোপযোগী হয়ে যায় এবং তার মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা হবার বদনামটাও ঘুচে যায়।

মুসলিম সমাজের এই প্রত্যয়হীন, সংশয়ী ও দুর্বলচিত্তদের অবস্থার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রথম লগ্ন থেকেই মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরেই একটি বিরুদ্ধ পক্ষের অবস্থান। তবে আজকের এই বিরোধী পক্ষকে ঠিক সেই পটভূমিতে বিশ্লেষণ না করলেও চলে।

আজকের আমাদের সমাজের এই বিরোধীরা বিগত দেড়-দু'শো বছরের ফসল। এদের মধ্যে একটা জিনিস সুস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যাবে। সেটা হচ্ছে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে এদের বক্তব্য জোরালো নয়। অর্থাৎ ইসলামের মোকাবিলায় ইউরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব এদের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত। উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পরই এটা সম্ভব হয়েছে। আর এ জন্য শাসক সমাজকে একটি সুপরিকল্পিত দীর্ঘ মেয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষানীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। সেই শিক্ষা ব্যবস্থায় একদিকে ইউরোপীয় সমাজ চিন্তা ও সভ্যতা সংস্কৃতিকে সর্বেসর্বা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল এবং অন্যদিকে ইসলামী সমাজ চিন্তা, ভাবধারা, সভ্যতা-সংস্কৃতিকে সেখানে সামান্যতম ঠাঁইও দেয়া হয়নি। বরং উল্টো তার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও প্রচারণার যাবতীয় সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত বিজাতির গোলামীর কারণে মুসলিম সমাজের অগ্রগতির ধারা রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর্থিক, শিক্ষাগত এবং অন্যান্য অনগ্রসরতার কারণে সংকট ও অনাসৃষ্টি দিনের পর দিন বেড়ে যেতে শুরু করেছিল। একদিকে ইসলামী সমাজের বুনিয়াদ ভেংগে ফেলার এবং অন্যদিকে সেই ভাংগা বুনিয়াদের ওপর একটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী সমাজের ভিত গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ কাজ যদি আধুনিক পদ্ধতিতে সুসংগঠিতভাবে এক'শো বছর ধরে চলে

তাহলে একটি শক্তিশালী ব্যবস্থার মধ্যেও পরিবর্তন আনা তার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

আজকের ইসলামের এই বিরুদ্ধবাদীরা ইসলামী জীবন বিধানের কার্যকর ক্ষমতা বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে একটি মস্তবড় ভুল করে যাচ্ছেন। একশ–দেড়'শো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের শৃংখল থেকে সদ্য স্বাধীনতা লাভকারী মুসলিম দেশগুলো থেকে বিজাতীয় শাসকগোষ্ঠী বিতাড়িত হলেও তাদের রাষ্ট্রীয় ও আর্থ–সামাজিক চিন্তা–ভাবধারা মোটেই বিতাড়িত হয়নি। মুসলমানরা এসব দেশে ইসলামের দৃষ্টিতে যথার্থ স্বাধীনতাও লাভ করেনি। অর্থাৎ ইসলাম এখানে মুক্ত নয়, শৃংখলিত। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইসলামের কোন স্থান নেই। ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইসলামের যতটুকু সুযোগ বর্তমানে আছে ঔপনিবেশিক শাসন আমলেও তাই ছিল। ফলে ইসলামী জীবন বিধানের মুক্তির দিক দিয়ে অবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। কাজেই এই শৃংখলিত ইসলামের কাছ থেকে বড় কিছু আশা করা কতটুকু ন্যায় সংগত?

বর্তমান পুঁজিবাদী, ভোগবাদী, উন্নত নৈতিক মূল্যমানের প্রতি বিতৃষ্ণ সমাজ পরিবেশে ইসলামী জীবন বিধানের বাস্তবতা ও সার্থকতা খুঁজতে যাওয়া নেহাত দুরাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্যি বর্তমান পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী ব্যবস্থার দৃষ্টিতে ইসলামী বিধানের মধ্যে অনেক অসংগতি দেখা যাবে। ইসলাম তো সামাজিক সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করে। কিন্তু ইসলাম বিরোধী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পুরাপুরি পরিবর্তিত করে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত এই অসংগতি কেমন করে দূর করা যাবে? আর অনৈসলামী রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে কোন সঠিক ইসলামী বিধান কার্যকর করা বা তার আশা করা কি দুরাশা নয়?

১৭
আমাদের সমস্যার সমাধান কিসে?

আঠারো শতকের শেষার্ধে আমাদের এ ভূখণ্ডে বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই মুসলমান হিসেবে আমাদের পতন শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং হাজার বছর থেকে যে জাতি এশিয়া, আফ্রিকা ইউরোপের বিশাল ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করে আসছিল এবং সমগ্র উপমহাদেশে সাত'শো বছর ধরে যারা দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব চালিয়ে এসেছে মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে বাংলা থেকে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত তাদের ইংরেজের পদানত হয়ে যাওয়াটা সামান্য ও একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল না। আসলে মুসলমানদের পতনের ষোলকলা পূর্ণ হয়ে এসেছিল। পতন তাদের শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর এ পতনের রূপটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো মাত্র। মুসলমানদের এই পতনটা কি ছিল? এটা বুঝার জন্য পরবর্তী কালের ও আজকের মুসলমানদের চেহারা দেখাই যথেষ্ট। মুসলমানদের মতো একটি জাতি কেমন করে রাতারাতি পরিবর্তন গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত হলো? মুসলমানদের পরিচিতি তো আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্ন কোন ব্যক্তি সত্যিকার মুসলিম হতে পারে না। সে ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সংঘর্ষশীল ইংরেজের চিন্তা ও কর্মধারাকে মুসলমানরা গ্রহণ করতে শুরু করে দিল গোড়া থেকেই। এ কথা বলছি না যে, মুসলমানরা সবাই এবং এ কথাও বলছি না যে, তাদের মধ্য থেকে কেউ বাধা দিতে এগিয়ে আসেনি। এসব কিছুই হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর সাথে আনুগত্যের সম্পর্কটা মুসলমানদের এতটা শিথিল হয়ে এসেছিল যে, ভিতরের এই সামান্য বাধা টেকেনি। ধীরে ধীরে এ পরিবর্তনটা গণপর্যায়ে সঞ্চারিত হয়েছিল। আজ মুসলিম সমাজে ইসলাম থেকে পদস্খলন দৃশ্যই প্রবল। ইসলাম বিরোধী চিন্তাদর্শ মুসলমানদের মন মগজে শুধু প্রভাবই বিস্তার করেনি বরং মুসলমানদের মধ্যে এরি চর্চা চলছে। এর মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করে তারা নিজেদের সামাজিক উন্নয়নের পথে এগুতে চাচ্ছে। অনেক মুসলমানের এখন আল্লাহর আনুগত্যের কোন পরোয়া নেই।

সমগ্র উপমহাদেশ আজ তিনটি ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে দুটি ভাগে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত। এই দুই ভাগের এক বিরাট প্রভাবশালী গোষ্ঠী মুসলমানদেরকে ইসলামের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

মুসলমানদেরকে ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনার ও ইসলামের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুসংগঠিত ইসলামী আন্দোলন এখানে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এই আন্দোলনের কাজ চল্লিশের দশকের শেষের দিক থেকে শুরু হলেও মূল কাজ শুরু হয় পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে।

এই আন্দোলন এ দেশের মুসলমানদের জীবন কিভাবে গড়ে তুলতে চায়? এই আন্দোলনের মূল দাওয়াত হচ্ছে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা এবং তাকে একমাত্র আল্লাহর দাসে পরিণত করা। মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাঁর বন্দেগী করার জন্য, অন্য কোন সৃষ্টির বন্দেগী করার জন্য নয়। মানুষ একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলবে। আল্লাহর হুকুমের মোকাবিলায় আর কোন প্রবল শক্তিধরের হুকুম সে মানতে পারবে না। তার ওপর একমাত্র আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে আর কারোর নয়। এভাবে মানুষ হবে আল্লাহর পরিপূর্ণ বান্দা ও দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি। এভাবে মানুষের ওপর মানুষের শাসনের অবসান হবে। সমস্ত মানুষ যথার্থ স্বাধীন। অন্যদিকে আজকের দুনিয়ায় বিভিন্ন মতবাদ ও চিন্তাধারার শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে মানুষ আসলে মানুষের দাসে পরিণত হয়েছে। প্রথমত যেসব মস্তিষ্ক থেকে এইসব চিন্তা ও মতবাদের উদ্ভব হয়েছে মানুষ তাদের দাসত্ব শৃংখল গলায় পরে নিয়েছে। দ্বিতীয়ত যারা এই সব মতবাদের প্রচলন ও প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত, তাদের দাসত্বও মানুষের কপালের লিখনে পরিণত হয়েছে। কারণ তারা এই মতবাদের মধ্যে নিজেদের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মতো পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করছে এবং সেগুলো মেনে চলার জন্য বল প্রয়োগ করছে। সারা দুনিয়ার আজকের যাবতীয় সমস্যার মূল হচ্ছে এই মানুষ কর্তৃক মানুষের দাসত্ব। ইউরোপ আমেরিকা আজকের বিশ্বে জ্ঞানের রাজ্যে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাদের এই জ্ঞান নিজেদের মস্তিষ্ক প্রসূত। এর মধ্যে জ্ঞানের চাইতে অজ্ঞানতার পরিমাণ কম নয়। বার বার চেহারা পরিবর্তনই এর অজ্ঞানতার প্রমাণ। ইউরোপ–আমেরিকার প্রাধান্যের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষ আজ এই অজ্ঞানতার দাসত্ব করে চলছে। ইসলামী আন্দোলন এই অজ্ঞানতার দাসত্ব থেকে মানুষকে বাঁচাতে চায়।

একমাত্র আল্লাহর দাসে পরিণত হবার এবং একমাত্র তাঁর হুকুম, শাসন ও কর্তৃত্ব মেনে চলার সাথে সাথেই মানুষের জীবনের একটা মোড় পরিবর্তন হয়। আল্লাহর হুকুম ও কর্তৃত্ব মানার পর মানুষের জীবনে আর কারোর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে বিধান লাভ করে

আল্লাহর কাছ থেকে। মানব জাতির মধ্য থেকে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ মনোনীত করে তার মাধ্যমেই আল্লাহ তাঁর বিধান মানুষের কাছে পাঠান। এই শ্রেষ্ঠ পুরুষ হচ্ছেন রসূল। মানবিক সকল প্রকার দুর্বলতা সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁকে নিকৃষ্ট স্বার্থ চিন্তা ও স্বার্থ-কর্ম থেকে দূরে রাখেন। ফলে মানুষকে স্বার্থ নিরপেক্ষ সঠিক পথে চালানো তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়।

এই রসূলই হচ্ছেন ইসলামী আন্দোলনের নেতা। তাঁর জীবন ও কর্মকাণ্ডের আদর্শই ইসলামী আন্দোলনের পরিচালক। রসূল তাঁর জীবনকে আল্লাহর বিধান মোতাবিক পরিচালনা করেন। সেই অনুযায়ী সমগ্র মানবতাকে ও তাদের জীবন গঠন ও পরিচালনা করতে হবে। একটা নতুন মতবাদ, বিধান ও আদর্শকে কার্যকর করতে হলে তার ধারাবাহিক অনুশীলন এবং এ জন্য প্রথমে একটি মডেল তৈরীর প্রয়োজন হয়। রসূল নিজেই সেই মডেল। তিনি নিজেই ধারাবাহিক অনুশীলনের মাধ্যমে মানবিক বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতার মধ্যে অবস্থান করে আল্লাহর বিধানকে কার্যকর করেছেন। কাজেই মানব জাতির জন্য এ ক্ষেত্রে এ বিধানকে কার্যকর ও প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হওয়া বা একে একটি দুঃসাধ্য কঠিন কাজ মনে করার কোন কারণ নেই।

ইসলামী আন্দোলন আমাদের দেশে আল্লাহর এই বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গত তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর থেকে কাজ করে যাচ্ছে। ইংরেজের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে যে বিষয়টা মুসলমানরা ভুলতে বসেছিল এবং ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর যে বিষয়টাকে মুসলমানরা একেবারে ভুলেই বসেছে ইসলামী আন্দোলন সেটাকে পুনরায় স্মৃতিপটে জাগিয়ে তুলছে মাত্র। তবে ইসলামী আন্দোলন নিছক একটা দাওয়াত নয়, একটা কর্মসূচী এবং কর্মপ্রণালীও। বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এটা একটি চ্যালেঞ্জ। আবার এই প্রচলিত ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণে তার উদর থেকে যদি আরো কোন ব্যবস্থা জন্ম নিতে চায় তাহলে তার জন্যও চ্যালেঞ্জ। যে কোন মানবিক ব্যবস্থা ও মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তা ও কর্মপ্রণালীর জন্য এটা একটা চ্যালেঞ্জ।

ইসলামী আন্দোলন সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতিকে সঠিক পথ দেখাতে, তাদেরকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করতে এবং বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে তাদের নিজস্ব পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। উপমহাদেশের এই অংশের মুসলমানরা গত কয়েক'শো বছর ধরে যে অধঃপতনের শিকার হয়ে আসছে এবং তাদের সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য

বিভিন্ন পথে ছুটাছুটি করে নিজেদের শক্তিক্ষয় এবং সময়ের অপচয় করছে তা থেকে তাদেরকে রক্ষা করার দায়িত্ব ইসলামী আন্দোলন গ্রহণ করেছে। এখন এটা এ দেশের মুসলমানদের দায়িত্ব এ আন্দোলনকে বুঝা ও একে উপলব্ধি করা। মুসলমানরা যদি যথার্থই ইসলামের পথে চলতে চায় তাহলে তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রসূলের নেতৃত্ব অবশ্যি গ্রহণ করতে হবে। এর মধ্যে অন্য কোন মানুষের তৈরী মতবাদের আনুগত্য ও অন্য কোন মানুষের নেতৃত্ব গ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না। মুসলমানরা যদি তাদের দীর্ঘকালীন জীবন সমস্যার যথার্থই সমাধান চায় তাহলে ইসলামের পথ ছাড়া অন্য কোন পথে তা সম্ভব নয়। এ দেশে এটিই ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত ও কর্মসূচী।

১৮
বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিগ্রহের অন্তরালে

সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মজলুমী আজ আমাদের চোখের সামনে। মুসলমানদের সংখ্যা দুনিয়ায় বর্তমানে প্রায় একশ কোটির মতো। এর মধ্যে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোয় তাদের সংখ্যা অর্ধেকেরও কম। অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশী মুসলমান বাস করছে অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অমুসলিম শাসিত দেশগুলোয়। এর মধ্যে কোন কোন অমুসলিম দেশে শাসন যন্ত্রের কোন কোন পর্যায়ে মুসলমানদের কিছুটা সহযোগিতা গ্রহণ করা হলেও দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে প্রায় দেশেই মুসলমানদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে সর্বত্রই মুসলমানদের জানমালের নিরাপত্তার প্রশ্নটা বড় আকারে দেখা দিয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দুনিয়ার তিনটি বড় বড় ধর্মাবলম্বীদের হাতেই মুসলমানরা নিগৃহীত হচ্ছে বেশী করে। এরা হচ্ছে খৃস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ। এসব অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা পাঁচ থেকে বিশের মধ্যে। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার ফিলিপাইন থেকে শুরু করে ভিয়েতনাম, কম্পুচিয়া, থাইল্যাণ্ড, বার্মা, ইণ্ডিয়া, ইথিওপিয়া, সাইপ্রাস প্রভৃতি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে মুসলমানদের নির্যাতন চলছে সমানে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে অন্য কোন সংখ্যালঘুর নিগ্রহ তেমন দেখা যাচ্ছে না। চতুর্থ আর একটি ধর্ম নয় বরং বিরোধী মতবাদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতেও মুসলমানরা নিগৃহীত হচ্ছে। তবে সেখানে মুসলমানদের সাথে সাথে অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিগ্রহও চলছে সমানভাবে। কারণ সেখানে তো আক্রোশ ধর্মের বিরুদ্ধে। কমিউনিস্ট শাসিত দেশগুলোকে এর আওতায় ফেলা যায়।

মুদ্রার অপর পিঠটিও দেখলে দেখা যাবে, দুনিয়ায় কয়েক ডজন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ রয়েছে কিন্তু তাদের কোথাও অমুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠদের ওপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে না। এমনকি তিন দিকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের দেশ হিন্দুস্তান পরিবেষ্টিত বাংলাদেশ। এই দেশের তিন দিকেই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় বছরের বিভিন্ন সময় ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাংগা হাংগামা লেগে থাকলেও এবং এই দাংগায় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের

জানমালের বিপুল ক্ষতি হলেও বাংলাদেশের মুসলমানরা তাদের দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের জানমালের কোন ক্ষতি করতে উদ্যত হয় না। এমনি বিভিন্ন মুসলিম দেশে সংখ্যালঘু খৃস্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে কখনো কোন ধ্বংস অভিযান চলেনি।

আর একটা বিষয়ও এখানে লক্ষ করার মতো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসানীতি আধুনিককালে যেমন ব্যাপকতা লাভ করেছে ইতিপূর্বে আর কখনো তেমনটি করেনি। ইতিপূর্বে মধ্যযুগে একমাত্র স্পেনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম নিষ্ঠুরতার পথ অবলম্বন করা হয়েছিল। হিংসার সেটা ছিল এক অভিনব দৃষ্টান্ত। একটি জাতিকে একটি দেশের বুক থেকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার এ ধরনের আক্রোশ আর কোথাও দেখা যায়নি।

মুসলমানরা কি আগ্রাসী? মুসলমানদের মধ্যে কি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাব রয়েছে? সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা কি ইসলামী সমাজে দুষ্প্রাপ্য বিষয়? এ প্রশ্নগুলো এবং এ ধরনের আরো বহু প্রশ্ন একজন দরদী পর্যবেক্ষকের মনে একের পর এক ভেসে ওঠে। কিন্তু পাশাপাশি মুসলিম দেশগুলোর সংখ্যালঘুদের প্রতি ব্যবহার এবং তাদের জানমালের নিরাপত্তা দেখে তাদের এ সব প্রশ্ন বাতাসে মিলিয়ে যায়।

তবে এ কথা ঠিক, কোন যুগেই মুসলমানদেরকে পার্শ্ববর্তী অমুসলিম সমাজ ভালো নজরে দেখতে পারেনি। একজন লোকের ইসলাম গ্রহণ করাকে তারা এই অর্থে গ্রহণ করেছে যেন সে তাদের সমাজ, সংস্কৃতি, নৈতিক মূল্যবোধ সব কিছুর বাঁধন কেটে একটা সম্পূর্ণ আলাদা জগতে প্রবেশ করেছে। কাল যে তাদের মধ্যে অবস্থান করছিল আজ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সে তাদের থেকে একদম আলাদা হয়ে আর এক ভিন্নমুখী সমাজের সদস্যে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকটি অনৈসলামী ধর্মভিত্তিক জাতি বিভিন্ন দেশে যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যে অনেক দিক থেকে একাত্মতা দেখা যায়। তাই এক ধর্মের লোক আর এক ধর্ম গ্রহণ করলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তেমন একটা বড় রকমের পরিবর্তন ও পার্থক্য দেখা দেয় না। যার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আগের অবস্থান থেকে বর্তমানের অবস্থানের বিশেষ কোন তফাত থাকে না। একজন হিন্দু বৌদ্ধ হয়ে গেলো বা একজন বৌদ্ধ খৃস্টান হয়ে গেলো। এতে তার সামাজিক ক্ষেত্রে বিরাট কোন পরিবর্তন করতে হয় না। ধীরে ধীরে তার আগের ধর্মীয় সমাজ ও বর্তমানের ধর্মীয় সমাজের মধ্যে একটা সমঝোতা গড়ে ওঠে। এ বিষয়টিকেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন 'আল কুফরু

মিল্লাতুন ওয়াহিদা' রূপে। অর্থাৎ সমস্ত অনৈসলামী ধর্ম মূলত একই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারার অন্তরভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ যেটাকে ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার কৃতিত্ব বলেছেন সেটা আসলে শুধু ভারতীয় সমাজ সভ্যতার বৈশিষ্ট নয়।[১] দুনিয়ার সব দেশের অনৈসলামী সমাজ সভ্যতার মধ্যে এই একাত্মতা প্রথম নজরেই চোখে পড়ে।

কিন্তু মুসলমান সেখানে একটি ব্যতিক্রম। কুফরী চিন্তা ও ভাবধারা থেকে ইসলামী চিন্তাধারার সম্পূর্ণ ভিন্নমুখিতা এবং কুফরী মূল্যবোধ ও জীবন ধারা থেকে ইসলামী মূল্যবোধ ও জীবন ধারার একেবারে ভিন্নমুখী অবস্থান যেন সমুদ্রের উষ্ণ ও শীতল পানির দুই স্রোতধারার মতো, যা পাশাপাশি চলে কিন্তু কোনদিন একাকার হয় না।

মুসলিম মানস ও ইসলামী সমাজের পৃথক চেহারা পার্শ্ববর্তী অমুসলিম সমাজ মেনে নিতে রাজী নয়। তাই অমুসলিম সমাজ যেখানে প্রবল ও পরাক্রমশালী সেখানে সে মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে তার শক্তি ব্যবহার করে। মুসলিম সমাজ যেখানে যত শক্তিশালী সেখানে এই বিরোধটি ততই জোরদার হয়। কিন্তু মুসলিম সমাজ যেখানে দুর্বল অর্থাৎ ইসলামী মূল্যবোধ ও জীবন ধারা যেখানে তার পরাক্রম হারিয়ে বসেছে সেখানে এই বিরোধ ক্ষীণতর। বিশ শতকের শেষার্ধে এসে এ বিরোধের তীব্রতা দেখে মনে হচ্ছে বিভিন্ন দেশে মুসলিম সমাজ মানসে ইসলামী মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবন ঘটছে। মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী চেতনা ফিরে আসছে। তারা যথার্থ মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করতে চাচ্ছে। তাদের পাশের অনৈসলামী মানস এটা মেনে নিতে পারছে না। তারা হিংসার পথ অবলম্বন করছে। কুরআনের মতে وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ - البقره : ١٢٠ অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত তারা অন্য কোন পয়েন্টে তোমাদের সাথে আপোসে আসবে না। তারা চায় মিল্লাতে ইসলামীয়ার পূর্ণ বিলুপ্তি। তাদের দেশের Main Stream এর মধ্যে তারা মুসলমানদের বিলুপ্তি চায়। বিরোধী পক্ষের এই চাওয়ার প্রাবল্য মুসলমানদেরকে দ্রুত সজাগ করে দিচ্ছে। আর মুসলিম দেশসমূহের ইসলামী পুনরুজ্জীবন আন্দোলনগুলো অমুসলিম দেশগুলোর মুসলমানদের হিম্মত বাড়িয়ে দিচ্ছে। কাজেই বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিগ্রহের মধ্যে আমরা বিপরীত দিক থেকে যে আশার আলোটুকু দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী পুনরুজ্জীবন আকাংখার প্রাবল্য।

---

১. "হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন শক হুন দল, পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।" –ভারতীয় : গীতাঞ্জলী

১৯

জনগণের দাবীকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের খলীফা নির্বাচিত হবার পর প্রথমে যে ভাষণ দেন সেটা ছিল যেমন ঐতিহাসিক তেমনি ছিল ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক নীতি নির্ধারক পলিসি। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদের খলীফা হয়েছি এর মানে এ নয় যে, আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমি যতদিন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবো ততদিন আমার আনুগত্য করা তোমাদের জন্য ফরয আর যখনি আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য থেকে সরে যাবো তখনি তোমরা আমার আনুগত্য পরিত্যাগ করবে। দ্বিতীয় খলীফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুও প্রায় এই একই ধরনের কথা বলেন। তিনি বলেন ঃ আমি ভুল পথে চললে তোমরা আমাকে সোজা করে দেবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যই হচ্ছে মূল লক্ষ। যে রাষ্ট্রনায়ক, রাষ্ট্র পরিচালক বা প্রশাসক আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার পেছনে চলা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব নয়। ইসলামের সূচনার প্রথম দিন থেকেই এ মূলনীতি স্বীকৃত হয়ে আসছে। কোন যুগে কোন ফকীহ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি। মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক আল্লাহর আনুগত্য না করে তাগুতের আনুগত্য করবে এবং মুসলিম জনসাধারণকে ইসলামের পথ থেকে সরিয়ে অন্য কোন পথে নিয়ে যাবে, যা ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধী আর মুসলমানরা নির্বিবাদে তার আনুগত্য করতে থাকবে–এ ধরনের ব্যবস্থা কোন যুগেই স্বীকৃত হয়নি। মুসলমানরা বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছে, আন্দোলন করেছে, শক্তি সংগ্রহ করেছে, যাতে শক্তি প্রয়োগ করে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন করা যায়।

আল্লাহর আনুগত্যের মোকাবিলায় তাগুতের আনুগত্যকারী মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের এ অভিযান আজকের যুগেও অব্যাহত রয়েছে। যেসব মুসলিম শাসক মুসলমান জনসাধারণের জন্য ইসলামের পথ বন্ধ করে দিয়েছে এবং তাদেরকে ইসলাম বিরোধী পথে চালাবার চেষ্টা করেছে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মুসলিম দেশে আন্দোলন চলছে। তুরস্ক থেকে নিয়ে ইরাক, সিরিয়া, মিসর, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া সর্বত্রই স্থানীয় ইসলামী দল ও আন্দোলনগুলো মুসলিম

জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করার চেষ্টা করছে। তাদের সহায়তায় বলিষ্ঠ ইসলামী নেতৃত্ব সৃষ্টি করে ইসলাম বিরোধী নেতৃত্বকে হটিয়ে দেয়াই হচ্ছে তাদের লক্ষ। বিভিন্ন দেশে এ আন্দোলনগুলো বিভিন্ন রূপ নিয়েছে এবং মাঝে মধ্যে বিভিন্নভাবে তাদের কার্যকলাপ মুসলিম জনগণের সামনে এসে যাচ্ছে। কিন্তু এমন কিছু মুসলিম দেশ আছে যেখানে ইসলামী আন্দোলনগুলোর ওপর কঠোর সরকারী নিষেধাজ্ঞার কারণে তাদের কার্যকলাপকে গোপন পথে পরিচালিত করতে হয়েছে। ফলে তাদের সম্পর্কে সঠিক খবরাখবর আমরা খুব কমই পেয়ে থাকি। কিন্তু আমরা খবর না পেলেও সেখানে ইসলামী আন্দোলন বসে থাকছে না। তারা এগিয়ে যাচ্ছে। তারা নিজেদের পথ নিজেদের মতো করে নিজেরাই তৈরী করছে।

এমনি একটি ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতির খবর পাওয়া গেছে তিউনিসিয়া থেকে। যেসব মুসলিম দেশে কয়েক যুগ থেকে সামরিক শাসন চলছে তাদের মধ্যে তিউনিসিয়ার স্থান প্রথম সারিতে। কিন্তু এহেন দীর্ঘতম একনায়কত্ববাদী সরকারের বিরুদ্ধেও সেখানে ঘটেছে সাম্প্রতিককালের এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। সেখানকার বেআইনী ঘোষিত ইসলামিক লিবারেশন পার্টি সেনাবাহিনীর মধ্যেও ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছে। সম্প্রতি তিউনিসিয়ার সামরিক আদালত লিবারেশন পার্টির সাথে জড়িত ৩০ জন মুসলিম নেতাকে দুই থেকে আট বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা তিউনিসিয়াকে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চায়। সাজাপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ১১ জন হচ্ছেন তিউনিসীয় বিমান বাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত ও অকমিশনপ্রাপ্ত অফিসার। তিউনিসিয়ার ইসলামী আন্দোলন ইসলামিক লিবারেশন পার্টির প্রধান অধ্যাপক মুহাম্মাদ জারকীও সাজাপ্রাপ্তদের অন্তরভুক্ত হয়েছেন। ইতিপূর্বে ১৯৬২ সালে একই অভিযোগে সেনাবাহিনীর একটি গ্রুপকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এর পরও এ আন্দোলন থামেনি। বরং আরো এগিয়ে গেছে। বর্তমানে কমিশন র‍্যাংকের অফিসাররা এই আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছেন। কাজেই তিউনিসিয়ার একনায়ক সরকারের পক্ষে এ আন্দোলনকে দমিয়ে রাখা কি সম্ভবপর হবে?

কোথাও কোন মুসলিম দেশের একনায়ক সরকারের পক্ষে সে দেশের ইসলামী আন্দোলনকে দমিয়ে রাখা সম্ভবপর হবে না। কারণ ইসলামী আন্দোলন মুসলিম জনগণের আন্দোলন। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবী মুসলিম জনগণের দাবী। কয়েক ব্যক্তি বা গুটিকয়েক সামরিক ব্যক্তি সমগ্র মুসলিম জনগণের দাবীকে বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

২০
মিসরে জাগ্রত ইসলামী চেতনা

মোস্তফা কামাল পাশা ইসলামী দুনিয়া থেকে তুরস্ককে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। নব্য তুর্কীর বুক থেকে ঈমান ও ইসলামের আমানত কেড়ে নিয়ে সেখানে পাশ্চাত্য চিন্তার বীজ বপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তুরস্কের বর্তমান পট পরিবর্তন এবং সরকারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ–অসন্তোষ কামালী সংস্কারের ব্যর্থতা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে।

পঞ্চাশের দশকে জামাল আবদুন নাসেরও মিসরে এমনি কিছু করতে চেয়েছিলেন। তিনি এক সময় "নাহ্‌নু আবনাআ ফেরায়েনা" (আমরা ফেরাউনের বংশধর) এর শ্লোগানও জোরে শোরে তুলেছিলেন। জামাল নাসের এক সময় আরব যুবকদের হৃদয়ের মধ্যমনি হয়ে উঠেছিলেন। রাবাত থেকে নিয়ে বাগদাদ পর্যন্ত সমগ্র আরব বিশ্ব তাঁর কথায় ওঠাবসা করতো। এ ধরনের বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নাসের তাঁর দেশ থেকে ইসলামকে নির্বাসন দেবার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। মিসরের ইসলামী আন্দোলন ইখওয়ানুল মুসলিমুনের ওপর চরম আঘাত হেনেছিলেন শুধুমাত্র তাঁর দেশে ইসলামকে কোণঠাসা করার উদ্দেশ্যে। ইখওয়ান নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে তাদের হাজার হাজার কর্মীকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলেন। বছরের পর বছর তাদেরকে কারাগারে আবদ্ধ রেখে তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন। তাদের পরিবার পরিজনদের ওপরও নির্যাতন চালিয়েছিলেন। পরিকল্পিতভাবে দেশের হাজার হাজার পরিবারকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এইসব ইখওয়ান কর্মী ও সমর্থকবৃন্দের একমাত্র অপরাধ ছিল তারা নিজেদের দেশে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে একমাত্র প্রতিষ্ঠিত বিধান হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু জামাল নাসেরের এই ব্যাপক নির্যাতনের ফলে মিসরে ইসলামের নাম উচ্চারণকারীদের সংখ্যা মোটেই কমেনি বরং দিনের পর দিন বেড়েই গেছে। তাই ১৯৫৪ সালে ইখওয়ানকে বেআইনী ঘোষণা করার সময় যেখানে তাদের দশ হাজার কর্মীকে কারাগারে আটক করতে হয়েছিল সেখানে মাত্র দশ বছরের ব্যবধানে ১৯৬৪ সালে এই বেআইনী ঘোষিত দলের মাধ্যমে দেশে ইসলামের আওয়াজ এতো বেশী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল যে, সরকারকে এবার

ছয়জনকে মৃত্যুদণ্ড দান করতে হয় ও ইসলামের নাম যাতে আর কেউ জীবনে কোনদিন উচ্চারণের সাহস অর্জন করতে না পারে সে জন্য চরম শাস্তি দান করার উদ্দেশ্যে আশি হাজার লোককে বাছাই করে আনা হয়। এদের ওপর চালানো হয় দিবারাত্র অবর্ণনীয় নির্যাতন নিপীড়ন। দু'দশক পরে এখনো এদের অনেকেই কারাগারে আটক রয়েছেন। অনেকে কারাগারের মধ্যেই শাহাদাত বরণ করেছেন। অনেকের সংসার একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। নাসেরের পর আনোয়ার সাদাত চলে গেছেন। এবার এসেছেন হুসনী মুবারক। ইতিমধ্যে অতীত হয়ে গেছে তিরিশটা বছর। ইসলামপন্থীদের ওপর জুলুম নির্যাতনের স্টীম রোলার মিসরে গড়িয়ে চলছেই। মাঝখানে আনোয়ার সাদাত ইখওয়ানের ব্যাপারে কিছুটা নরম নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাদের কিছু কর্মীকে কারাগার থেকে মুক্তি দান করেছিলেন। তাদের কিছু পত্র-পত্রিকা পুনপ্রকাশের অনুমতিও দান করেছিলেন। এসব তিনি করেছিলেন ইসলামের স্বার্থে নয়, কমিউনিজম ও মার্কসবাদের সয়লাব থেকে দেশকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু হুসনী মুবারক এসে আবার জুলুম নির্যাতনের যুগ ফিরিয়ে এনেছেন বলে শুনা যাচ্ছে।

এতো সব সত্ত্বেও মিসরে ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন ও ইখওয়ানের অগ্রগতি রোধ করা যায়নি। সম্প্রতি দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত এ সম্পর্কিত রিপোর্টগুলো একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। সম্প্রতি একটি পাকিস্তানী পত্রিকায় জনৈক পাকিস্তানী আলেমের একটি সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত দেশের মধ্যে মিসরে ইসলামী আন্দোলন সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী। বর্তমান ও আগের সরকারগুলোর অত্যধিক দমননীতির পরও মিসরে ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তার ঘটছে। জনগণের মধ্যে এই আন্দোলনের জনপ্রিয়তা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানী আলেমের এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় মাত্র কিছু দিন আগে লণ্ডন টাইমসে প্রকাশিত এক নিবন্ধে। টাইমসের এই নিবন্ধে মিসরে ইসলামী আন্দোলনের পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিবন্ধকারও মন্তব্য করেছেন, মিসরে ইসলামী আন্দোলন অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন ঃ "কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের লনগুলো থেকে বের হয়ে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকালে দেখা যাবে তরুণ কিশোর ছাত্রদের মুখ ভর্তি দাড়ি আর ছাত্রীদের মাথায় রুমাল বাঁধা। শুধুমাত্র এ বিষয়টি এ কথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট যে, 'মিসরীদের বিরাট অংশের মধ্যে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসের নতুন স্রোত প্রবাহিত হয়েছে এবং এই স্রোত

সহজে রোধ করা যাবে না।" নিবন্ধকার আরো লিখেছেন : "মরহুম প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এই ইসলামী ধারাকে অগ্রসর করার ক্ষেত্রে উলেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। নাসেরের আমলে ইসলামপন্থীদের ওপর চরম নির্যাতন চালানো হয়। তাদেরকে একেবারে পেছনে ঠেলে দেয়া হয়। মরহুম সাদাত ইসলাম পন্থীদের সমর্থন লাভ করে মিসরে কমিউনিস্টদের অগ্রগতির পথ রোধ করার চেষ্টা করেন। মিসরী মুসলমানরা কমিউনিজমকে আল্লাহর দুশমন গণ্য করে। তারা ১৯৭৩ সালে মিসরী সেনাদলের সুয়েজ খাল অতিক্রম করাকে একটি নৈতিক বিজয় হিসেবে গণ্য করে। তারা বলে, সুয়েজ খাল অতিক্রমকারী সেনাবাহিনী কি "আল্লাহ্ আকবর" ধ্বনি দেয়নি?"

আসলে মিসরী মুসলমানদের হৃদয়ের গভীর তলদেশ থেকে ইসলামের স্রোতধারা উৎসারিত। তাদের আকীদা–বিশ্বাস–সমাজ–সংস্কৃতি ইসলামের অন্তঃসলিলা স্রোত ধারায় স্নাত। তাদের এই ইসলামী ঐতিহ্য প্রেসিডেন্ট সাদাতের মুখাপেক্ষী ছিল না। নিজের রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সাদাত তাকে ব্যবহার করেছেন মাত্র। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উভয় গোষ্ঠীর মিলিত আঁতাত মিসরে ইসলামী আন্দোলনকে অবদমিত করার প্রচেষ্টায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এ ক্ষেত্রে কখনো পুঁজিবাদী গোষ্ঠীকে অগ্রবর্তী আবার কখনো সমাজবাদী গোষ্ঠীকে অগ্রবর্তী দেখা গেছে। কিন্তু আসলে দুই গোষ্ঠীর লক্ষ একই। বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই দুই গোষ্ঠীর চক্রান্ত সর্বত্র একই ধারায় এগিয়ে চলছে।

মিসরে এদের চক্রান্ত যে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। জনগণের ইসলামী চেতনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কায়রো থেকে প্রকাশিত সরকারী মালিকানাধীন একটি পত্রিকায় প্রশ্নোত্তরের এমন একটি কলাম শুরু করা হয়েছে যেখানে পাঠক–পাঠিকাদের প্রশ্নের জবাব কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দেয়া হয়। গত নভেম্বরের শেষের দিকে সাপ্তাহিক 'আল আখবার আল ইয়াউম' জাতীয় সামাজিক বিজ্ঞান কেন্দ্রের মাধ্যমে সারা দেশে ইসলামী শরীয়ত প্রবর্তনের ব্যাপারে জনমত যাচাই করে। এ উদ্দেশ্যে কায়রো, আলেকজেন্দ্রিয়া, মনসূরা (মিসরের নিম্ন এলাকা) ও সুহাজে (মিসরের উচ্চ এলাকা) ৩৪৩৮ ব্যক্তির রায় নেয়া হয়। এদের মধ্যে শতকরা ৯৬ ভাগ লোক হাঁ সূচক রায় দেয়।

এসব ঘটনা ও বাস্তব অবস্থার বহিপ্রকাশ এ কথা প্রমাণ করে যে, মিসরে জনগণের ইসলামী চেতনাকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। গত তিরিশ বছর থেকে অবিচ্ছিন্ন জুলুম, নির্যাতন ও দমননীতির পরও এই চেতনাকে খতম করা

দূরের কথা একে দাবিয়ে রাখাই সম্ভবপর হচ্ছে না। পাশ্চাত্য দেশগুলো বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশগুলো মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে জাগ্রত ইসলামী চেতনায় আতংকিত। তারা গভীর দৃষ্টিতে এগুলো নিরীক্ষণ করছে। কারণ তারা মনে করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো যদি জেগে ওঠে ও উন্নতি লাভ করে তাহলে তার প্রথম আঘাত পড়বে ইউরোপীয় দেশগুলোর স্বার্থে। আর এ জেগে উঠা ও উন্নতি লাভ করা যদি ইসলামী চিন্তা ও শরীয়তের ভিত্তিতে হয় তাহলে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংসকে আর কোনক্রমেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তাই তারা এই চেতনাকে দাবিয় দেবার জন্য সরকারকে সহায়তা দান করছে।

কিন্তু ইসলামী চেতনা মুসলিম জনগণের মীরাস। উত্তরাধিকার সূত্রে তারা এটা লাভ করেছে। আর শরীয়তের আইন তাদের প্রাণের দাবী। এ দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। মিসরের সচেতন ও ঐতিহ্যবাদী জনগণ তাই করছেন। ইসলামী জীবন বিধান কায়েমের জন্য তারা বিগত তিরিশ বছরে যে সবর ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন অবশ্যই তার সুফল তারা পাবেন। نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ-الصف -অবশ্যি আল্লাহর সাহায্য আসবে এবং তখন ত্বরিত বিজয় সম্পন্ন হবে।

২১
ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে যেতে হবে

আল্লাহ মানুষের জন্য একটি জীবন বিধান দিয়েছেন। এ জীবন বিধানটি দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করাই মুসলমানের কাজ। তাই মুসলমান এমন একটি জনগোষ্ঠীর নাম যারা আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। এ প্রচেষ্টা তার ব্যক্তিসত্তা ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু হয়। প্রথমে সে তার নিজের ও নিজের পরিবারের মধ্যে এ বিধানের প্রচলন করে। তারপর অন্যদেরকে এর দিকে আহবান জানায়। এভাবে সারা দেশে এ জীবন বিধান প্রচলন ও প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি চলতে থাকে।

এ মহান দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য একটি সংগঠনের প্রয়োজন। একটি মজবুত সুবিন্যস্ত ও সুশৃংখল সংগঠন। আল্লাহর মেহেরবানীতে বর্তমানে সারা দুনিয়ায় এ ধরনের সংগঠন ও দল কাজ করে যাচ্ছে। মুসলিম প্রধান ও অমুসলিম প্রধান প্রায় সব দেশেই এসব সংগঠনের অস্তিত্ব রয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া–এই পাঁচটি মহাদেশের কোন দেশেই ইসলাম আজ অপরিচিত নয়। এসব দেশের মুসলিম–অমুসলিম নির্বিশেষে সবার কাছে আজ ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে। মুসলমানরা ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবার কারণে ইসলামকে আবার নতুন করে তাদের সামনে পেশ করতে হচ্ছে। ইসলামের মূল সৈনিক তো তাদের মধ্য থেকে বের হবে। যারা ইসলামকে পূর্বেই মেনে নিয়েছে কিন্তু গাফলতি বা অব্যবস্থার কারণে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি, তাদের যদি লক্ষ্য নির্ধারণ করে কর্তব্য নির্দেশ করা যায় এবং কর্তব্য পালনের জন্য পরিবেশ সৃষ্টির উপযোগী উপাদান হাতের কাছে যোগান দেয়া যায়, তাহলে সহজে ও সুষ্ঠুভাবে তারা কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম হবে।

অমুসলিম অধিবাসীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরা হচ্ছে। তাদেরকে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের দিকে আহবান জানানো হচ্ছে। তাদেরকে জানানো হচ্ছে মানুষ মাত্রই অন্য মানুষের কল্যাণাকাংখী। কাজেই নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধে উঠে অন্যের কল্যাণ করার কথা চিন্তা করুন। কারণ সমগ্র বিশ্বমানবতা এক আদমের সন্তান। তারা পরস্পর ভাই ভাই। ভাই ভাইয়ের কল্যাণ ছাড়া অন্য কোন কথা চিন্তা করতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তার আসল স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালককে চিনতে পারে, তাঁর মর্জি

মোতাবিক জীবন যাপন করতে পারে, এবং একমাত্র তাঁর ইবাদাত করতে পারে তাহলে সারাদেশে একাত্মতা, সম্প্রীতি, শান্তি, শৃংখলা, ন্যায় ও সত্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। পাশ্চাত্য তথা ইউরোপীয়, খৃষ্টীয় ও মুশরিকী সভ্যতা বর্তমানে যেভাবে মানুষকে মানুষের দাসে পরিণত করেছে এবং যেভাবে সামাজিক ও সাংসারিক শান্তি–শৃংখলা বিনষ্ট হয়েছে, যার ফলে সাংসারিক ও সামাজিক জীবন সত্যি আজ মানুষের জন্য দুনিয়ায় জাহান্নামের আযাবের রূপ নিয়েছে, তার থেকে মানুষের নিষ্কৃতি লাভের এটিই প্রকৃষ্ট ও একমাত্র উপায়। আল্লাহ মানুষকে জীবন যাপনের এমন একটা পদ্ধতি দান করেছেন, যা দুনিয়ার যে কোন দেশে, যে কোন পরিবেশে এবং যে কোন সময়কালে মানুষ অবলম্বন করতে পারে। জীবন যাপনের এ পদ্ধতি অতীতেও বিশ্ব মানবতার জন্য কল্যাণ বহন করে এনেছে এবং আজো তার জন্য কল্যাণের পসরা নিয়ে অপেক্ষা করছে।

আমাদের দেশেও ইসলামী আন্দোলন এই একই পদ্ধতিতে কাজ করে যাচ্ছে। মুসলমানদের সাথে সাথে অমুসলিমদেরকেও ইসলামের দিকে আহবান জানানো হচ্ছে। বিগত সাত–আট'শো বছরে নানান ঘাত–প্রতিঘাতে এবং বিভিন্ন বিপরীতমুখী সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের সাথে সহাবস্থানের ফলে মুসলমানদের ইসলামী জীবন যাপনে শিথিলতা দেখা দিয়েছে। এ শিথিলতা বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে এসে পৌছেছে যার ফলে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী, খৃষ্টীয় ও মুশরিকী সভ্যতা মুসলিম সমাজে বিরাট ফাটল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই এ ফাটলের পরিসর বেড়ে যাচ্ছে। দেশের আলেম ও সূফীবাদী গোষ্ঠী মুসলিম জনগণকে সঠিক ইসলামী জীবনাচরণের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য প্রথম থেকেই চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য চিন্তা ও সভ্যতার প্রবল জোয়ার ধীরে ধীরে তাঁদের কর্মস্থল ও প্রভাব বলয়কে সীমিত ও সংকুচিত করে আনছে। মুসলিম সমাজ ও উঠতি বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর এমন বহু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে এই আলেম ও সূফী সমাজ শুধুমাত্র তাঁদের মান্ধাতার আমলের উপস্থাপনা ও প্রকাশভংগীর কারণে প্রভাবহীন হয়ে পড়ছেন। বাঙালি মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব বিস্তারের প্রথম পর্যায়ে মাত্র পঞ্চাশ বছর আগে যেখানে মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজের হৃদয়দেশে আলেম ও সুধী সমাজের প্রতিপত্তি ছিল দোর্দণ্ড ও অবিসংবাদিত, বলতে গেলে মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক তথা সর্ববিষয়ে তারাই ছিলেন নেতা ও পরিচালক, সেখানে আজ তাঁরা সম্পূর্ণভাবে এক কোণে আশ্রয়

নিয়েছেন। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলাম বিরোধী পাশ্চাত্যবাদী গোষ্ঠীর নেতৃত্বের জোয়ালে তাঁরাও মাথা গলিয়ে দিয়েছেন।

দেশের ইসলামী জীবনাচরণের ক্ষেত্রে আর একটি বড় শক্তি হচ্ছে তাবলীগী জামাত। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, নগরে-বন্দরে সর্বত্র প্রায় গত চল্লিশ বছর থেকে এই জামাত মুসলমানদের মধ্যে দীনী দাওয়াতের কাজ করে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মুসলমান এই জামায়াতের সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার জোয়ার ও পাশ্চাত্য চিন্তার প্রাধান্যকে ঠেকিয়ে রাখা এই জামাতের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। সম্ভবত তার বিষয়বস্তু ও কর্মক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা এবং উপস্থাপনার প্রাচীনত্বই এর কারণ। আর বিশেষ করে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও চিন্তা-মতাদর্শ যে ক্ষেত্রে অবস্থান করছে এই জামাত সে ক্ষেত্রটি সম্পূর্ণত পরিহার করার পলিসি গ্রহণ করেছে। ফলে কোথাও তার সাথে সংঘর্ষ বাধছে না বরং এক ধরনের সহাবস্থান চলছে।

এ অবস্থায় ইসলামী আন্দোলন মুসলমানদেরকে ইসলামী জীবনাচরণে অবিচল রাখার এবং ইসলামী মতাদর্শ বিরোধী জীবনাচরণে অভ্যস্ত মুসলিম গোষ্ঠীকে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। মুসলিম বুদ্ধিজীবী সমাজের কাছে ইসলামী চিন্তাধারা ও মতাদর্শের প্রাধান্য তুলে ধরেছে। বাংলাদেশে ইসলামী মতাদর্শ আজ আর কোন মান্ধাতার আমলের বস্তাপচা বা অবহেলিত আঁস্তাকুড়ের জিনিস নয়। ইসলামী মতাদর্শ বুদ্ধিজীবী সমাজের মননে স্বীকৃত প্রাধান্য লাভে সদর্পে এগিয়ে চলছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও মতাদর্শের প্রধান ওকালতির দায়িত্বটা এখন সুবিধাবাদী সেকুলার গোষ্ঠীর হাত থেকে খসে গিয়ে সীমিত হয়ে পড়েছে তথাকথিত মার্কসবাদে বিশ্বাসী গোষ্ঠীর হাতে। এই গোষ্ঠিটি মুখে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে আগড়ুম বাগড়ুম চালালেও এবং পাশ্চাত্য সভ্যতাকে পুঁজিবাদের প্রসব হিসেবে চিত্রিত করতে চাইলেও আসলে মার্কসবাদী সমাজ-সভ্যতা নতুন কোন সভ্যতার জন্ম দিতে পারেনি। এটা পাশ্চাত্য সভ্যতার চর্বিত চর্বণ ছাড়া আর কিছু নয়। এটাকে কতকটা আমাদের উপমহাদেশের বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সমাজের সাথে তুলনা করা যায়। আর্য ভারতের বর্ণবাদী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল বৌদ্ধ ধর্মের মূল সূর। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সময় দেখা গেলো বৌদ্ধরা বর্ণবাদী সমাজের মূল কাঠামোকে প্রায় সর্বত্র অপরিবর্তিত রেখেছে। ফলে এক সময় বিশাল ভারতবর্ষের প্রায় সবটাই বৌদ্ধধর্মের জোয়ারে ভেসে গেলেও এবং কয়েক যুগ ধরে মহাপ্রতাপান্বিত বৌদ্ধ সম্রাটগণ ভারতবর্ষে একচ্ছত্র রাজত্ব করলেও

বর্ণবাদী সমাজ যেমনকার ঠিক তেমনটিই রয়ে গেছে। আবার হিন্দু ধর্মে প্রত্যাবর্তনের পর তার কাঠামোর সামান্যতম পরিবর্তনও দেখা যায়নি। মার্কসবাদীরাও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ঠিক এমনিভাবেই আত্মস্থ করে নিয়েছে।

তবে ইসলামী আন্দোলনকে সবচেয়ে বড় বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। দুশো' বছরের ইংরেজের ও ইংরেজের অনুসারীদের প্রচেষ্টায় মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ কাঠামোটা ভেঙে চুরমার করে দেয়া হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার যে কাঠামোটাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা মুসলিম সমাজের চাহিদা পূরণে শুধু ব্যর্থই নয়, উলটো মুসলিম ও ইসলামী স্বার্থবিরোধী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামের জন্য প্রাণঘাতী বিষের সমতুল্য। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের এ বিষয়টা গভীরভাবে উপলব্ধির প্রয়োজন। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা কাঠামো প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটাকে যত বেশী গুরুত্ব দেয়া হবে ততই ইসলাম বিরোধী শক্তির মেরুদণ্ডে জরা ও পংগুত্ব দেখা দেবে।

বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের জন্য আর যে বিষয়টির গুরুত্ব বড় করে দেখা দরকার সেটা হচ্ছে, দেশের বিপুল সংখ্যক অমুসলিম গোষ্ঠীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানো। দশম, একাদশ, দ্বাদশ শতক থেকে পরবর্তী দু'তিন'শো বছর অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামী দাওয়াত চলেছিল তার ফলস্বরূপ আল্লাহর বান্দাদের একটি বিরাট গোষ্ঠী অন্ধকার থেকে আলোর পথে পাড়ি জমিয়েছিল। এ সময় ইসলামী দাওয়াত কোন রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা চায়নি। বরং ইসলাম তার নিজস্ব চেহারায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। ইসলামের এই চেহারার মধ্যেই ছিল অমুসলিমদের জন্য সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও ইসলামী জীবনাচরণের চেহারা যত বেশী ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হবে ততই ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত অমুসলিমদের জন্য আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। বর্তমানে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের যে অগ্রগতি তা শুধুমাত্র কুরআনিক মু'জিযার ফল। কুরআনের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাবে তারা ইসলামের দিকে এগিয়ে আসছে। তাই তাদের এগিয়ে আসাটা হচ্ছে নিতান্ত সীমিত। একদিকে মুসলিম সমাজের ইসলামী চেহারা এবং অন্যদিকে যথার্থ ইসলামী দাওয়াত যদি সঠিক পদ্ধতিতে তাদের কাছে পৌছে, তাহলে তাদের প্রকৃতি ইসলামের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারবে না। ইসলামী আন্দোলনকে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

২২
ইসলাম একটি বিপ্লবী শক্তি

ইসলামের আদর্শ ও মূলনীতিগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ইসলাম পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর মতো কেবলমাত্র একটি ধর্ম নয় বরং ধর্মের চাইতে বেশী একে একটি বিপ্লবী আন্দোলন বলা যেতে পারে। এই বিপ্লবী আন্দোলনটি অস্তিত্ব লাভের পরপরই মানুষের মন-মস্তিষ্কে একটি অভূতপূর্ব বিপ্লবের সূচনা করে। মানুষের আজীবনকালের চিন্তা-বিশ্বাসের ভিত্ নাড়িয়ে দেয়। তার ভাবনা-চিন্তা করার এবং অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাবার পদ্ধতিই বদলে যায়।

ইতিহাস থেকে প্রমাণিত, ইসলামের আগমনের পূর্বে মানবতা ধ্বংস, লাঞ্ছনা-অবমাননা ও সত্য বিকৃতির চরম পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। মানুষ নিজেই নিজের মূল্য ও মর্যাদা বিস্মৃত হয়েছিল। সে জানতো না, এই বিশাল বিশ্বজাহানের যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু তারই সেবায় নিয়োজিত। মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ এগুলো সৃষ্টি করেছেন তার সেবার জন্য। বরং তার মানসিক ও চিন্তার বিকৃতি এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল যে, তার সেবাদাস এই সৃষ্ট বস্তুগুলোকে সে নিজের খালেক, মালেক, স্রষ্টা ও রব মনে করে এগুলোর পূজা শুরু করে দিয়েছিল। সে সূর্য পূজা করতো। চাঁদকে সে বসিয়েছিল দেবতার আসনে। নক্ষত্র পূজার রেওয়াজ ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি নদী, পাহাড়, গাছপালা এবং পাথরের ও মাটির তৈরী মূর্তির পূজা তার কাছে মোটেই অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক মনে হয়নি।

মানুষ যখন এতো নীচে নেমে আসে এবং যখন তার মানসিক বিকৃতি এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যার ফলে সে নিজের চাইতে হীনতর মর্যাদার অধিকারী সৃষ্ট জীব ও বস্তুকে নিজের মাবুদ মনে করতে থাকে তখন তাকে গোলাম বানিয়ে নেয়া এবং তার গলায় দাসত্বের শৃংখল পরিয়ে দেয়া মোটেই কোন কঠিন ব্যাপার বলে মনে হয় না। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে তাই হয়েছে। মানুষের এই মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন সময় একদল বুদ্ধিমান, চালাক ও শক্তিশালী মানুষ দুনিয়ার বেশীর ভাগ জনবসতিকে গোলাম বানিয়ে নিয়েছিল। গোলামে পরিণত হবার পর মানুষের অবস্থা হয়ে গিয়েছিল পশুর চাইতেও খারাপ। পশুর মতো তাদের কেনাবেচা চলতো।

শক্তিশালী মানুষেরা এই দুর্বল মানুষদের পশুর মতো খাটাতো এবং পশুর মতো তাদের নিজেদের সেবায় নিয়োজিত করতো।

ইসলাম সর্বপ্রথম মানুষের এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। ইসলাম মানুষকে জানায়, সে হচ্ছে সৃষ্টির সেরা। এ বিশ্ব জাহানের যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে তার মতো মহান মর্যাদার অধিকারী কেউ নেই। সে আশরাফুল মখলুকাত। সমগ্র বিশ্ব জাহান সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের জন্য। সমগ্র সৃষ্টিকে তার করতলগত করে দেয়া হয়েছে। এগুলো ব্যবহার করার পূর্ণ কর্তৃত্ব ও অধিকার তাকে দেয়া হয়েছে। কাজেই তার এ সবের মূল মালিক ও সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর কাছে মাথা নত করতে হবে না। ইসলাম মানবতার অস্তিত্বের ভিত্তিমূল নাড়া দিয়ে বারবার তাকে জাগিয়েছে। তার ঘুমন্ত ও অসাড় সত্তার বুকে প্রাণের শিহরণ এনেছে। ফলে যে মানুষ নিজেকে প্রাণহীন ও তুচ্ছ নগন্য মনে করতো তার মধ্যে জেগে ওঠে নতুন হিম্মত, নবতর চেতনা ও নতুন সংকল্প। এটা বিশ্ব মানবতার প্রতি ইসলামের একটা অযাচিত করুণা। এ জন্য সে ইসলামের প্রতি যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক না কেন সামান্যই বিবেচিত হবে। ইসলামের এ অবদানকে কেমন করে সামান্য বলা যাবে, যা বিশ্ব মানবতাকে অধপতনের সর্বনিম্ন স্তর থেকে উঠিয়ে তাকে উন্নতির শীর্ষে বসিয়ে দিতে সাহায্য করেছে? যে মানুষ একদিন পাথর গাছপালা ও মাটির মূর্তির সামনে মাথা নত করতো, সে আজ সমগ্র বিশ্ব জাহানকে নিজের ঘরের বাঁদি মনে করতে শুরু করেছে। বিশ্ব জাহানের অনেক অসাধারণ শক্তিকে সে আজ নিজের করতলগত করেছে। তার মধ্যে আজ নতুন হিম্মত সৃষ্টি হয়েছে। সে আরও অনেক অসাধ্য সাধনের চেষ্টায় নিয়োজিত। وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ – الجاثية –١٢ –আর পৃথিবী ও মহাশূণ্যের মধ্যে যা কিছু আছে সবই তিনি তোমাদের করতলগত করেছেন–কুরআনের এ মহাবাণীকে আজ সে একটি চিরন্তন সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইসলামের বদৌলতে আজ দুনিয়ায় বড়–ছোট, প্রভু–মালিক, মনিব–ভৃত্যের পার্থক্য খতম হয়ে গেছে। দুনিয়ার অধপতিত মানব সমাজ ইসলামের বদৌলতে এমন এক উন্নত সভ্যতার অধিকারী হয়েছে যেখানে প্রত্যেকটি মানুষের উন্নতির দুয়ার সমানভাবে উন্মুক্ত। জাগতিক ও বৈষয়িক উন্নতির জন্য আজ সবাই সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। ইসলামের বিপ্লবী ভূমিকার পরই আজ বিশ্ব মানবতার পক্ষে এটা সম্ভবপর হয়েছে।

ইসলাম চিরকালই রক্ষণশীল চিন্তার مَا كَانَ عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا (আমার বাপ দাদারা যা করে এসেছে) মোকাবিলায় প্রগতিশীল চিন্তার ধারক। এটা ইসলামেরই বৈশিষ্ট। ইসলাম কেবল তার আবির্ভাবের যুগেই রক্ষণশীলতার বিরোধিতা করেনি, আজ চৌদ্দ'শো বছর পরেও প্রগতিশীলতার এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা ও কর্মনীতির সন্ধান দিয়ে যাচ্ছে, যা তাকে মানবতার অতীত ও বর্তমানের সমস্ত গুণাবলী ও সৎকর্মের ধারকে পরিণত করেছে। ধর্মের মান্ধাতার আমলের চিন্তা পরিহার করে ইসলাম তার এমন একটা চিন্তা পেশ করে, যা ধর্মকে সুস্থ মানব সমাজ গঠনের উপায়ে পরিণত করে। ধর্মের নামে ইসলাম মানুষকে এমন একটি জীবন বিধান দান করেছে, যা ধর্ম–বর্ণ–জাতি নির্বিশেষে মানব সমাজকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এছাড়াও সবার শান্তি–নিরাপত্তা–ইজ্জত আবরুরও জামানত দেয়। এই সংগে প্রাকৃতিক আইনের আওতায় প্রত্যেকটি মানুষকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জীবন যাপনের পথও বাতলে দেয়।

ইসলাম একটি ধর্ম হিসেবে সর্বপ্রথম মানুষকে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর সামনে মাথা নত না করার আহবান জানায়। এই সংগে তার অনুসারীদের ইসলাম ছাড়া অন্য চিন্তাধারায় বিশ্বাসীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ না করারও নির্দেশ দেয়। সব ব্যাপারে মানুষকে চিন্তা–ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরামর্শ দেয়। আল্লাহর বিশাল সৃষ্টি জগতের সর্বত্র ঘোরাফেরা করে সৃষ্টির নিদর্শনগুলো পর্যবেক্ষণ করে তা থেকে জ্ঞান আহরণ করতে ও মানবতার কল্যাণ ও উন্নতির জন্য মহান আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করে রেখেছেন তার সহায়তা গ্রহণ করতেও উদ্বুদ্ধ করে।

ইসলামের এ দাওয়াত অন্যান্য ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি বিপ্লবী দাওয়াত। এ জন্যই ইসলামকে একটি ধর্ম না বলে বরং একটি বিপ্লবী আন্দোলন ও বিপ্লবী শক্তি বলাই যুক্তিযুক্ত।

২৩
ইসলামী নেযামের আকাংখা

বিগত তিন চার দশক থেকে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী নেযামের আকাংখা খুব বেশী বেড়ে গেছে। যেসব মুসলিম দেশ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন সংগ্রাম চালিয়ে স্বাধীনতার অমূল্য সম্পদ লাভ করেছে, তারা তো স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে ইসলামী নেযামের স্বপ্নে বিভোর ছিল। বরং বলা যায়, এই স্বপ্নই তাদের প্রেরণা যোগায়। আর যেসব মুসলিম দেশ বিদেশের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল না। তারাও দীর্ঘকালীন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বর্তমানে ইসলামী নেযামের কথা চিন্তা করছে। কিছুসংখ্যক মুসলিম দেশ এখনো সমাজতন্ত্র ও অন্যান্য ইসলাম বিরোধী মতবাদের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। কিন্তু আমরা যতদূর জানি সে সব দেশের মুসলিম জনতা ঐ সব অনৈসলামী মতবাদ গ্রহণ করেনি এবং ঐ মতবাদগুলো সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের জটিলতা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে ঐ মতবাদগুলোর দিনও সেখানে শেষ হয়ে আসছে। এমনকি সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর কোন কোনটিতে মুসলিম জনতা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত হয়েছে। আর এই জিহাদেও তাদের প্রেরণা যোগাচ্ছে ইসলামী নেযাম কায়েমের উদগ্র বাসনা। তাছাড়াও কোন কোন অমুসলিম দেশের সংখ্যালঘু মুসলিম জনতাও ইসলামী নেযামকে তাদের জীবন সমস্যার সবচেয়ে ভালো সমাধান হিসেবে পেশ করার চেষ্টাও চালাচ্ছে।

এভাবে ইসলামী নেযামের ব্যাপারে সারা বিশ্বের মুসলিম জনতার মধ্যে একটা গভীর একাত্মতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। মুসলিম জনতার এই একাত্মতাই বোধহয় শাসক সমাজকে 'তাওআন ও কারহান'–ইচ্ছায়–অনিচ্ছায় ইসলামের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে। নয়তো আজ থেকে তিরিশ বছর আগের কথা চিন্তা করা যাক। আমাদের নবজাত মুসলিম শাসক সমাজ ইসলামী নেযামের কথায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লাফিয়ে উঠতেন এবং ইসলাম যে একটা সেকেলে ধর্ম এবং এর আইন যে কেবল অসভ্য ও বর্বরদের উপযোগী, এ কথা পরোক্ষ নয়, প্রত্যক্ষভাবেই তারা বলেছেন। এমনকি কোন কোন মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান এ ধরনের হুংকারও ছেড়েছেন যে, যারা ইসলামী নেযাম চায় তাদেরকে চাঁদির কিশ্‌তিতে সওয়ার করিয়ে পাশের কুফরি মুল্লুকে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু আল্লাহর ফযলে ইসলামী নেযামের প্রত্যাশীরা বহাল তবিয়তে স্বদেশের

মাটিতে বসে আছে কিন্তু হুকোরদাতাদের অনেকের দেশ ছাড়তে হয়েছে অত্যন্ত অমর্যাদাকর পরিস্থিতির মধ্যে।

তারপর এটাও একটা চিন্তার বিষয়, বিশ্বব্যাপী ডজনকে ডজন মুসলিম দেশের জনতাই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে, রক্ত ঝরিয়েছে। এই সংগ্রামে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবীর সাথে অনেক দেশের সেনাবাহিনীর লোকেরাও অংশ নিয়েছে। জনতা নিজেদের খেয়াল খুশীমতো দেশ পরিচালনার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন মুসলিম দেশে সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতা কেমন করে এসে গেলো? সেনাবাহিনী কি জনগণের খায়েশ ও ইচ্ছা পূরণ করার জন্য দেশের প্রতিরক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের চাইতে দেশের জনগণের ওপর রাজত্ব করাটাই বেশী প্রয়োজনীয় মনে করেছে? না, একথা মোটেই সত্যি নয়। অন্তত তিরিশ চল্লিশ বছরের টানাপোড়নের পর আজ একথা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সমস্ত মুসলিম দেশের মুসলিম জনতা ইসলামী নেযামের ব্যাপারে আপোশহীন। আর এই ইসলামী নেযামের সবচেয়ে বড় যে বিরোধী গোষ্ঠী তা এই মুসলিম জনতার মধ্য থেকেই এসেছে। বিদেশী ঔপনিবেশিকরা গত এক'শো দু'শো বছর ধরে মুসলিম দেশগুলো থেকে অনেক সম্পদ লুট করেছে। কিন্তু তারা আমাদের যে সবচাইতে মূল্যবান সম্পদটি লুট করেছে তা হচ্ছে আমাদের ঈমান ও ইসলামী নেযামের প্রতি সুগভীর প্রত্যয়। তারা আমাদের ভাই বেরাদারদের মধ্য থেকে এমন একটি দল তৈরী করে গেছে যারা তাদের মতোই ইসলামী নেযামের ঘোরতর শত্রু। ঔপনিবেশিক শাসকরা চলে যাবার সময় বিভিন্ন দেশে আমাদের এ ঘরের শত্রু বিভীষণদের হাতেই দেশ শাসনের চাবিকাঠি দিয়ে যায়। এই বিভীষণরা ইসলামী জনতার ধাক্কা সামলাতে না পারার কারণেই দৃশ্যপটে সর্বত্রই সেনাবাহিনীর আবির্ভাব।

শুধু জনগণের খায়েশ ইসলামী নেযাম প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয় এবং সৈনিকের শেষ ব্যারিকেড পার হলেই গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে, একথাও ঠিক নয়। ইসলামী নেযাম কায়েমের জন্য সচেতনতা ও সহনশীলতাও প্রয়োজন। সামরিক ব্যারিকেডের মধ্য দিয়েও বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী নেযামের চর্চা চলছে। কোন কোন সামরিক সরকার দু'চারটে ইসলামী আইন ও সামাজিক বিধানও চালু করার চেষ্টা করছেন। তবে জনগণ বিশেষ করে আলেম সমাজ ও সংশ্লিষ্ট দেশের ইসলামী দলগুলোকে সচেতন থাকতে হবে যে, তারা যা করছেন তা যথার্থই ইসলামী কিনা এবং তার পেছনে কতটুকু আন্তরিকতার ছাপ আছে। দ্বিতীয়ত যেসব দেশে কিছু কিছু ইসলামী বিধান

জারির চেষ্টা চলছে সেগুলোকে চূড়ান্ত মনে না করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়েই রাখা উচিত।

ইসলামী নেযাম যে একমাত্র সমাধান মুসলিম দেশগুলোর শাসক সমাজ এ কথা উপলব্ধি করতে পারছেন বলে মনে হয়। তবে তাদের এ উপলব্ধিকে চাতুর্যের আড়ালে ঢেকে রেখে অনর্থক কালক্ষেপণের কোন অর্থ হয় না। আজ হোক বা কাল তাদের জন্য এটিই একমাত্র পথ। জাতীয় আশা-আকাংখা পূরণকারী হিসেবে ইতিহাসে স্থান নিয়ে তারা যশস্বী হবেন এবং জাতীয় হিরোর আসন লাভ করবেন, না জাতীয় আশা-আকাংখাকে দলিত মথিত করে ইতিহাসের কলংক হিসেবে চিরকাল ঘৃণিত হতে থাকবেন, এটা অবশ্যি তাদের নিজেদের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। তবে মুসলিম জনতা তাদের রায় দিয়ে দিয়েছে। ইসলামী নেযাম থেকে এক বিন্দু সরে আসতে তারা প্রস্তুত নয়। এ জন্য তারা কোন শত্রুর রক্তচক্ষু ও সৈনিকের বেয়নেটের পরোয়া করবে না।

২৪
সবরই সাফল্যের চাবিকাঠি

গন্তব্য ও লক্ষ স্থির থাকলে কাফেলার পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। আর এ কাফেলা গতি সম্পন্ন হলে একদিন সে তার লক্ষে পৌছে যাবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কাফেলা যদি গতিসম্পন্ন না হয় তাহলে গন্তব্যের মনোরম কল্পনাই তার সম্বল হবে, সে সম্পর্কে সুন্দর সুন্দর কাহিনী সে তৈরী করতে পারবে কিন্তু কোনদিন গন্তব্যে পৌছানো তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

বিশ শতকের প্রথমার্ধেই ইসলামী আন্দোলনের কাফেলা দুনিয়ার বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষাভিসারী হয়ে এগিয়ে চলার শপথ নিয়েছে। তুরস্ক, আরব বিশ্ব, হিমালয়ান উপমহাদেশ ও দক্ষিণ পূর্ব এশীয় মুসলিম ভুখণ্ডে এ আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এ আন্দোলনগুলো এসব এলাকায় নিজেদের ঘাঁটি মজবুত করে নিয়েছে। এ আন্দোলনগুলোর স্বীকৃতি আজ বিশ্বজুড়ে। প্রধানত এশিয়া মহাদেশ ও আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে এর বিস্তার হলেও বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকায়ও এর বিস্তৃতি লক্ষ করার মতো।

সর্বত্র এ ইসলামী আন্দোলনগুলো মুসলিম জনজীবনে ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশ, জনগণের ইসলামী চরিত্র গঠন এবং পাশ্চাত্য তথা মুশরিকী ও জাহেলী সভ্যতার স্থলে ইসলামী সভ্যতার প্রতিষ্ঠার কাজ করে যাচ্ছে। উনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের শুরুতে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মধ্যে যে হীনমন্যতাবোধ জেগে উঠেছিল এখন তার ছিঁটেফোটাই আছে। ইসলাম এখন একটা পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিছুদিন আগেও যে কুফরী ও জাহেলী শক্তিগুলো ইসলামকে ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করতো না এখন তাকে একটি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। ফলে اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ –দুনিয়ার সমগ্র কুফরী শক্তি এক গোত্রভূক্ত–রসূলের এ বাণীর তাৎপর্য অনুযায়ী ইসলাম বিরোধী সমস্ত শিবির ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে গেছে। মোট কথা ইসলামী আন্দোলনগুলোর বিগত পঞ্চাশ বছরের প্রচেষ্টা–সাধনায় সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক পটপরিবর্তন হয়েছে, যা খালি চোখে দেখা যায়। ইসলামের আজ আর পিছিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বরং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠার পথেই সে এগিয়ে চলেছে।

এ পর্যায়টা দু'দিনে সম্পন্ন হতে পারে আবার দশ দিনেও সম্পন্ন হতে পারে। অবস্থা, পরিবেশ ও ক্ষেত্র প্রস্তুতির ওপর তা নির্ভর করবে। তবে প্রথম পর্যায়ে ইসলামী আন্দোলনের জন্য যেটা সবচাইতে জরুরী ছিল এই চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেও সেটার প্রয়োজনীয়তা এক তিলও কমেনি। সেটা হচ্ছে সবর। প্রথম পর্যায়ে যেমন ধীরে সুস্থে ভিত্ রচনার কাজ করতে হয়েছে তেমনি শেষ ও চূড়ান্ত পর্যায়েও ধীরে-সুস্থেই গন্তব্য ও লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়ে যেতে হবে। যদি আন্দোলনকে একটা বহতা নদীর সাথে তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে নদী তার উৎপত্তির পর থেকে শুধুমাত্র গতির মাধ্যমে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে অসীম ধৈর্য সহকারে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। মোহনার কাছাকাছি পৌঁছেও সে অধৈর্য হয়নি, তার নিজস্ব পথেই সাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ইসলামী জীবনবোধে চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে এ জন্য সবরকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেয়া হয়েছে। সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ মুমিনদেরকে তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে বলেছেন এবং তিনি নিজে সবরকারীদের সংগে রয়েছেন বলে ঘোষণা করেছেন। মুমিনরা পরস্পরকে যেমন হকের দিকে উদ্বুদ্ধ করে তেমনি আল্লাহ তাদের পরস্পরকে সবর অবলম্বন করার এবং সবরের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করার ও লক্ষে স্থির থাকার পরামর্শ দিতে বলেছেন। সবরই ইসলামী আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ শক্তিকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। আবার সবর অবলম্বন না করার কারণে আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সবরই মানুষকে আত্মপর্যালোচনা ও নিজের কর্মকাণ্ড বিচারের সুযোগ দেয় এবং এই সংগে অন্যের কাজের ভালো দিকগুলোও সামনে তুলে ধরে। আন্দোলনের কোন এক পর্যায়ে বেসবর হবার কারণে সত্য থেকে বিচ্যুতিও ঘটতে পারে। এ জন্যই আল্লাহ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ এর সাথে সাথে تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ এর নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায়, মুমিনদের হকের ওপর টিকে থাকার জন্য সবরের প্রয়োজন।

ইসলামী আন্দোলনের কঠিনতম দিনগুলোয় যারা সবর করেছিলেন পরবর্তী পর্যায়ে তাদের অনেকে আর তার ওপর টিকে থাকতে পারেননি এর বহু দৃষ্টান্ত বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইতিপূর্বে পাওয়া গেছে। দ্রুত লক্ষে পৌঁছার জন্য তারা শর্টকাট পথের তালাশ করেছেন। কেউ বা পথ বন্ধ দেখে পথ কেটে বা সিঁড়ি তৈরী করে নেমে যাবার চেষ্টা না করে ওপর থেকে সোজা ঝাঁপ দিয়েছেন। ঝাঁপ দিয়ে কোথায় পড়ছেন সেটা আর তারা দেখেননি। কারণ ঝাঁপ দেয়া থেকে নিয়ে নীচে পড়া পর্যন্ত এ সময়টা তাঁরা আছেন শূন্যে এবং এ সময়ের

অবস্থানটা তাদের নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরে। ইসলামী আন্দোলনের জন্য এমন কোন অবস্থা কল্পনাই করা যায় না। আবার কেউ তো বেসবর হয়ে একেবারে অন্য পথে পাড়ি জমিয়েছেন। এ দু'দলের ব্যর্থতায় তো কোন সন্দেহই নেই। এতে ইসলামী আন্দোলন যতটুকু না ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা নিজেরাই। কারণ পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গেছে, দ্রুত লক্ষে তারা তো পৌছুতেই পারেননি উপরন্তু তাদের অনেকের লক্ষ বিচ্যুতিও ঘটেছে।

বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের এ অবস্থা থেকে অবশ্যি শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। লক্ষে অবিচল থাকা ইসলামী আন্দোলনের একটা অপরিহার্য শর্ত। আল্লাহর ভাষায় ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا – (حم السجده : ٣٠)

"অবশ্যি যারা বললো, আল্লাহ আমাদের প্রভু তারপর এর ওপর তারা অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তাদের ওপর ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়ে বলে তোমরা ভয় পেয়ো না এবং মর্মাহতও হয়ো না।"

দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর যদি এই দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে নিষ্ঠার পরিচয় না দেয়া হয় তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতারা এসে তাকে সহায়তা দান করতে পারে না।

২৫
প্রতিপক্ষের দিন শেষ হয়ে এসেছে

যে দেশে ইসলাম একদিন লাঞ্ছিত পদদলিত হয়েছিল, ইসলামের শেষ আলোক রেখাটুকুও একদা যে দেশের অন্ধকার আকাশের বুকে নিরবে তলিয়ে গিয়েছিল, যে দেশের মানুষের চেহারায় ও চলনে বলনে আল্লামা ইকবাল আজো মুসলমান ও আরবীয়দের স্মৃতিচিহ্ন অধ্যয়ন করতে পেরেছিলেন, ইসলামের সেই আগ্রাসী শত্রু স্পেনে আজ আবার নতুন করে ইসলামের যাত্রা শুরু হয়েছে। পঞ্চদশ শতকের ইসলামী বিশ্বে এটাই বোধ হয় সবচেয়ে চমকপ্রদ খবর।

এ বছরের হজে[১] পাঁচজন স্প্যানিশ মুসলমানসহ সে দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের একটি বিরাট দল শরীক হয়েছিল। এ থেকে বুঝা যায় স্পেনের দরজা আজ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে। আজ থেকে কয়েক'শো বছর আগের গ্রানাডার শেষ শাসক আবু আবদুল্লাহর পতনের সাথে সাথেই স্পেন থেকে মুসলমানদের শেষ চিহ্নও মুছে যায়। লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে পাইকারী হারে হত্যা এবং মুসলমান ছেলে ও মেয়েদেরকে জোরপূর্বক খৃষ্টান করার মাধ্যমে সে দেশ থেকে ইসলামকে পুরোপুরি বিদায় দেবার ব্যবস্থা করা হয়। সমস্ত স্পেনে ছড়িয়ে থাকা হাজার হাজার মসজিদ বন্ধ করে দিয়ে খৃষ্টান সম্প্রদায় সেগুলোকে নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে থাকে। এই সংগে সারাদেশব্যাপী ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের তুফান সৃষ্টি করা হয়।

কিন্তু সম্প্রতি স্পেন সরকার রাজধানী মাদ্রিদে 'ইসলামিক এ্যাসোসিয়েশন অব স্পেন' নামক ইসলামী সংগঠন কায়েম করার অনুমতি দিয়েছেন। এ এ্যাসোসিয়েশন স্পেনে ইসলাম প্রচার, বিভিন্ন শহরে ইসলামী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ইসলাম বিরোধী অপপ্রচারের জবাব দান, স্থানীয় ও অস্থানীয় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা এবং সমগ্র ইসলামী বিশ্বের সাথে স্পেনীয় মুসলমানদের সম্পর্ক জোরদার করার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই মাদ্রিদ, বার্সিলোনা, গ্রানাডা, কর্ডোভা প্রভৃতি ১৩টি বড় বড় শহরে ইসলামী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এই সংগে নওমুসলিমদের দীনী জীবন সংগঠনের কাজও।

---

১. এখানে ১৪০১ হিজরী তথা ১৯৮১ সালের হজের কথা বলা হয়েছে।

স্পেনে ইসলামের এই যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি, এর মূলে যে মর্দে মুমিনের সবচাইতে বেশী অবদান, নিজের কলিজার খুন দিয়ে যে মর্দে মুজাহিদ স্পেনের এই বিশুষ্ক ভূমিকে ইসলামের জন্য আবার উর্বর করে তুলেছেন তাঁর কথা আলোচনাই আমাদের আজকের এ নিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। সিরিয়ার বাথপন্থী নুসাইরী হাফিজ আল আসাদ সরকারের গোপন গেরিলা সংগঠন স্পেনের বার্সিলোনা শহরে গত ২২ নভেম্বর তাঁকে শহীদ করে। শহীদ নাযার সাবাগ ছিলেন ইতিপূর্বে সিরিয়ার ইখওয়ান নেতা। ১৯৬৭ সাল থেকে তিনি সিরিয়া ত্যাগ করে স্পেনে এসে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর স্পেনে আসার মাত্র এক বছর আগে গ্রানাডায় বসবাসকারী কয়েকজন মুসলিম ছাত্র সেখানে ইসলামী সেন্টার কায়েম করেন। জনাব সাবাগের আগমনের পর তাদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। শহীদ নাযার সাবাগের প্রচেষ্টায় কয়েক বছরের মধ্যে স্পেনে ইসলাম প্রচারের জন্য ইসলামী কেন্দ্রের জাল বিছানো হয়। স্পেনীয়দের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি কিছুদিনের মধ্যে স্প্যানিশ ভাষাও শিখে ফেলেন। স্প্যানিশ ভাষায় যখন তিনি কথা বলতেন তখন কেউ তাকে ভুলেও অস্পেনীয় বলে ধারণা করতে পারতো না। তাঁর মাত্র কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় স্পেনের বহু সুপরিচিত খৃষ্টান নেতা ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের ভিত্তি সে দেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

বিগত অর্ধ শতক থেকে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। এ আন্দোলন শহীদ নাযার সাবাগের মতো হাজার হাজার মর্দে মুজাহিদ তৈরী করেছে। তারা দীনের জন্য অকাতরে প্রাণ উৎসর্গ করতে মোটেই কুন্ঠিত হননি। কুরআনের শাশ্বত বাণীকে সত্য প্রমাণ করে তাঁরা আজো প্রাণ দিয়ে যাচ্ছেন।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ -(الاحزاب : ٢٣)

"মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহর সাথে নিজেদের ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করেছে, তাদের মধ্যে একদল তাদের লক্ষে পৌছে গেছে আর একদল আছে প্রতীক্ষারত।"

ইসলামী বিশ্বের প্রায় সব দেশেই আজ এই প্রাণ উৎসর্গকারী দল তৈরী হয়ে গেছে। তারা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেই চলেছে। নিজেদের দেশে ইসলামী জীবন বিধান কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তারা ক্ষান্ত হবে না। এ অবস্থায়

বিরোধী পক্ষ আজ যতই শক্তিশালী হোক না কেন একদিন তাদের ইস্পাতের তৈরী প্রাসাদও ভেংগে পড়তে বাধ্য হবে।

এই সংগে আরেকটি বিষয়ও কম প্রণিধানযোগ্য নয়। ইসলাম তার নিজের দেশে মজলুম হওয়া সত্ত্বেও অন্য দেশে আজ তার প্রভাব বেড়ে চলছে। যে দীন ও জীবন বিধান নিজেকে বিস্তৃত ও প্রসারিত করার ক্ষমতা রাখে তার বিজয়কে আটকে রাখার ক্ষমতা কারোর নেই। প্রতিপক্ষের জুলুম, নির্যাতন ও মারমুখিনতার প্রচণ্ডতা বৃদ্ধিই প্রমাণ করে যে, তাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। শহীদ নাযার সাবাগের মুখেই শুনুন ঃ

"খালেদ উসামা ছিলেন একজন ইসলাম বিদ্বেষী খৃষ্টান যুবক। তিনি গীর্জার সেবায় জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। আমি তার সাথে বন্ধুত্ব করলাম। তারপর ধীরে ধীরে তাকে ইসলামের দিকে টানতে লাগলাম। কিন্তু স্পেনের একজন তেজী ঈসায়ী যুবক আরবদের ইসলাম সম্পর্কে চিন্তা করতে প্রস্তুত নয়। এ যুবকটির কাছে ইসলাম পেশ করার আমার সমস্ত প্রচেষ্টা ভেস্তে যাচ্ছিল। এ সময় মওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর (র) 'ইসলাম পরিচিতি' বইটির স্প্যানিশ অনুবাদ ছাপা হয়ে গিয়েছিল। এ অনুবাদ বইটি আমি তাকে দিলাম পড়ার জন্য। প্রথমে তো সে বইটিতে হাত লাগাতেই চাইলো না। কিন্তু সম্ভবত তার ভেতরের সৎবৃত্তি তার ওপর অনবরত চাপ দিয়ে চলছিল। এক সময় সে বললো, দাও বইটি, ইসলামের মালমসলার সাহায্যেই আমি ইসলামের প্রাসাদ গুঁড়ো করে দেবো।

কিন্তু কিতাব পড়া তখনো বোধ হয় শেষ হয়নি একদিন চুপিচুপি এসে আমাকে বললো ঃ "নাযার ভাই, আমার মনের মধ্যে যে তুফান চলছে। এ বইটি যে আমার মনের ওপর চেপে বসেছে। আমি মুসলমান হতে চাই।"

আমি অভ্যাস সামলাতে না পেরে জোরে "আল্লাহ আকবর" বলে চীৎকার করে উঠলাম। খালেদকে বইটি দেবার সময় আমি আল্লাহর কাছে মুনাজাত করেছিলাম–"হে আল্লাহ! আমি একজন বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ঈসায়ী যুবককে তোমার দীনের দাওয়াত দিচ্ছি....দাওয়াত দেয়া আমার কাজ আর তার মনে ইসলামের প্রভাব সৃষ্টি করা তোমার কাজ।'' আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন।"

২৬

ইসলামের প্রতি হতে হবে নিষ্ঠাবান

আমাদের প্রতিবেশী দেশে হরিজনদের ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণ নিয়ে কিছুদিন থেকে বেশ হই চই হচ্ছে। সে দেশের সরকারেরও উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা কম মনে হচ্ছে না। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আইন করে ধর্মান্তর গ্রহণ বন্ধ করার প্রচেষ্টা চলছে। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। এর পেছনে কোন কোন মহল থেকে আবার বৈদেশিক অর্থের কারসাজিও আবিষ্কার করা হচ্ছে। ভারতীয় হিন্দু জনতার বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্থাও এই ধর্মান্তর গ্রহণ বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় ও গণপর্যায়ে এতসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ধর্মান্তর গ্রহণের সিলসিলা বন্ধ হয়নি। বরং শুধু হরিজন নয়, অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়, শিখ ও খৃষ্টানদের মধ্যেও ধর্মান্তর গ্রহণের অনেক খবর পাওয়া যাচ্ছে।

অবশ্য শুধু রাশিয়া ও চীন এবং এদের আশ্রিত কয়েকটি রাষ্ট্র ছাড়া বাকি দুনিয়ার প্রায় সব দেশেই অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের স্বাভাবিক গতি সব সময় অব্যাহত রয়েছে। তবে বিশ শতকে ইসলাম গ্রহণের গতির ব্যাপারে রেকর্ড সৃষ্টির ক্ষেত্রে বোধ হয় আফ্রিকা মহাদেশের পর ভারত দ্বিতীয় দেশ। হিজরী পঞ্চদশ শতকের সূচনাবর্ষে ভারতীয় অমুসলিমদের এই ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণ তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই।

ইসলাম প্রচারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এমনিতো গত চৌদ্দশ বছরের মধ্যে ইসলাম দুনিয়ার সব দেশে বিস্তার লাভ করেছে। এর পরিসর বৃদ্ধি হতেই থেকেছে। কিন্তু রসূলুল্লাহর (সা) আবির্ভাব কাল থেকে নিয়ে পরবর্তী একশ বছর পর্যন্ত এর গতি ছিল সবচাইতে দ্রুত। এ সময় মনে হচ্ছিল ইসলামের অন্তরনিহিত সত্য দুনিয়ার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। ইসলাম একের পর এক এশিয়া ও আফ্রিকার বহুদেশ জয় করে নিয়েছে। রসূলের পর সাহাবা, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণ তাঁদের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন। ইসলাম প্রচারকে তাঁরা নিজেদের জীবনের প্রধান দায়িত্ব ও মিশনে পরিণত করে নিয়েছিলেন। বরং বলা যায় তাদের সমগ্র জীবনটাই ছিল ইসলামের মূর্তিমান প্রচারক। তারা ইসলামে বিশ্বাস করতেন এবং নিজেদের জীবনকে ইসলামের নীতি অনুযায়ী পরিপূর্ণরূপে গড়ে তুলেছিলেন। তাদের বিশ্বাস, কথা,

কাজ ও জীবনধারার মধ্যে কোন বৈপরীত্য ছিল না। ফলে তাদের কথা ও জীবন ধারায় যে কোন অমুসলিম প্রভাবিত হতো। কুরআনে ইসলাম প্রচারের এ ধারাটিই ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (حٰمٓ السجده : ٣٣)

"যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে এই সংগে ভালো কাজ করে এবং বলে আমি আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পিত, তার চেয়ে ভালো কথা আর কে বলতে পারে?"

হিজরী প্রথম শতকের মুসলমানরা ছিলেন কুরআনের এই বক্তব্যের প্রতিমূর্তি। তাঁরা নিজেরা ইসলামে পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন এবং তার বিধানগুলো নিজেদের জীবনে সম্পূর্ণরূপে মেনে চলতেন। তারা একমাত্র আল্লাহর নিকট নিজেদেরকে সমর্পণ করেছিলেন। আল্লাহ ছাড়া আর কোন শক্তি, প্রতিভা বা বুদ্ধিবৃত্তি তা যত বড়ই হোক না কেন তার আনুগত্য করতে তারা প্রস্তুত ছিলেন না। এ জন্য তাদের বক্তব্য হতো সুস্পষ্ট। তাদের জীবন হতো স্বচ্ছ। সাধারণ মানুষ তাদের কথায় ও কাজে ইসলামের পরিপূর্ণ চিত্র দেখে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতো। তাই ইসলাম প্রচারের ধারা সে যুগে চলেছিল সয়লাবের মতো। মুসলমানরা যে দেশে প্রবেশ করেছে, তাদের ঈমান, আকীদা, চরিত্র, আচার-ব্যবহার, লেনদেন, কাজকর্মে মুগ্ধ হয়ে অমুসলিমরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। মুসলমানদের কথায় ও কর্মে আকীদায় ও জীবন ধারায় বৈপরীত্য যত বেড়ে গেছে অমুসলমানদের ইসলাম গ্রহণের গতি ততই মন্থর হয়েছে। এভাবে উনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের প্রথম পর্বে এসে মুসলমানদের আকীদা ও জীবন ধারার এ বৈপরীত্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যায়। ফলে ইসলাম প্রচার ও অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের ধারা একেবারেই স্তিমিত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশে কখনো কখনো একটি দু'টি ইসলাম গ্রহণের ঘটনা শোনা যেতো। তাও যারা ইসলাম গ্রহণ করতো, তারা মুসলমানদের দেখে নয় বরং কুরআন অধ্যয়ন করে এবং আল্লাহর রসূলের জীবন ধারায় প্রভাবিত হয়েই ইসলামের অংগনে প্রবেশ করতো। নয়তো মুসলমানদের দিকে নজর দিলে তারা ইসলাম থেকে আরো দূরে সরে যেতো। আল্লামা ইকবাল এই বিংশ শতকী মুসলমানদের সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন ঃ 'এইসব মুসলমানদের দেখে ইহুদীরাও লজ্জা পায়।'

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর পূর্ব থেকেই মুসলমানদের মধ্যে এক নতুন জাগরণ দেখা দিলো। মুসলমানরা কুরআন ও আল্লাহর রসূলের নেতৃত্বের দিকে ফিরে আসার প্রচেষ্টা চালালো। এ প্রচেষ্টা প্রথম দিকে বিপুল বাধার সম্মুখীন হয়েও মাত্র বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একটি শক্তিশালী ও পূর্ণাংগ কাঠামো লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। মুসলমানদের ব্যক্তি জীবন ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়–এ উভয় ক্ষেত্রে পূর্ণাংগ ইসলাম প্রতিষ্ঠাই এ প্রচেষ্টার লক্ষ।

এ দুটি ক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি আগাছামুক্ত করাই ছিল প্রথম ও প্রধানতম প্রয়োজন। মুসলমানদের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতে ধ্বস নেমেছিল বিগত কয়েক'শো বছর থেকে। এ ধ্বস একটু একটু করে অগ্রসর হয়ে মহা ধ্বসে পরিণত হয় এবং মুসলমান সমাজের একটি অংশকে নামে মাত্র মুসলমান থাকলেও ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ খারিজ করে দেয়। এই সংগে মুসলিম সমাজের বৃহত্তম অংশের বিশ্বাসের মধ্যে সংশয়ের কীটাণু অনুপ্রবেশ করায়। বিগত পঞ্চাশ বছরের প্রচেষ্টা এ সংশয় থেকে মুসলমানদেরকে অনেকাংশ মুক্ত করতে পেরেছে। এখন বিশ্ব মুসলিম সমাজের এক বিরাট অংশ একমুখী হতে সক্ষম হয়েছে। একদিকে ইসলামের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং অন্যদিকে ব্যক্তি জীবন ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আজকের বিশ্বের মুসলমানদেরকে একটি শক্তিতে পরিণত করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানদের সংকল্পের দৃঢ়তা বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিতে সক্ষম হচ্ছে। মুসলমানরা যতই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে ইসলামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে ততই বিশ্ব মানবতা ইসলামকে নিজের ধর্ম মনে করতে সক্ষম হচ্ছে।

তাই আজকের ভারতে অমুসলিমদের বিশেষ করে সবচাইতে নির্যাতিত হরিজনদের ব্যাপক হারে ইসলাম গ্রহণ মোটেই বিস্ময়কর বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বর্তমান দুনিয়ার কোন একটি দেশে যদি পূর্ণাংগ ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের গতি আরো দ্রুত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

২৭
রমযানের রোযার তাৎপর্য

রমযান মাস শুরু হয়ে গেছে। আমরা সবাই রমযানের রহমতের মধ্যে ডুবে গেছি। এটি একটি অযাচিত রহমত আমাদের রবের পক্ষ থেকে, যা তিনি আমাদের জন্য প্রতি বছর নাযিল করে থাকেন। আমরা এর যোগ্য হই বা না হই, আমরা এর কদর করি বা না করি সেদিকে তাঁর নজর নেই। এর মাধ্যমে যাতে আমরা নিজেদের জীবনকে অধিকতর পরিশুদ্ধ করে নিতে পারি, নিজেদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে অধিকতর কলুষমুক্ত করতে সক্ষম হই এবং পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী আল্লাহর যথার্থ প্রতিনিধিদের শান্তিপূর্ণ আবাসে পরিণত করতে পারি, সেটিই তাঁর লক্ষ। لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ –যাতে তোমরা মুত্তাকী হও। যাতে আমরা আমাদের রবের সবরকমের নাফরমানি পরিহার করে তাঁর অনুগত হতে পারি পুরোপুরি। এটিই হচ্ছে রমযানের মৌল তাৎপর্য।

ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর হুকুম প্রতিপালনের নাম। নামায একটি ইবাদত। অর্থাৎ নামাযের মধ্য দিয়ে আল্লাহর হুকুম প্রতিপালনই ইবাদত। যদি নিছক নামায একটি ইবাদত হতো তাহলে যে কোন সময় নামায পড়া যেতো এবং তাতে নেকী অর্জিত হতো। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তা ঠিক নয়। সূর্য উদয়ের সময় বা সূর্য অস্ত যাবার সময় নামায পড়লে বরং গুনাহগার হতে হয়, যেহেতু আল্লাহ এ সময় নামায পড়তে মানা করেছেন। নামাযের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত করা এবং তাসবীহ ও দোয়া দরূদ পড়া যদি ইবাদত হয়ে থাকতো তাহলে নামাযের নিয়েত করে দাঁড়িয়ে বা বসে এ কাজগুলো করে নিলেই ইবাদত হয়ে যেতো। কিন্তু তা হয়নি। বরং নামাযের মধ্যে বিশেষ ভংগীতে কিয়াম, রুকু, সিজদা ও কা'আদা করতে হবে এবং তার মধ্যে নির্ধারিত ভংগীমায় নির্ধারিত তেলাওয়াত করতে ও দোয়া দরূদ পড়তে হবে। এর মধ্যে কোন ভুল হয়ে গেলে আবার তার সংশোধনের বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। আসলে এর সবটুকুই শুধুমাত্র আল্লাহর হুকুমের হুবহু অনুসৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

রোযাও ঠিক আল্লাহর এমনি একটি ইবাদত। যে জিনিসগুলো আমাদের জন্য হালাল সেগুলো না খাওয়া, যে কাজটি করা জায়েয সেটি না করা–এটা আসলে আল্লাহর হুকুম পালন করা মাত্র। স্বাস্থ্যগত কারণে যদি আমরা কখনো

এগুলো না খাই বা এ কাজটা না করি তাহলে তার লক্ষ আল্লাহর হুকুম পালন করা নয় বরং শরীরের তাগিদ পূরণ করা মাত্র। কাজেই তখন সেটা আল্লাহর ইবাদত হবে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর হুকুম পালনের অন্য নাম। বান্দা যখন নিজেকে সজ্ঞানে আল্লাহর বান্দা বলে ঘোষণা করে তখন তাকে তার এই ঘোষণার যোগ্য করে নেবার এবং এই ঘোষণার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার ব্যবস্থা আল্লাহ নিজেই করে দেন। আর আল্লাহর এ ব্যবস্থাটাই হচ্ছে ইবাদত। রমযানের রোযা এমনি ধরনের একটি ইবাদত। তবে এই ইবাদতটির একটি বৈশিষ্ট হচ্ছে, এর সাহায্যে মহান আল্লাহ মানুষের আসল মানবিক ও আত্মিক সত্তাকে শক্তিশালী এবং তার পাশবিক ও জৈবিক সত্তাকে দুর্বল করে দেন। মানুষকে যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে সফল করে তোলার জন্য তার জৈবিক ও আত্মিক উভয় সত্তার যথার্থ অবস্থান ও ভূমিকা পালনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তবে জৈবিক সত্তার ভূমিকা যদি প্রবল হয়ে ওঠে তাহলে পৃথিবীতে মানুষ তার যথার্থ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে না। আর পৃথিবীতে জীবন যাপনের জন্য মানুষ যে পদ্ধতি অবলম্বন করে তার ফলে তার জৈবিক সত্তা প্রবল হয়ে ওঠে। শরীরকে টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষকে পানাহার করতে হয়। বেশ পানাহার করতে হয়। পেটের ক্ষুধার পরে আসে যৌন ক্ষুধা। এই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তাকে লাভ করতে হয় নারী সংগ। এভাবে দুনিয়ার সম্পদ ও ভোগ লিপ্সার মধ্যে সে জড়িয়ে পড়ে। ফলে তার জৈবিক ও পাশবিক সত্তা প্রবলতর হয়ে উঠতে থাকে। এতে দুনিয়ায় তার আল্লাহর যথার্থ প্রনিধিত্বের ভূমিকা পালনের বিষয়টি কঠিন এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে। মানুষকে তার যথার্থ ভূমিকা পালন করতে হলে তার জৈবিক সত্তাটিকে থাকতে হবে আত্মিক সত্তার নিয়ন্ত্রণাধীন। দীর্ঘ এক মাসের রোযা আত্মিক সত্তাকে এ নিয়ন্ত্রণ শক্তি দান করতে সক্ষম হয়।

জৈবিক সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আবার তাকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনও করতে হবে। এ জন্য এক নাগাড়ে তিরিশ দিন ও রাত রোযা ফরয করা হয়নি। বরং দিনের বেলা রোযা ও রাতের বেলা ইফতার অর্থাৎ রোযা ভেঙে সব রকমের খাওয়া দাওয়া ও কাজ করা। আবার এ রোযার ব্যবস্থা করা হয়েছে পরপর তিরিশ দিন। একদিন বাদ দিয়ে বা কয়েকদিন বাদ দিয়ে রোযা রাখার বিধান দেয়া হয়নি। কারণ একদিন বা দু'দিন যত দীর্ঘ রোযা রাখা হোক না কেন তাতে জৈবিক সত্তার তেমন কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না বা তার আগ্রাসী শক্তিকে দমন করা সম্ভব হয় না। বরং পরপর তিরিশ দিন রোযা

রাখার ফলে তা আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ে এবং আত্মিক শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে এসে যায়। আর পরপর তিরিশ দিনে আত্মিক সত্তা যে বিপুল শক্তি অর্জন করে তার ফলে তার প্রাধান্যকে সে পরবর্তী এগার মাস টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

এ ছাড়া সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য একটি মাস নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যার যার সুবিধেমতো বা নিজের দেশের ও এলাকার আবহাওয়া অনুযায়ী রোযা রাখার মাস বা সময় নির্দিষ্ট করে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়নি। এর কারণ সবার চোখের সামনে না থাকার কারণে অনেকেই এ ফরযটি থেকে নিস্কৃতি লাভের চেষ্টা করতো এবং ইসলামের এত বড় একটি ইবাদত অখ্যাত ও অজ্ঞাত হয়ে থাকতো। তাছাড়া সারা বিশ্বের মুসলমানদের এক সাথে মিলে একটা কাজ করা খুব বিরাট ব্যাপার। এতে যেমন চতুরদিকে তাদের আত্মিক কার্যক্রমের দবদবা প্রতিষ্ঠিত হয় তেমনি তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিকে নজর রাখার কারণেই এ ইবাদতটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিজেদের মধ্যে বাইরে থেকে উৎসাহ উদ্দীপনাও লাভ করে। আর তাছাড়া ইবাদতের ক্ষেত্রে ইসলামী জনতার একত্রে বিপুল সমাবেশের কারণে তাদের সবার ওপর আসমানী ও ইলাহী শক্তির বরকত ও রহমত নাযিল হতে থাকে। আর একটি নির্দিষ্ট মাসের প্রয়োজন যখন দেখা দিয়েছে তখন যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে, যে মাসে লাইলাতুল কদর পাওয়া যায় এবং যে মাসে শরীয়তে মুহাম্মদী পূর্ণাংগ রূপ লাভ করেছে তার চেয়ে ভালো ও বেশী বরকতের মাস আর কোন্‌টি হতে পারে?

তাই মহান আল্লাহ রমযান মাসের রোযা সমস্ত বিশ্বের মুসলমানদের জন্য ফরয করেছেন। রমযানে সারাদিন রোযা রেখে ও রাতের অধিকাংশ সময় ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করে এবং নিজের শরীরের সমস্ত অংগ-প্রত্যংগ ও ইন্দ্রিয় শক্তিকে যাবতীয় খারাপ, গর্হিত ও বাজে কাজ থেকে বিরত রেখে সে বিপুল আত্মিক শক্তির অধিকারী হয়, যা তাকে দুনিয়ায় আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার পরিপূর্ণ যোগ্যতা ও শক্তির অধিকারী করে।

২৮
সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্য

মিল্লাতে ইসলামিয়ার একটি প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে তার প্রশিক্ষণের বিশেষ পদ্ধতি। এই মিল্লাতের গঠন আকৃতির মধ্যেই তার প্রশিক্ষণের উপাদানগুলো স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ইসলামী মিল্লাত যেহেতু কোন ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, কোন ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি, জ্ঞান, মানবিক যোগ্যতা ব্যবহার করে এই মিল্লাতের কাঠামো তৈরী করেনি, কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছেমতো এই মিল্লাতের দেহ সৌষ্ঠবে কোন প্রকার পরিবর্তন আনারও ক্ষমতা বা অধিকার রাখে না, তাই এর প্রশিক্ষণের জন্য কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করার ক্ষমতাও কারোর নেই।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন নিজেই এই মিল্লাত গঠনের উপাদানগুলো সরবরাহ করেছেন এবং এর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও তিনি নিজেই করেছেন। তাই মিল্লাতে ইসলামিয়ার প্রশিক্ষণ স্বাভাবিক নিয়মে এগিয়ে চলে। এর প্রশিক্ষণের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সবচাইতে ব্যাপক প্রভাবের অধিকারী যে পদ্ধতিটির প্রচলন তিনি করেছেন সেটি হচ্ছে সওমে রমযান। মাহে রমযানের তিরিশ দিনের রোযা। বছরে তিন'শো পঁয়ষট্টি দিন। এগারো বারো দিন পরপর একটি করে রোযা রাখার ব্যবস্থা করা হলেও সারা বছরে তিরিশটি রোযা রাখা যেতো। কিন্তু আল্লাহ সে ব্যবস্থা দেননি। বরং তিনি বছরের এক সময় একই সংগে তিরিশটি রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এক সংগে এই তিরিশটি রোযা রাখার ওপর এতো বেশী কড়াকড়ি করেছেন যে, এর মধ্যে একটি রোযা যদি কেউ স্বেচ্ছাকৃতভাবে ভেঙে ফেলে তাহলে তার খেসারত স্বরূপ তাকে মাত্র একটি রোযা নয় বরং পরপর ষাটটি রোযা রাখতে হবে। এ থেকে পরপর তিরিশটি রোযা রাখার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

পরপর তিরিশটি দিন শরীরের দুটো জৈব চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত থাকা, দিনের আলোর আভাস যখন থেকে পাওয়া যায় তখন থেকে নিয়ে দিনের আলো নিভে যাওয়া পর্যন্ত এই দুটো চাহিদাকে দমন করে রাখা–এরি নাম রোযা। এদুটো চাহিদা হচ্ছে, পানাহার ও স্ত্রী সংগ। এদুটো চাহিদার নামই জীবন। জীব জগতে এ চাহিদার পূর্ণ আধিপত্য। খাওয়া–দাওয়া ও বংশ বৃদ্ধিই হচ্ছে জীবনের লক্ষণ। এ দুটো ছাড়া জীবন নিস্তেজ, পংগু ও ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখোমুখি।

মিল্লাতে ইসলামিয়ার সদস্য অবশ্য এ দুটো চাহিদা পূরণে নফসের দাসত্ব করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে তাকে আল্লাহর পূর্ণ দাসত্ব ও আনুগত্য করতে হবে। বারো মাসের মধ্যে পুরো একটা মাস আল্লাহর হুকুম মোতাবিক সে এই চাহিদা দুটো পূরণের সময়কাল সংকুচিত করবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাভাবিক সময়ে সে যে আল্লাহর হুকুম মোতাবিক এই চাহিদা দুটো পূরণ করে বলে দাবী জানিয়ে থাকে তা কতদূর সত্য? সত্যিই যদি সে আল্লাহর হুকুম মোতাবিক এ চাহিদা দুটো পূরণ করে থাকে তাহলে এখন আল্লাহর হুকুমে সে কিছু সময়ের জন্য এ চাহিদা পূরণে বিরত থাকতে প্রস্তুত কি না? এটারই পরীক্ষা চলে তার রমযানে সারাটা মাস। পরীক্ষার সাথে সাথে ফলাফলের ভিত্তিতে তার উন্নতি অবনতির স্থান নির্দেশিত হতে থাকে। মিল্লাতে ইসলামিয়ার সদস্যরা আল্লাহর আনুগত্যে যত বেশী আন্তরিক ও পূর্ণতা লাভ করতে থাকে ইসলামী মিল্লাত তত বেশী শক্তিশালী হতে থাকে।

আর মিল্লাতে ইসলামিয়ার সদস্যকে শুধু ভুখা ও পিপাসার্ত রাখা রমযানের রোযার উদ্দেশ্য নয়। তার দুটি জৈব চাহিদা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তার সমগ্র কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত করাই তার উদ্দেশ্য। তিরিশ দিনের সিয়াম সাধনা ইসলামী মিল্লাতের প্রত্যেকটি সদস্যকে মিথ্যাকথা বলা, প্রতারণা করা, ঝগড়া ফাসাদ করা, বেহুদা চিন্তা-ভাবনা করা, মোট কথা যা কিছু মুনকার তথা অসৎ ও অন্যায় বলে পরিচিত তার সব কিছু থেকে দূরে রাখবে। অন্যায় থেকে সে দূরে থাকবে এবং ন্যায়ের দিকে এগিয়ে আসবে। ইসলামী মিল্লাতের সদস্যের মধ্যে এই শক্তিটি বিকাশ লাভ করতে থাকবে এবং এক মাসের মধ্যে এটি এমন একটি পাকাপোক্ত রূপ নেবে যা মিল্লাতের ভেতরের আবর্জনা দূর করে তাকে উজ্জ্বল, ত্রুটিমুক্ত নিখাদ স্বর্ণে পরিণত করবে। আর রোযা রাখার পরও মিল্লাতের যে সদস্যটি নিজের মধ্যকার এ আবর্জনা দূর করতে ব্যর্থ হয় আসলে তার রোযা অর্থহীন নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। তার রোযা রাখা ও না রাখা সমান। হাদীসে এ কথাটিকে এই মর্মে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এমন অনেক রোযাদার আছে যারা তাদের রোযা থেকে শুধু মাত্র ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া আর কিছুই পায় না এবং এমন অনেক রমযানের রাতের ইবাদতকারী আছে যারা তাদের রাত জেগে ইবাদত করা থেকে কেবলমাত্র নিশি জাগরণ ও নিদ্রাহীনতা ছাড়া আর কিছুই পায় না। ইমাম বুখারী হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর আর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও তার ওপর

আমল করা পরিহার করেনি তার পানাহার ত্যাগ করার কোন প্রয়োজন আল্লাহর কাছে নেই।

মূলত শরীরের দুটি জৈব চাহিদা দমন করাই তিরিশ দিনের রোযার উদ্দেশ্য নয় বরং এই সংগে দেহের ও মনের সমস্ত শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর হুকুমের অনুগত রাখাই এর লক্ষ। এই উদ্দেশ্য ও লক্ষকে কুরআনে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (البقره : ١٨٣)

"তোমাদের আগের লোকদের মতো তোমাদের ওপরও রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এর মাধ্যমে যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।"

জিনিসের দামের কারণে তা সম্পদে পরিণত হয়। আবার দামটা একটু বেশী হলে তাকে মূল্যবান সম্পদ বলা হয়। অনেক বেশী দাম হলে মহামূল্যবান এবং এক পর্যায়ে অমূল্য সম্পদও বলা হয়, যখন তার মূল্য দেয়াটা মানুষের ক্ষমতা ও সাধ্যের বাইরে চলে যায়।

আবার এই সম্পদ দুই ধরনের হয়। এক ধরনের সম্পদ মানুষের ইন্দ্রিয় ও অনুভূতিগ্রাহ্য হয়। দুনিয়ার বস্তু বা পদার্থের সাহায্যে তার একটা অনুভূতিগ্রাহ্য বিনিময় ও মূল্য নির্ণয় করা হয়। তাকে স্থানান্তর করাও যায়। কিন্তু আর এক ধরনের সম্পদ হয়, মানুষের ইন্দ্রিয় অনুভূতির আওতার বাইরে তার অবস্থান। তার কোন অনুভূতিগ্রাহ্য মূল্য নিরূপণ করা কোন কালেই সম্ভবপর হয় না। তা যথার্থই অমূল্য। এমনি ধরনের একটি অমূল্য সম্পদ হচ্ছে রমযানের রোযা। এমনিতে রোযা আল্লাহর একটি বিরাট নিয়ামত। আবার রমযান মাসের কারণে তার মূল্য শত ও হাজার গুণ বেড়ে গেছে।

রমযান মাসের মাহাত্ম ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে এই যে, এই মাসে কুরআন নাযিল হয়। কুরআন মানব জাতির জন্য পৃথিবীতে জীবন যাপনের একমাত্র সত্য ও নির্ভুল পথ নির্দেশক। মহান আল্লাহর ভাষায় ঃ

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ – (البقر : ١٨٥)

"মানুষের জন্য এমন একটি পথ চলার বিধান যা সত্য, সরল, সোজা পথটি তুলে ধরে এবং হক ও বাতিল, ন্যায় ও অন্যায়, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয়।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সত্য পথ কোন্‌টি? সহজ ও সরল পথটিই সত্য পথ। এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে পৌছতে হলে কটি সরল রেখার সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে? স্বাভাবিকভাবে বলা যায়, সরল রেখা এখানে একটিই হতে পারে, বাকি প্রত্যেকটি রেখাই বক্র হতে বাধ্য। তেমনি সত্য সরল পথ একটি হতে পারে, বাকি সমস্ত পথই হবে বক্র। কাজেই কুরআন তার হেদায়াতের মাধ্যমে যে পথটি তুলে ধরেছে সেটিই একমাত্র সত্য পথ। এ ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন সত্য পথ হতেই পারে না। কুরআন ছাড়া অন্যান্য

ধর্মগ্রন্থগুলো যে পথের সন্ধান দিচ্ছে তার মধ্যে আজ আর সত্য পথের সন্ধান পাওয়া যাবে না। তারা প্রত্যেকেই এক একটি বক্র পথ তুলে ধরছে। আর যদি তাদের পথগুলোকে সত্য পথ বলা হয় তাহলে এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে পৌঁছবার জন্য একাধিক সরল রেখা মানতে হবে। আর এটা সম্ভব নয়। কাজেই সত্য পথ একটিই হতে পারে এবং তা হচ্ছে কুরআন নির্দেশিত পথ।

এখানে আর একটি সম্ভাবনা থাকে। সেটি হচ্ছে, বক্র পথে লক্ষে পৌছানো সম্ভব কিনা? এর জবাবে বলা যায়, সরল পথে লক্ষে পৌছুনো যতটা সুনিশ্চিত বক্র পথে লক্ষে পৌছুনো ঠিক ততটাই অনিশ্চিত। কারণ সরল পথের তো লক্ষ স্থির আছে কিন্তু বক্র পথের কোন লক্ষ নেই। কাজেই বক্র পথ যে কোন্ জাহান্নাম ও নরকের দিকে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। বক্র পথ তো কখনো সরল পথের লক্ষ বিন্দুর দিকে যাবে না। যদি ভুলক্রমে কখনো গিয়ে পড়ে তাহলে তখন তাকে সরল পথটিই অবলম্বন করতে হয় এবং বক্র পথ ছেড়ে দিতে হয়। কাজেই এ কথা আজ সর্ববাদীসম্মত সত্য যে, কুরআন নির্ধারিত ও নির্দেশিত পথই পৃথিবীতে মানুষের চলার জন্য একমাত্র সত্য ও সরল পথ।

আজ থেকে চৌদ্দ'শো বছর আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে যখন কুরআনের বিধান উপস্থাপন করেন, দুটি বড় বড় সভ্যতা এ বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু সর্বত্র জুলুম ও শোষণ ছাড়া ইনসাফ ও ন্যায়ের কোন চিহ্নই ছিল না। দুর্বলের ওপর প্রবলের রাজত্ব ছিল। প্রবল ছিল জালেম, দুর্বল মজলুম। প্রবল শোষক, দুর্বল শোষিত। এই পরিবেশে কুরআনের হেদায়াত মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিশ্ব সভ্যতার মোড় ফিরিয়ে দিল। বিশ্বের একটি বিশাল ভূখণ্ডের মানুষ দেখলো, মানুষের ওপর মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সকল মানুষ ভাই ভাই এবং সবার অধিকার সমান। অনারবের ওপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কালোর ওপর সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সবাই সমান মর্যাদার অধিকারী। কুরআনী সভ্যতার প্রতিপত্তি কয়েক'শো বছর পর্যন্ত বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ততদিন মানুষ ন্যায়, ইনসাফ, শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্বের অনাবিল নিয়ামত লাভ করেছিল। তারপর কুরআনী হেদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে গত কয়েক'শো বছর থেকে যে সভ্যতা বিশ্বব্যাপী প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে, তা আজ পৃথিবীর বুকে মানুষের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। মানুষের সভ্যতাই আজ মানুষের যাবতীয় অশান্তি, যন্ত্রণা ও ধ্বংসের কারণ। বিশ্ব মানবতা আজ তার বিপন্ন সত্তাকে রক্ষা করার জন্য কোন নতুন সভ্যতার

আশ্রয় খুঁজে ফিরছে। একমাত্র কুরআনী সভ্যতা ছাড়া আর কোথাও সেই নিরাপদ আশ্রয় নেই। মুসলমানরা যদি এই কুরআনী সভ্যতার দিকে পুরোপুরি ফিরে আসতে পারে তাহলে বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও নিরাপদ আশ্রয় লাভ সম্ভব।

এদিক দিয়ে বিচার করলে কুরআন বিশ্ব মানবতার জন্য একটি অনন্য সম্পদ। কিয়ামত পর্যন্ত এ সম্পদ অক্ষুণ্ন থাকবে। মানুষ এ থেকে যতটুকু আহরণ করতে পারবে ততটুকু লাভবান হবে।

এই অনন্য সম্পদ লাভ করার কারণে সম্পদের মালিক মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একটি মানবিক দায়িত্বে পরিণত হয়। কিভাবে মানুষ এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে? এর পদ্ধতি আল্লাহ নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ জন্য তিনি রমযানের রোযা ফরয করেছেন। রমযানের রোযা একদিকে যেমন আত্মার পরিশুদ্ধি, আল্লাহর বিধান মেনে চলার প্রবণতা এবং তাকওয়া সৃষ্টি করার সর্বোত্তম পদ্ধতি, তেমনি এটি আল্লাহর নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করারও সর্বোত্তম পন্থা। মহান আল্লাহ কুরআন রূপ নিয়ামত যে উদ্দেশ্যে আমাদের দান করেছেন সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য যদি আমরা নিজেদেরকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করতে সচেষ্ট হই তবে সেটিই হবে এই নিয়ামতটির প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। কুরআন আল্লাহ আমাদের এ জন্য দান করেছেন যে, এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ জেনে সে পথে নিজেরা চলবো এবং বিশ্ববাসীকেও চলাবার চেষ্টা করবো।

কাজেই রমযান মাসে রোযা রাখা শুধুমাত্র ইবাদত ও চারিত্রিক অনুশীলন নয় বরং একই সংগে এটি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামতের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও একটি উপায়। তাই সূরা বাকারার ১৮৫ আয়াতের শেষাংশে রোযার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ "—যাতে আল্লাহ তোমাদের হেদায়াত দান করার কারণে তোমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।"

আগমনকারী এসে যায়। যে জানে সে অভ্যর্থনা জানায়। তার কদর করে। যে জানেনা সে বুঝতেও পারে না কতবড় নিয়ামত থেকে সে বঞ্চিত হলো। কত বড় মর্যাদা সে লাভ করতে পারতো কিন্তু শুধুমাত্র না জানার কারণে এই মহান মর্যাদা তার ভাগ্যে জুটলো না। এভাবে অজ্ঞতা সরাসরি হয়ে দাঁড়ায় আমাদের উন্নতি অগ্রগতির প্রতিবন্ধক।

পার্থিব ও জৈবিক উন্নতি অগ্রগতির কথা বলছি না। আত্মিক উন্নতির দিকেই এখানে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনতে চাই। পার্থিব উন্নতির পথ আমাদের আয়াস সাধ্য, আমাদের বুদ্ধি ও নাগালের মধ্যে তার অবস্থান। কিন্তু আত্মিক উন্নতি শত চেষ্টা ও পরিশ্রমেও সম্ভব নয় যদি না তার জন্য আমরা এমন কোন পথ নির্দেশ পাই যা সত্যিকারভাবে আত্মার প্রভু ও মালিকের দরবার থেকে জারি করা হয়েছে। এই আত্মার প্রভু আত্মার উন্নতি অগ্রগতির জন্য রমযান মাসে একটি বিধান পাঠিয়েছেন। সেটিই আমাদের আলোচ্য।

রমযান মাসের ওপর তিনি নিজেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ (البقره : ١٨٥)

"রমযান এমন একটি মাস যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে আর এই কুরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্য পরিপূর্ণ হেদায়াত এবং এতে এমন সব সুস্পষ্ট শিক্ষা রয়েছে যা সোজা সঠিক পথ দেখায় এবং হক–বাতিলের পার্থক্য পরিস্কার করে সামনে রেখে দেয়।"

কুরআনের জন্যই রমযানকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কুরআনের মধ্যে এমন কি বিষয় আছে যার জন্য রমযান এতো বেশী গুরুত্ব লাভ করলো? কুরআনের প্রধান বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে, এটি একটি পরিপূর্ণ হেদায়াত। আর হেদায়াতের বর্ণনায় বলা হয়েছে, এমন সব সুস্পষ্ট শিক্ষা যা সোজা সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য পরিস্কার করে তুলে ধরে। হক ও বাতিলের পার্থক্য যখন সুস্পষ্ট হয়ে যায় তখনই সোজা সঠিক পথটি চোখে পড়ে। মানুষ একাই শুধু নিজের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর নির্ভর করে সারা জীবন ধরে

যদি অনুসন্ধান চালায় তাহলেও কি সে কোনদিন হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে সরল সোজা পথটি বের করে নিতে পারবে? মানুষের এ ক্ষমতা কেমন করে মেনে নেয়া যায়? মানুষ তো হাজার হাজার বছর থেকে দুনিয়ার বুকে বুদ্ধির কারবার করে আসছে। অন্তত একটি লাঠির ওপর ভর দিয়ে একজন পংগু মানুষ যেমন নিশ্চিন্তে দাঁড়াবার সাহস করে তেমনি কি বুদ্ধির ওপর একজন মানুষ নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারে? বুদ্ধি তো মানুষকে কোন একটি নির্দিষ্ট পথে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে না। বুদ্ধির জোরে মানুষ দুটো পথের মধ্য থেকে একটি বাছাই করে নিতে পারে। কিন্তু তার বাছাই করা পথটি যে যথার্থই ঠিক এবং ভালো তা সে জোর গলায় বলতে পারে না। এ ধরনের কথা বলার মতো কোন ক্ষমতাই তার নেই। কারণ সে জানে, আজ সে যেটাকে ঠিক বলছে আগামীকাল সেটাই হয়তো তার কাছে বেঠিক মনে হবে। আজ সে যেটাকে ভালো বলছে সময়ের পরিবর্তনে আবার এক দিন সেটাই তার কাছে মন্দ প্রতীয়মান হবে।

দুনিয়ায় কত বড় বড় জ্ঞানী গুণীর জন্ম হয়েছে, কত বড় বড় চিন্তার ফসল মানুষের দরবারে পৌঁছেছে। কিন্তু হক ও বাতিলের চূড়ান্ত পার্থক্য করার নোস্‌খা কেউ দিতে পারেন নি। কাজেই বুদ্ধি ও বুদ্ধিমানদের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে মানুষ কেবল অন্ধকারে হাতড়ে মরেছে। সেখানে আলোর দ্বীপ হয়ে ফুঁড়ে উঠেছে আল–কুরআন।

আল–কুরআনই সত্যকে সত্য বলে চিহ্নিত করেছে এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলে চিহ্নিত করেছে। সত্য ও মিথ্যার চেহারার ওপর থেকে সব রকমের অস্পষ্টতার পোশাক সরিয়ে ফেলেছে।

কুরআন মানুষের বুদ্ধি–বিবেকের ওপর খবরদারী করেছে। কুরআন যখন যথার্থ সত্যের চেহারা তুলে ধরেছে তখনই মানুষের বুদ্ধি ও বিবেক তাকে সত্য বলে চিনতে পেরেছে। কুরআন যখন মিথ্যার চেহারা উলংগ করে দিয়েছে। তখনই মানুষের বুদ্ধি বিবেক সহজেই তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। যেমন কোন ব্যক্তি শুধু চোখ থাকলেই সবকিছু দেখতে পায় না। যে জিনিসটা দেখতে হবে সেটা আলোর মধ্যে থাকতে হবে। সেটা যদি অন্ধকারের মধ্যে থাকে তাহলে চোখে যতই আলো থাক না কেন অন্ধকারের মধ্যে থাকা সেই নির্দিষ্ট বস্তুটিকে চোখ কোনক্রমেই দেখতে পাবে না। ঠিক তেমনি একজন মানুষ যতই বুদ্ধিমান ও বিবেক সম্পন্ন হোক না কেন কুরআনের আলো ছাড়া দুনিয়ার সবকিছুই আঁধার। এই আঁধারে সে তার বুদ্ধি বিবেক দিয়ে কিছুই স্পষ্ট দেখতে পারে না। কুরআনের আলো বিচ্ছুরিত হলে তার আলোয় সে সব

কিছুই দেখতে পায়। কাজেই কুরআনের আলো বুদ্ধির আলোকে সাহায্য করে। তাই একে বলা হয়েছে : بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ অর্থাৎ হক বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দিয়ে যথার্থ সত্য সোজা পথটিকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে। বুদ্ধি তাই কুরআন ছাড়া অন্ধ।

এ প্রেক্ষিতে আমরা কুরআনের মর্যাদা নিরূপণ করতে পারি। সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য কুরআন আল্লাহর কত বড় একটি নিয়ামত তা এখন সহজেই অনুভব করা যায়। মহান আল্লাহ তাঁর এ মহান নিয়ামতটি পাঠিয়েছেন রমযান মাসেই। এ রমযান মাস প্রতি বছর আসে ও চলে যায় এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে একমাত্র সেই ব্যক্তি যে কুরআনের আলো পেয়েছে। কুরআনের আলোকে যে ব্যক্তি তার হৃদয়কে আলোকিত করতে পেরেছে তার বুদ্ধি বিবেক যথার্থ দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে। কাজেই রমযান মাসের গুরুত্ব একমাত্র তার পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

আমাদের জীবনে আবার রমযান মাসের আগমন ঘটেছে। এ মাসের বরকত থেকে লাভবান হবার জন্য বিশেষ করে কুরআন অধ্যয়ন, কুরআন চর্চা ও কুরআনের ওপর গবেষণা করার জন্য এ মাসটি নির্ধারিত করা উচিত। এ মাসে যত বেশী কুরআনকে হৃদয়ংগম করা যাবে, যত বেশী আমাদের জীবনকে কুরআনের সাথে খাপ খাওয়ানো যাবে ততই এ মাসের অফুরন্ত বরকতের অংশীদার হতে আমরা সক্ষম হবো।

৩১
সাওমে রমযানের বৈশিষ্ট

উম্মতে মুসলিমা এমন একটি দল যারা দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ও বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকলেও তাদের জীবনের লক্ষ এক ও অভিন্ন। সাইবেরিয়ার বিস্তীর্ণ বরফাচ্ছাদিত এলাকার কোন বসতি, আফ্রিকার ঘন অরণ্যের কোন লোকালয়, আমেরিকা ও ইউরোপের সুসভ্য নগরী অথবা এশিয়ার কোন প্রাচীন জনপদ, যেখানেই মুসলমানদের আবাস হোক না কেন সর্বত্রই তাদের জীবনধারা একটি মাত্র লক্ষাভিসারী। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জীবন যাপন করা এবং দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহর হুকুম প্রতিষ্ঠিত করা, এছাড়া তাদের জীবনের আর দ্বিতীয় কোন লক্ষ নেই।

আসলে 'মুসলিম' শব্দটির মধ্যেই এর সম্পূর্ণ অর্থ নিহিত রয়েছে। মুসলিম মানেই হচ্ছে আত্মসমর্পণকারী। অর্থাৎ যে আল্লাহ ও তাঁর হুকুমের কাছে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করে দিয়েছে। আল্লাহর হুকুম মেনে চলাই তার জীবনের লক্ষ। যে যে দেশে যে পর্যায়ে যে পরিবেশে আছে সে সেখানে সেই অবস্থায় আল্লাহর হুকুম মেনে চলবে ও তাকে স্বদেশে ও স্ব এলাকায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবে।

আল্লাহর হুকুম মেনে চলার ও তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশেষ ধরনের মানসিক দৃঢ়তা এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও গুণাবলীর প্রয়োজন। ইসলামের সমগ্র বিধানই এই চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টির একটি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা এমনভাবে সাজানো যে, একজন মুসলমান এর আওতায় আসার সাথে সাথেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার মধ্যে এ গুণগুলো সৃষ্টি হয়ে যেতে থাকে। সাওমে রমযান এ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ। কেবলমাত্র সাওমে রমযানই একজন মুসলমানের মধ্যে যে চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টি করে তা যেমনি চমকপ্রদ তেমনি বিস্ময়কর। রমযানের একমাস রোযা রাখার আগে একজন মুসলমানের যে অবস্থা ছিল একমাস পরে তার সে অবস্থা থাকে না। তার মধ্যে যে বিশেষ পরিবর্তনগুলো আসে সেগুলো হচ্ছে ঃ

এক ঃ সে নিজেকে আল্লাহর একজন একনিষ্ঠ বান্দা হিসেবে গণ্য করতে থাকে।

দুই ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ছাড়া তার জীবনের দ্বিতীয় কোন লক্ষ থাকে না।

তিন ঃ যে কোন অবস্থায় যে কোন সময় আল্লাহর যে কোন. হুকুম মেনে চলার জন্য সে নিজেকে সম্পূর্ণ ফিট্ মনে করতে থাকে।

চার ঃ আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান, সব কিছু দেখেন, জানেন ও শুনেন এ অনুভূতি তার মধ্যে বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের পর্যায়ে পৌছে যায়। ফলে আল্লাহর হুকুমের বিরোধী কোন কাজ করার ক্ষমতাই সে হারিয়ে ফেলে।

পাঁচ ঃ আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার আর সব কিছুর কর্তৃত্ব সে অস্বীকার করতে শেখে। সারাদিন সে না খেয়ে থাকে। তার সামনে ভালো ভালো খাবার আসে। পরিবেশের চাপ তাকে খেতে উৎসাহিত করে। শরীরের অভ্যন্তর থেকে রিপুর চাপ তাকে খাবার প্রেরণা যোগায়। এমনি আরো বিভিন্ন চাপ আসে। কিন্তু কারোর সামনে সে মাথা নত করে না। বরং পরিবেশ, রিপু ও বাইরের সমস্ত প্রভাব ও শক্তিকে সে আল্লাহর হুকুমের অনুগত করে। এভাবে আসলে রমযানের এক মাসের মধ্যে সে তার নিজের ও আশেপাশের সবকিছুর ওপর আল্লাহর হুকুমের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।

ছয় ঃ রোযা মুসলমানের মধ্যে যে সব চাইতে বড় গুণটির সৃষ্টি করে তা হচ্ছে ঃ এর মাধ্যমে বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে একটা একনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। বান্দা এক দিকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে আল্লাহর কর্তৃত্ব মেনে নেয়। তাঁর সব হুকুম মেনে চলতে থাকে। আর অন্যদিকে আল্লাহও বান্দার সমস্ত কাজ সুনজরে দেখতে ও পছন্দ করতে থাকেন। তাই সারাদিন অভুক্ত থাকার কারণে রোযাদারের মুখে যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় আল্লাহর কাছে তা মৃগনাভির চাইতেও খোশবুদার। তাই হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন ঃ

اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ

"রোযা আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান।"

রোযাদারের জন্য আল্লাহর এই মহত্তম ঘোষণা প্রমাণ করে রোযা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে একটি গভীর সম্পর্কের সৃষ্টি করেছে। নামাযকে 'মি'রাজুল মু'মিনীন' বলা হয়েছে। অর্থাৎ নামাযের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর সাথে মোলাকাত করে। তাঁর সাথে দেখা–সাক্ষাত–আলাপ–আলোচনা পর্যন্তই এটার সীমা সংরক্ষিত। কিন্তু এই দেখা সাক্ষাতের পরে যে হৃদ্যতা, বন্ধুত্ব, গভীর আত্মিক যোগাযোগ তা হয় রোযার মাধ্যমে। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এই গভীর সম্পর্ক ও যোগাযোগ রোযার বৈশিষ্ট। কুরআনে তাই রোযাকে 'তাকওয়া' সৃষ্টির মাধ্যম বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ তোমাদের পূর্বের অন্যান্য

জাতিদের মতো তোমাদের ওপরও রোযা ফরয করা হয়েছে এ উদ্দেশ্যে–لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ –যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে এবং নিজেদেরকে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত করতে পারো। তাকওয়া একটি সূক্ষ্ম গুণ যা বান্দার মধ্যে সৃষ্টি হয় আল্লাহর হুকুম একনিষ্ঠভাবে মেনে চলার মাধ্যমে। হুকুম মেনে চলার মধ্যে যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও উৎসর্গীত প্রাণ হবার জয্বা ফুটে ওঠে তা–ই আসলে তাকওয়ার উৎস। রোযা সামগ্রিকভাবে এই গুণগুলোর উৎস। এই গুণগুলো সৃষ্টি করার জন্যই রোযার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তাই রমযান মাসের রোযা শুধুমাত্র অভুক্ত থাকা নয়। শুধু পানাহার ও স্ত্রী সংগ থেকে বিরত থাকার নাম রোযা নয়। রোযা আত্মপরিশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মোন্নয়নের একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধিতিতে মুমিন বান্দা নিজেকে আল্লাহর নিকটতর করে। আল্লাহ সৃষ্ট সব কিছুর ওপর একমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে নিজেকে আল্লাহর একনিষ্ঠ অনুগত বান্দায় পরিণত করে মুমিন দুনিয়ায় ও আখেরাতে পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করে।

রমযান পরবর্তীকালে আমাদের দায়িত্ব

রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের মাস রমযান চলে গেল। রমযানের স্পর্শে কত হৃদয় ধনাঢ্য ও সম্পদশালী হয়ে উঠল। আবার কত হৃদয় রমযানের স্পর্শ বিমুখ হয়ে দারিদ্র ও অভাবের সাগরে ডুবে গেল। রমযানের মূল্য যারা দিতে পারেনি, রমযান যাদের মনের গহনে মর্যাদার আসন লাভ করতে পারেনি তাদের দুর্ভাগ্যের শেষ নেই। নিজেদের ক্ষতির পরিমাপের কোন অনুভূতিই তাদের নেই। ক্ষতির অনুভূতি থাকলে তারা এক মুহূর্তের জন্য নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে পারতো না।

আর যারা রমযানের অফুরন্ত সম্পদের অধিকারী হয়েছে তাদের সৌভাগ্যের শেষ নেই। রমযানের সম্পদ অফুরন্ত এই জন্য যে, মহান রব্বুল আলামীন নিজেই এ সম্পদের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি সম্পদের সন্ধান দিয়েছেন। কিন্তু সৌভাগ্যশালীরা সে সম্পদের পরিমাপ করতে পারেনি। কারণ মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন ঃ اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ অর্থাৎ রোযা আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দেব অথবা আমি নিজেই তার প্রতিদান। আল্লাহ নিজেই যে প্রতিদান দেবেন অনুগত মুমিন বান্দার পক্ষে সে প্রতিদানের পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তা যেমন অফুরন্ত, সীমাহীন ও অমূল্য হবে তেমনি হবে তা মুমিন বান্দার জন্য অকল্পনীয় আনন্দ ও কল্যাণের বাহন। আবার আল্লাহ নিজেই যদি মুমিন বান্দার প্রতিদান হয়ে থাকেন তাহলে বান্দা যে কি পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হল তা তার পক্ষে কল্পনা করা সম্ভবপর নয়। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে হয়তো বিষয়টা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আনা যেতে পারে। গজনীর সুলতান মাহমুদ একবার তাঁর পারিষদদের কিছু দান করার কথা চিন্তা করলেন। তিনি বিভিন্ন সম্পদ এনে স্তূপাকার করলেন এবং ঘোষণা করে দিলেন, যে ব্যক্তি যে সম্পদটি স্পর্শ করবে সে হয়ে যাবে তার মালিক। দরবারের সবাই নিজেদের পছন্দ তো মূল্যবান সম্পদের মালিকানা লাভ করার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠলো। কিন্তু মাহমুদের প্রিয় গোলাম আয়ায কোন সম্পদের স্তূপের দিকে দৌড় না দিয়ে সোজা এসে বাদশাহর মাথায় হাত দিয়ে ঘোষণা করলেন, আজ থেকে বাদশাহ আমার। আয়ায যদি বাদশাহর অধিকারী হয় তাহলে আসলে সে হয়ে গেল বাদশাহর সমস্ত সম্পদের অধিকারী। আল্লাহ নিজেই রোযাদারের প্রতিদান হবার মধ্যে

এমনি ধরনের কিছু ধারণা করা যেতে পারে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে মুমিন বান্দা অন্তহীন সীমাহীন সম্পদের ও কল্যাণের অধিকারী হয়ে যাবে।

আল্লাহ তার মুমিন ও অনুগত বান্দাকে যে সম্পদের অধিকারী করলেন মুমিনের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তার অভিব্যক্তি হতে হবে। কারণ আল্লাহ এটাই পছন্দ করেন। তিনি তাঁর বান্দাকে যে নিয়ামত দান করেন বান্দার মধ্যে তার প্রকাশ তিনি চান। তিনি এক বান্দাকে বিপুল ধনৈশ্বর্য দান করলেন। কিন্তু সেই ধনাঢ্য বান্দা গরীবানা হালে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরে কখনো খেয়ে কখনো না খেয়ে জীবন যাপন করবে, এটা তিনি পছন্দ করেন না। হাঁ, তিনি পছন্দ করেন না–বান্দা নিজের ঐশ্বর্য গর্বে মাটিতে পা ফেলবে না, দামী দামী কাপড় চোপড় পরবে নিজের সম্পদের বড়াই করার ও গরীবদের মনে আঘাত দেবার জন্য। এটা আল্লাহর কাছে একেবারেই না পছন্দ। বরং এ ধরনের বান্দার প্রতি আল্লাহ রুষ্ট। এমন কি তার অহংকার তাকে বিদ্রোহীর পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এটা আল্লাহর সম্পদের প্রতি এক প্রকার নাশোকরী। কিন্তু আল্লাহর সম্পদের বিনিময়ে তাঁর প্রতি শোকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে বান্দাকে তার জীবনাচরণে এর প্রকাশ ঘটাতে হবে। অহংকার করার ও গরীবদের মনে কষ্ট দেবার জন্য নয়। বরং তার সম্পদে তো গরীব, বঞ্চিত ও প্রার্থীদের হক রয়ে গেছে। সে হক পুরোপুরি আদায় করছে। তারপর সে নিজের লেবাসে–পোশাকে আহারে–বিহারে এর ন্যূনতম প্রকাশ ঘটাচ্ছে। এটাই মুমিনের ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।

রমযানের রোযা যেসব মুমিন বান্দাকে বিপুল সম্পদের মালিক বানিয়ে গেল তাদের পরবর্তী জীবনে এ সম্পদের অভিব্যক্তি ঘটাতে হবে। এ সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ও কেন্দ্রীয় সম্পদটি হচ্ছে সংযম ও আত্মসংযম। আত্মসংযম এমন একটি বিষয় যা আল্লাহর অনুগত মুমিন বান্দাকে তার সমস্ত কাজে ভারসাম্য সৃষ্টিতে সাহায্য করবে এবং তাকে সবসময় সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত রাখবে। আর সংযমের গুণ তার মধ্যে সৃষ্টি হবার কারণে সে প্রত্যেকটি কাজে আল্লাহর আদেশ–নিষেধের পাবন্দি করবে। আসলে আল্লাহ নির্ধারিত হুদুদ ও সীমালংঘন করাই হচ্ছে সংযমহীনতা। সংযমের অধিকারী একজন অনুগত মুমিন বান্দা তার প্রতিটি পদক্ষেপ উঠাবে পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে। নিজের প্রতিটি কাজের জন্য আল্লাহর কাছে কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে–এ অনুভূতি নিয়েই সে জীবন পথে বিচরণ করবে। মুসলিম ও মানব সমাজের সে হবে একজন যথার্থ সদস্য।

রোযা মুমিনের মধ্যে তাকওয়ার গুণ সৃষ্টি করে। রোযা পরবর্তীকালে মুমিন বান্দার মধ্যে মহান আল্লাহ এর প্রকাশ পছন্দ করেন। তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর হুকুম বিধান পুরোপুরি মেনে চলা এবং যেসব কাজ তিনি নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে রাখা। একজন মুত্তাকী ব্যক্তি শুধু নিজেই আল্লাহর হুকুম মেনে চলবেনা এবং তাঁর নিষেধ থেকে দূরে সরে থাকবেনা বরং অন্যদেরও সে আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে ও তাঁর নিষেধ থেকে দূরে সরে থাকতে সাহায্য করবে। শুধু তাই নয়, আরো অগ্রসর হয়ে মুত্তাকীকে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার পথের বাধা দূর করার জন্য সংগ্রাম চালাতে হবে এবং তাঁর নিষেধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পাহাড় গড়ে তুলতে হবে। না হলে আসলে তার ব্যক্তিগত তাকওয়ার মধ্যে এতটুকু শক্তি নেই যা তাকে তার পথে অবিচল রাখতে পারে। পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা বিহীন বিচ্ছিন্ন তাকওয়া একদিন তাকে তার তাকওয়ার পথ থেকেও সরিয়ে দিতে পারে।

রোযার মাধ্যমে রোযাদার দয়া, স্নেহ, মায়া, মমতা, করুণা ইত্যাদি সম্পদের অধিকারী হয়। তার নিজের ব্যক্তি সত্তা, পরিবার, পাড়া–প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন, দেশীয় সমাজ ও মানব সমাজের প্রতি তার এই সম্পদের পর্যাপ্ত ব্যবহারই আল্লাহর অভিপ্রেত।

মোটকথা রোযার মাধ্যমে আল্লাহর অনুগত মুমিন বান্দা যে অফুরান সম্পদের অধিকারী হয় রমযান পরবর্তীকাল থেকে সমাজ ও পরিবেশে তার প্রভাব ফুটে ওঠা প্রয়োজন। প্রতিটি দায়িত্বশীল মুমিন বান্দার এ জন্য প্রতি মুহূর্তে সতর্ক পদক্ষেপ এবং প্রতি পদক্ষেপের পেছনে যথার্থ মুমিন সুলভ দায়িত্বশীল বিশ্লেষণী অনুভূতি ও তৎপরতার প্রয়োজন।

৩৩
বিশ্ব মানবতার একমাত্র নেতা

বিংশ শতকের পৃথিবী সমস্যায় জর্জরিত। মানবতার করুণ আর্তনাদে আকাশ বাতাস মুখরিত। পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে নিয়ে ও প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র ধূমায়িত বিক্ষোভ, অশান্তি। ক্ষুধা, অনাহার, জুলুম, নির্যাতন, অন্যায়, অবিচার, বিদ্বেষ, হিংসার নারকীয় বীভৎসতা মানুষের বহু মেহনতে গড়া এ আধুনিক বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলেছে। মতবাদের সংঘাত, স্বার্থের দ্বন্দ্ব সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ নিয়ে সৃষ্টির সেরা মানুষের রক্তে পৃথিবীর বুক রঞ্জিত করেছে। নিজের চিন্তাজালে মানুষ নিজেই আচ্ছন্ন। নিজের সৃষ্টির আঘাতে নিজেই ধরাশায়ী। শত শত বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিন্তা-গবেষণা, প্রচেষ্টা-সাধনা চরম ব্যর্থতার রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। চতুরদিকে সীমাহীন নৈরাজ্য, ব্যর্থতার হাহাকার।

একদিকে পাশ্চাত্যের চিন্তার প্রাসাদ ধ্বসে পড়েছে। পুঁজিবাদ অন্তহীন জুলুম ও শোষণের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। গণতন্ত্র মানুষের অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘর্ষে লিপ্ত করেছে। মানবতাকে এইসব সংকট মুক্ত করার দাবী নিয়ে সমাজতন্ত্র ময়দানে অবতীর্ণ হলেও এগুলোকে তীব্রতর ও বিভীষিকাময় রূপ দান করা ছাড়া কোন বৃহত্তর কল্যাণ সাধন তার দ্বারা সম্ভব হয়নি। সমাজতন্ত্র মানুষের ব্যক্তিগত ও মানবিক অধিকার হরণ করার সাথে সাথে তাকে সকল প্রকার আত্মিক অনুভূতিহীন নিছক একটি উদরসর্বস্ব জীবে পরিণত করেছে। অন্যদিকে সমগ্র বিশ্ব বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। স্বার্থের রশি টানাটানিতে এ শিবিরগুলোর দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো তাদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে পারছে না। পূর্ণাংগ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আজকের বিশ্বে সবচাইতে দুর্লভ বস্তুতে পরিণত হয়েছে। মৃত্যুসজ্জায় পুরাতন সাম্রাজ্যবাদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার দৃশ্য একদিকে শান্তনার বাণী বহন করে আনলেও অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের নবজন্ম এবং আগের চাইতেও অধিকতর তেজী পদক্ষেপ, জঘন্য কলাকৌশল, ব্যাপকতর জুলুম ও শোষণ আবার বিশ্বব্যাপী এক বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করেছে।

মানুষ কোন্‌দিকে যাবে? কিভাবে নিজের অস্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা রক্ষা করবে? বিশ্ব নেতৃত্বের দাবীদাররা মানবতাকে কোন কল্যাণময় পথের সন্ধান

দিতে পারছে না কেন? এ প্রশ্নগুলো আজ প্রাচ্য-প্রাতীচ্যের প্রতিটি সচেতন মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আমেরিকা গণতন্ত্র, মানবিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবীদার। কিন্তু ভিয়েতনামে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে হোলি খেলে সে কোন্ ব্যক্তি স্বাধীনতাটা উদ্ধার করেছে? দুনিয়ার যেখানে যত শোষিত জনতা আছে নিজেকে তাদের মুরব্বী বলে মনে করে। তাই হাংগেরী ও চেকোশ্লোভাকিয়ার নিরীহ জনগণের উপর দিয়ে ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ী চালিয়ে তাদের জন্মগত অধিকারসমূহের মাথা কুচলিয়ে দিতে দ্বিধা করে না। রুশ ও চীন নিজেদেরকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল বলে দাবী করলেও তারা নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এই তিন বিশ্ব নেতৃত্বের বড় বড় দাবীদার সারা দুনিয়াটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেবার জন্য নতুন নতুন শ্লোগান উদ্ভাবন করছে। নতুন নতুন পদ্ধতির অনুশীলন চালাচ্ছে। বৃটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীর ন্যায় মাঝারি সাম্রাজ্যবাদরাও এ ভাগ-বাঁটোয়ারায় নিজেদের প্রাপ্য লাভ করার ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেনি। মধ্যপ্রাচ্যের ইসরাইলে আর এক নতুন সাম্রাজ্যবাদ জন্ম নিচ্ছে। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পূর্ণ সমর্থনপুষ্ট এ নতুন সাম্রাজ্যবাদটি বিংশ শতাব্দীর এ অধিকার সচেতন যুগে দিন-দুপুরে অন্যদেশের হাজার হাজার বর্গমাইল এলাকা দখল করে একথা প্রমাণ করেছে যে, দুনিয়া যতই সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যাক না কেন এবং মানুষের চিন্তার মধ্যে শত বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হওয়া স্বত্বেও সাম্রাজ্যবাদের প্রাচীন রীতির মধ্যে কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ অব নেশানসের ব্যর্থতা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের ব্যর্থতার মধ্যে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না। মূলত পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া বিশ্বমানবতার স্বার্থ সংরক্ষণে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। জাতিসংঘকে তারা নিজেদের স্বার্থোদ্ধার ও তথাকথিত আদর্শিক সংঘাতের আখড়ায় পরিণত করেছে। মোট কথা, দুনিয়াটা বৃহৎ শক্তিবর্গের একটি শিকার ক্ষেত্র। এখানে যার অস্ত্র যত শাণিত এবং শিকারের কলাকৌশল যে যত বেশী আয়ত্ব করেছে, যার শিকারী কুকুরগুলো যত বেশী শিক্ষিত সে তত বেশী ক্ষুদ্র দেশগুলো শিকার করছে। আর জাতিসংঘের মাধ্যমে এই শিকারের ওপর নিজের মোহর লাগাবার কাজ সমাধা করা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করলে বিংশ শতাব্দীকে ক্ষুধা ও অর্থনৈতিক শোষণের যুগ বলা যায়। এর আগে বোধ হয় পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা সারা দুনিয়ায় এমন চরমভাবে ব্যর্থ হয়নি। এ অর্থব্যবস্থা মানবতার জন্য একটি

অভিশাপ। শ্রমের বিনিময়ে মানুষের দেহের সমস্ত রক্ত চুষে নেবার পর বিরাট আয়ের উচ্ছিষ্ট থেকে তাকে যে রশদটুকু সরবরাহ করা হয় তার সাহায্যে দেহ ও আত্মার সম্পর্কটুকু রক্ষা করাও তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। সারা দুনিয়ার মজুর আজ তার ন্যায্য প্রাপ্য হাসিল করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেও পুঁজিপতির অর্থবলের নিকট তাকে নতি স্বীকার করতে হচ্ছে। দুনিয়ার সবদেশে শোষিতের বিরাট শ্রেণী গড়ে উঠেছে। ক্ষুধা, অনাহার, বেকারত্ব বিশ্বমানবতার বিরাট অংশের নিত্য সহচরে পরিণত হয়েছে। বিংশ শতকের বিজ্ঞান পুঁজিপতির প্রাসাদ আলোকিত করলেও গরীবের কুটীরে আলো জ্বলেনি, সেখানকার অন্ধকারের ঘনত্ব আগের মতোই রয়ে গেছে।

অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হলেও কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ পালোয়ান শ্রান্ত–ক্লান্ত–ঘর্মাক্ত কলেবরে সটান পেছনদিকে দৌড়ুতে শুরু করেছে। এবং একেবারে তার স্নেহময়ী মাতা পুঁজিবাদের কোলে আশ্রয় নিয়ে তবে থেমেছে।

সামাজিক অনাচার, দুর্নীতি ও চারিত্রিক নৈরাজ্য সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে। আধুনিক সমাজরীতি পুরাতন সমাজের সদগুণাবলীর ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট রাখেনি। নতুন এমন রূপে এমন মহিমায় নিজেকে প্রকাশ করেছে যার ফলে মানুষ আজ নিজেকে নিছক একটি যৌনজীব একটি স্বার্থপর প্রাণী ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারছে না। নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন সব অবিবেচক ও একদেশদর্শী নীতি গৃহীত হয়েছে যার ফলে স্বামী–স্ত্রীর স্বাভাবিক প্রেম–প্রীতি, দায়িত্বানুভূতি ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিবর্তে নারী নিছক পুরুষের কামসহচরীতে পরিণত হয়েছে। সংসার জীবনের ভিত্ ধসে পড়ার ফলে মানবিক প্রেম–প্রীতির পরিবর্তে স্বার্থবাদিতা ও ভোগলিপ্সার বিজয় সূচিত হয়েছে। যে স্বাভাবিক প্রেম–প্রীতির আকর্ষণে মানুষের সমাজ স্বতস্ফূর্তভাবে অগ্রসর হচ্ছিল বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক সমাজে তাকে অস্বীকার করার কারণে মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্থায়ী 'ডাণ্ডার' বন্দোবস্ত করতে হয়েছে। এবং এ 'ডাণ্ডা' একটু শিথিল হবার সাথে সাথেই সমগ্র সামাজিক কাঠামো চুরমার হয়ে যাবে।*

এক কথায় পাশ্চাত্যের চিন্তা, সামাজিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক কাঠামো, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বিশ্ব মানবতাকে চরমভাবে প্রতারিত করেছে। মানুষের

---

* ১৯৬৯ সালের জুন মাসে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

মূল্যবান যাবতীয় সম্পদ লুট করে নিয়েছে। মানুষ আজ নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত, পথের ভিখারী। কিন্তু ভিক্ষা পাওয়ারও সম্ভাবনা কোথায়? পাশ্চাত্যের চিন্তা বন্ধাত্বে পৌঁছে গেছে।

বিশ্বমানবতার নেতৃত্ব যদি পাশ্চাত্যের হাত থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে স্থানান্তরিত হয় তাহলেই মানুষ আজ এ মহাসংকট থেকে উদ্ধার পেতে পারে। এ ছাড়া মানবতার নিষ্কৃতির দ্বিতীয় কোন পথ নেই। শুধু এ যুগেই বা কেন, মানবেতিহাসের প্রতি যুগে এই একটি মাত্র পথই মানবতাকে সংকটমুক্ত করেছে। আল্লাহর নবী ও রসূলরাই মানুষকে তার ভুলের জগত থেকে টেনে বের করে এনে প্রতি যুগে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। আজ থেকে সাড়ে তের'শো বছর আগের পৃথিবীর সমস্যার প্রকৃতিও আজকের থেকে মোটেই ভিন্নতর ছিল না। অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক নৈরাজ্য, রাজনৈতিক জুলুম, অত্যাচার, বেইনসাফী ছিল সেদিনের বিশ্বের সামগ্রিক রূপ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শোষণ, নৈরাজ্য ও বেইনসাফী খতম করে বিশ্বমানবতাকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করেন।

মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত যতগুলো বিধান কার্যকরী করা হয়েছে তন্মধ্যে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর (স) বিধানই একমাত্র বাস্তবানুগ ও স্বাভাবিক প্রমাণিত হয়েছে। সত্যিকার গণতন্ত্র বলতে যা বুঝায়, তা একদিনের জন্যও দুনিয়ার কোন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মার্কস ও এঙ্গেলস যে সমাজতন্ত্রের জয়গান গেয়ে গেছেন, রাশিয়ায়, চীনে বা পশ্চিম ইউরোপের সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর কোথাও তা মুহূর্তকালের জন্যও কায়েম হয়নি। কিন্তু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর (স) আদর্শই এ পৃথিবীতে একমাত্র ব্যতিক্রম। একমাত্র মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর (স) ইসলামী জীবন ব্যবস্থাই তার স্বরূপে ও স্বমহিমায় তাঁর জীবনে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কেবল তাঁর জীবনেই নয় তাঁর পর খেলাফতে রাশেদার আমলে তিরিশ বছরকালও তা পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এরপর প্রায় হাজার বছরকাল পর্যন্তও দুনিয়ার একটি বিরাট অংশে ইসলামের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক ও সমাজতন্ত্রী দেশগুলোয় আজ এ ব্যবস্থা দু'টির বিকৃত রূপই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এদের আসল রূপ বাস্তব বিরোধী ও মানব প্রকৃতি বিরোধী হবার কারণে দুনিয়ার কোথাও কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি, ভবিষ্যতেও হওয়া সম্ভব নয় এবং এ কারণেই এ ব্যবস্থা দুটির বিকৃত রূপ দুনিয়ার সর্বত্র অশান্তি, অরাজকতা, নির্যাতন ও বেইনসাফীর জন্ম দিয়েছে।

পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ মানুষকে মানুষের গোলামে পরিণত করেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তার গলদ এখানেই। বিপরীত পক্ষে মুহাম্মদ রাসূলুল্লহ (স) মানুষের ওপর থেকে মানুষের কর্তৃত্ব খতম করে একমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। আর এ পরোক্ষ কর্তৃত্বের মাধ্যমে যাতে মানুষের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব জেঁকে না বসতে পারে এ জন্য খেলাফত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধি মানুষের ওপর আল্লাহ প্রদত্ত (পার্লামেন্ট প্রদত্ত নয়) নির্ধারিত ও সীমিত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হবে এবং এ ব্যাপারেও তাকে আল্লাহর নিকট সরাসরি জবাবদিহি করতে হবে। খেলাফত ব্যক্তিকে সম্পদের সীমাহীন মালিকানা দান করে তাকে অবাধ অর্থনৈতিক লুণ্ঠন ও শোষণের সুযোগ দেয় না। আবার অন্যদিকে তার যাবতীয় অধিকার হরণ করে একমাত্র রাষ্ট্র তথা প্রশাসন যন্ত্রকে বিরাট শোষক ও জালেমে পরিণত করেনা। এই দুই প্রান্তিক মতাদর্শের বিপরীতপক্ষে রসূলুল্লাহ (স) ব্যক্তিকে সম্পদের সীমিত মালিকানা দান করেন এবং সম্পদের ওপর ব্যক্তির কর্তৃত্বের পরিবর্তে আল্লাহর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন এবং অন্যদিকে সম্পদের সুসম বন্টন করে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র যন্ত্রের শোষক ও জালেমে পরিণত হবার সকল পথ রুদ্ধ করেন। রসূলুল্লাহ (স) নিজের কাছে জনগণের কোন সম্পদ জমা থাকলে তা তার হকদারদের নিকট পৌঁছিয়ে না দেয়া পর্যন্ত রাত্রে ঘুমুতে পারতেন না। তাঁর খলীফারা ফোরাত নদীর কূলে কোন মেষশাবক অনাহারে মৃত্যুবরণ করলে সে জন্য নিজেদেরকে দায়ী মনে করতেন।

রসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করেন ঃ 'সাদার ওপর কালোর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কালোর ওপর সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আরবের ওপর আজমের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং আজমের ওপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।' এ ঘোষণাবাণী কেবল শূন্যে প্রতিধ্বনিত হয়েই বিলীন হয়ে যায়নি। দাসপুত্র কৃষ্ণকায় যায়েদের সেনাপতিত্বে আরবরা যুদ্ধ করেছে। পারস্যের সালমানকে নিজেদের গভর্ণর পদে বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু আধুনিক গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শ আমেরিকায় আজো কালোরা সাদাদের সমান মর্যাদা লাভ করতে পারেনি। কালোরা আজো ঘৃণিত। ইংল্যাণ্ডে বাড়ী ভাড়ার প্লেটে আজো লেখা থাকে Not for the blacks. রাশিয়ানরা আজো ককেশাস এলাকার কোন তাতারী কম্যুনিস্টকে নিজেদের নেতৃত্বে বরণ করে নেয়নি। একমাত্র রসূলুল্লাহর নেতৃত্বই বিশ্বকে পক্ষপাতহীন ও ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে অবলোকন করেছে। একমাত্র তাঁর নেতৃত্বই আধুনিক বিশ্বের মুক্তি ও সমৃদ্ধির ধারক।

কিন্তু এ নেতৃত্ব দু'চারটে ফাঁকা বুলির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে না। এ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। রবিউল আউয়াল মাসে রসূলুল্লাহর জীবনের উপর দু'চারটে আলোচনা ও কয়েকবার দরূদ শরীফ পড়ে মুসলমানরা এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে না। রসূলুল্লাহর আদর্শের প্রতি তাদের ঈমানকে নিসংশয় করতে হবে, অতপর নিজেদের জীবনে তাঁর আদর্শের বাস্তবায়ন করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বাস্তব প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।

৩৪
সমস্যা সংখুব্ধ বিশ্বের যিনি অধিনায়ক

তিনি নিছক কোন অর্থনৈতিক সমাধান নিয়ে আসেননি ম্যালথুস বা মার্কসের মতো। জীবনকে তিনি কেবল একটি অর্থনৈতিক একক হিসেবে দেখেননি। তিনি দেশের ও জাতির কেবল রাজনৈতিক বিষয়াবলী নিয়ে নাড়াচাড়া করেননি। জাতির রাজনৈতিক বিষয়াবলীর সমাধান খুঁজেছেন তিনি অন্যসব বিষয় এড়িয়ে একথাও তাঁর সম্পর্কে বলা যাবে না। তাঁকে নিছক একজন সমাজসেবী ও সমাজ সংস্কারকও বলা যাবে না। জীবনের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে তিনি কোন দ্বন্দ্ব দেখেননি। মানুষের সমাজকে শ্রেণীতে বিভক্ত করে তার মধ্যে কাল্পনিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের চেহারা প্রত্যক্ষ করে নিজের সমাধানের মধ্যে হিংসার উন্মাদনা জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন তাঁর হয়নি।

তাঁর সমাধান তাঁর মস্তিস্কের সীমিত চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির ফসল নয়। সমস্যার স্রষ্টা যিনি সমাধান পেয়েছেন তিনি তাঁরই কাছ থেকে। কাজেই তাঁর সমাধানে কোন বৈকল্য, বিকৃতি, বিশেষ আবেগ উন্মাদনা ও পক্ষপাতিত্ব নেই। তিনি তো এমন এক স্রষ্টার প্রেরিত সর্বাধিনায়ক যিনি এই সীমাহীন অনন্ত বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন এবং এর পরিচালনার সমস্ত দায়িত্বভার একাই বহন করছেন। তাঁর সমাধান তো দেশ বিশেষ বা জাতি বিশেষের সীমানায় আবদ্ধ নয়। তাঁর সমাধান সারা বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির জন্য। বিশেষ কাল ও সময়ের সাথেও তা জড়িত নয়। এ কথা বলা যায় না যে, এক'শো বা দু'শো বছর পরে এ সমাধান আর কোন কাজে লাগবে না। যেমন বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে থিসিস, এন্টিথিসিস ও সিনথিসিসের প্রক্রিয়া চলে, এখানে তারও কোন স্কোপ নেই। এটা তো তেমন কোন মানুষের তৈরী সাময়িক মতবাদ ও সমাধান নয়। বরং এ মতবাদে সমাধানের একটা স্থায়ী মূলনীতি দেয়া আছে, যার ভিত্তিতে স্থান-কাল-পরিবেশের বিভিন্নতায় তার বিভিন্ন সমাধান নির্নীত হয়।

সমস্যা সংখুব্ধ বিশ্ব। বিশ্বের জনসংখ্যার চাপ প্রতিদিন বেড়ে চলছে। এদের সবার মুখে খাবার জোগাবার সামর্থ প্রতিদিন সে হারিয়ে ফেলছে। উন্নততর প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি ও খাদ্যোৎপাদনের দ্রুত অগ্রগতির পরও বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে। অনাহারে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। দুনিয়ার কয়েক কোটি লোক বর্তমানে নিজেদের

ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে শরণার্থী শিবিরে অবস্থান করছে। তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার হারা এক মানবেতর গোষ্ঠী। গত দু' শতকের শিল্প বিপ্লব ও শিল্পোন্নয়নের সুবিধে ভোগ করছে দুনিয়ার মাত্র কয়েকটি উন্নত দেশের কয়েক কোটি সৌভাগ্যবান পরিবার। সর্বহারা মানুষের জীবনে আর্থিক স্বাচ্ছল্য আনার লক্ষে চলতি শতকের প্রথমার্ধ থেকে দুনিয়ার দু'টি বিশাল দেশে যে নতুন অর্থনীতির মশ্‌ক চলছিল তার পাট সেখানে কবেই চুকে বুকে গেছে এবং অর্থনীতির ভাঙন রক্ষার্থে ধীরে ধীরে আবার তা 'পুনরমুষিকভব' এর রূপ নিতে চলছে। আর আশ্রিত, অধীনস্থ ও দুর্বলদের প্রতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের চেহারার পরিবর্তন হলেও চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয়নি। নিজেদের প্রতিপক্ষকে তারা নিহত ও আহত করছে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে। প্রতিপক্ষের মোকাবিলার জন্য নতুন নতুন অস্ত্রে শান দিচ্ছে। বিজ্ঞানের উন্নতি যতটা না মানুষের কল্যাণে তার চাইতে বেশী রয়েছে তার পেছনে মানুষের অকল্যাণ আকাংখা। সত্যি বলতে কি বিজ্ঞানের শক্তি আজ মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। নিজের ধ্বংসের জন্য মানুষ আজ নিজেই কুয়া খুঁড়ে বসে আছে। শুধু কখন তাতে অন্ধের মতো হুড়মুড় করে পড়ে মরবে, এরি কেবল অপেক্ষা।

এই হচ্ছে আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহটির বর্তমান চারশ কোটি মানুষের অবস্থা। এখানে শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ। দেশে দেশে বিরোধ ও যুদ্ধ। ফল গণহত্যা, সম্পদ ও ফসলহানি, আবাসভূমি বিধ্বস্ত, মানুষের মৃত্যু ও দুর্ভোগ। মেয়েরা বিগত কয়েকশো বছরের নিজেদের লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও অধিকার হরনের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে ক্রোধে আক্রোশে নিজেদের মূল্যবান সত্তাকেই বিকিয়ে দিয়ে চলছে।

মোটকথা বিশ্ব মানবতার আজ কোন নেতা নেই। তারা কারোর নেতৃত্বে আস্থাশীল নয়। নিজেদের সমস্যাগুলো আলোচনা করার জন্য তারা সবাই মিলে এক জায়গায় বসার ব্যবস্থা করেছে ঠিকই কিন্তু এ ব্যবস্থাটা শুধু বড়দের বড়াই জাহির করার কাজটা পাকাপোক্ত করে যাচ্ছে। হিংসার পোকাগুলো নিজেদের বুকের মধ্যে সযত্নে পুষে রেখে তারা আলোচনার টেবিলে বসছে আর প্রয়োজনমত সেই পোকাগুলোকে চারদিকে ছেড়ে দিয়ে সবাইকে তাদের উন্মত্ত মাতামাতি দেখাবার সুযোগও করে দিচ্ছে।

আজকের আমাদের এই বিশ্বের জন্য প্রয়োজন একজন মহান অধিনায়কের। এমন একজন অনিধনায়কের যিনি হবেন দেশ-জাতি-বর্ণ-ভাষা-অঞ্চল নিরপেক্ষ। সমগ্র মানব জাতি যাঁর কাছে এক মায়ের পেটের সন্তান। সমগ্র

মানব জাতির সমস্যার যথার্থ সমাধানই যাঁর সারা জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের লক্ষ। যিনি রহমাতুল্লিল আলামীন–সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ, কল্যাণের আধার। আজ সময় এসেছে বিশ্ববাসীর নিজের কল্যাণের পথ বেছে নেয়ার, নিজের কল্যাণাকাংখীকে চিনে নেয়ার। দেশ–ভাষা–অঞ্চল–জাতির স্বার্থকে বড় করে না দেখার। বিশ্ব মানবতা যখন তার এই মহান নেতাকে চিনে নিতে পারবে তখন তার সমস্ত জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে অতি সহজেই।

সেই মহান নেতা যাঁর জন্য আজকের বিশ্ব অপেক্ষা করে আছে, আল্লাহর সেই নির্বাচিত মনোনীত শ্রেষ্ঠ বান্দা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি জানাই আমাদের হৃদয়ের অকুন্ঠ শ্রদ্ধা ও সালাম। আজ তাঁর নেতৃত্বের প্রয়োজন বিশ্ববাসীর সবচেয়ে বেশী। মুসলিম উম্মাহ কি তাঁর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসবে?

আজকের বিশ্ব মানবতার নেতা

ক্ষুধা, অনাহার, শোষণ, নিপীড়ন, জুলুম, প্রতারণা, স্বার্থপূজা, জাতিতে জাতিতে হানাহানি, দেশে দেশে যুদ্ধ, এক জাতি আর এক জাতিকে দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা, নারী নির্যাতন, দুর্বলের হাহাকার–এক কথায় এটাই হচ্ছে বিশ শতকের বিশ্ব। নিসন্দেহে সভ্যতার অগ্রগতি আজকের বিশ্ব মানবতার বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতার প্রমাণ। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, টেকনোলজি সব ক্ষেত্রেই বিশ শতকের মানুষ এক অভূতপূর্ব উন্নতির দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেছে। পৃথিবীর আবর্তন পথ ভেদ করে তারা আজ সূর্যের দিকে ধাবমান। আর এক সৌরজগতের পথ সন্ধানে তাদের মহাশূন্য তরী মহাকাশে ভেসে চলছে। অতি যত্নে তিলে তিলে যে মহাসভ্যতা তারা বিশ্বের বুকে গড়ে তুলেছে তাকে ধ্বংস করা ও বিশ্বের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া আজ তাদের জন্য মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার।

এত বিপুল ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ কিন্তু আজ দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে বেশী অসহায়। সমস্যার জালে আপাদমস্তক জড়িত। সমস্যার একটি গ্রন্থী খোলার চেষ্টা করার সাথে সাথে দশটি নতুন গ্রন্থীতে জড়িয়ে পড়ে সে। অশান্তি, বিশৃংখলা, হতাশা, নৈরাজ্য তার জীবনের নীট লাভ। নিজের ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীক সমস্যার হাতে এমন নির্দয়ভাবে পরাজিত মানুষ ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি।

তাই আজ থেকে চৌদ্দ'শো বছর আগে বিশ্ব মানবতা একজন মহামানবের আবির্ভাব আকাংখা পোষণ করেছিল যত তীব্রভাবে আজো তার সে তীব্রতা কমেনি। বরং এমন একজন আদর্শ মহামানব যিনি মানুষের মত করে মানুষের সমস্যার সমাধানে সক্ষম, যিনি সমস্যার গভীরতা উপলব্ধি করেন, যাঁর মস্তিষ্কের সমস্ত কোষ এই সমস্যার জটিলতা, এর গতি–প্রকৃতি ও আসল চেহারা নির্ণয়ে পূর্ণভাবে সক্রিয় থেকে হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে এর সমাধানে তৎপর থাকে এবং সর্বোপরি এই প্রেক্ষাপটে যিনি নিজেকে মহান আদর্শ হিসেবে পেশ করেন, আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখায়–এই যার নীতি অর্থাৎ নিজের বক্তব্য ও সমাধান প্রথমে নিজের ওপর কার্যকর করেন, নিজের জীবনে তার পূর্ণ বাস্তবায়ন করেন। তারপর অন্যের ওপর তা আরোপ করেন। এমনি একজন আদর্শ মহামানবের প্রয়োজন আজ তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে।

কে সেই আদর্শ মহামানব? চান্দ্র মাসের হিসেব অনুযায়ী আজ থেকে ১৪৫৯ বছর আগে মক্কার কুরাইশ বংশে যে মহামানবের জন্ম হয়েছিল তিনি কি এই বিশ শতকের বিশ্বের সমস্যা জর্জরিত মানবতার নেতৃত্ব দানে সক্ষম? মানব সভ্যতার এমন এক সমস্যা সংকুল সন্ধিক্ষণে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে তাঁর আবির্ভাব যার সাথে আজকের যুগ সমস্যার মূলগত সামঞ্জস্য সুস্পষ্ট।

তাঁর মহান আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী একটি বিশাল সভ্যতা গড়ে উঠেছে। ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বারো তেরো'শো বছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল এ সভ্যতার দোর্দণ্ড প্রতাপ। ইউরোপ ভিত্তিক পশ্চিমী সভ্যতার প্রসারের পূর্বে সমগ্র বিশ্বের সমস্ত জাতির জীবন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এ সভ্যতার আলোকে। এই মহান আদর্শের ভিত্তিতে তিনটি মহাদেশে একাধিক রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে। প্রথম দিকে তিরিশ বছর পর্যন্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যথার্থ চেহারায় ও অবয়বে এ আদর্শের পরিপূর্ণ বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল, যা দুনিয়ার ইতিহাসে অন্য কোন আদর্শ বা মতবাদের ক্ষেত্রে একদিনের জন্যও সম্ভবপর হয়নি। তার পর থেকে নিয়ে গত তেরো চৌদ্দ'শো বছর পর্যন্ত এ আদর্শের ভিত্তিতে দুনিয়ায় কোথাও না কোথাও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে। এইসব রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ঐ আদর্শের পূর্ণ বিকাশ না ঘটলেও তাদের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল এরি ওপর। এমনকি চলতি শতকের প্রথম দিকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগকারী তুরস্কের উসমানী খিলাফত আংশিকভাবে হলেও এই আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এই আদর্শ যতদিন দুনিয়ার বিশাল এলাকায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল ততদিন দুনিয়ায় ক্ষুধা-অনাহার এই পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি যেমন আজকের আধুনিক সভ্যতা ও পাশ্চাত্য মতবাদের আওতায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে এ আদর্শের প্রতিষ্ঠা যত বেশী সম্ভব হয়েছে সেখানে ক্ষুধা ও অনাহার এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য ততবেশী দূরীভূত হয়েছে। মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য ও ইনসাফ ততবেশী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শোষণ-জুলুম ও নিপীড়ন ছিল এ আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিষতুল্য। এ আদর্শ থেকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো যতবেশী বিচ্যুত হয়েছে ততই শোষণ ও নিপীড়নের স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। পাশ্চাত্য মতবাদের আওতায় পরিচালিত বিশ্বে বিগত মাত্র দু'শো বছরে জাতিতে জাতিতে যে হানাহানি ও বিভেদ বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তা তার আগের বারো'শো বছরের বিশ্বমানবতা কোনদিন কল্পনাই করতে পারেনি। বরং পূর্বের বারোশো বছরের মহান আদর্শ মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ব সৃষ্টিতে তৎপর ছিল। পাশ্চাত্য মতাদর্শ মাত্র

বিগত অর্ধ শতকে বিশ্বকে দু'দুটো মহাযুদ্ধ উপহার দিয়েছে, যা বিশ্বের দু-তিনটে মহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সংঘটিত হয়েছে এবং তাতে কয়েক কোটি মানব সন্তান নিহত হবার সাথে সাথে কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। কিন্তু ঐ মহান আদর্শের প্রতিপত্তির বারো তেরো'শো বছরে যে দু'টো বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার একটা হচ্ছে তাতারদের ধ্বংস অভিযান। এটাকে কোন যুদ্ধ বলা যায় না। এটা ছিল ঐ আদর্শকে খতম করার একটি একতরফা বর্বর প্রক্রিয়া। আর দ্বিতীয়টি ছিল ক্রুসেড যুদ্ধ। কিন্তু এইসব যুদ্ধ এবং ঐ সভ্যতার প্রতিপত্তিকালের আরো বিভিন্ন যুদ্ধেও যে পরিমাণ জান-মালের ক্ষতি হয়েছে আধুনিক সভ্যতার আওতায় অনুষ্ঠিত দুটি মহাযুদ্ধের যে কোন একটির সমগ্র ক্ষয়ক্ষতির তুলনায়ও তা সামান্য। তাছাড়া আধুনিক সভ্যতা জাতিতে জাতিতে যে বিদ্বেষ ও হিংসার বীজ বপন করে চলেছে তার ধ্বংসকারিতা অত্যন্ত সুদূর প্রসারী ও তুলনা বিহীন।

চৌদ্দ'শো বছর আগের মহামানব মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্ব ও আদর্শ তাই আজকের বিশ্বে মোটেই কোন পরোনো ও অপরিচিত বিষয় নয়। তাঁর নেতৃত্ব ছাড়া সমস্ত নেতৃত্বই আজ অকেজো ও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্ব মানবতার আজ এই নেতৃত্বের দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

৩৬

আফগানিস্তানে আগ্রাসন ঃ কমিউনিস্ট বিবেকের অন্ধকার আবর্ত

দেখতে দেখতে পাঁচ বছর হয়ে গেলো। কিন্তু রুশীয় কমিউনিস্ট বিবেকের অন্ধকারে আর আলো জ্বললো না। অ-কমিউনিস্ট মানুষের প্রাণের দাম তাদের কাছে বোধ হয় একটা পিঁপড়ে, একটা মশা-মাছির চাইতেও কম। তাই গত পাঁচ বছর ধরে কমিউনিস্ট রাশিয়ার কয়েক লাখ হানাদার সৈন্য আফগানিস্তানের গ্রামে-গঞ্জে, পথে-ঘাটে, পাহাড়ে-উপত্যকায়, বনে-জঙ্গলে, নগরে-নগর উপকণ্ঠে লাখো লাখো মুসলমানকে হত্যা করে চলছে। সভ্য মানুষের বেশে তারা আলোচনার টেবিলে বসে। কিন্তু অসভ্য ও বর্বরদের মতো আফগান মুসলমানদের ঘরবাড়ি, গ্রাম, শস্যক্ষেত জ্বালিয়ে দেয়। নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের ওপর আকাশ পথে বিমান ও হেলিকপ্টার থেকে বোমা বর্ষণ করে। রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে মানুষের অংগ প্রত্যংগ জ্বালিয়ে দিচ্ছে এবং মানুষকে পংগু করে ফেলছে।

মার্কস ও এঙ্গেলসের কমিউনিজম বিশ্বকে যা দান করেছে তা থেকে বিশ্বের অন্যান্য এলাকার মানুষ যা পেয়েছে তাতো পেয়েছেই, কিন্তু মুসলমানরা তা থেকে যা পেয়েছে তা হচ্ছে মধ্য এশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত বিশাল ভূখণ্ড আজারবাইজান, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান, কিরগিজিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তান আজ কমিউনিস্ট শ্বেত ভল্লুকের পদতলে। সেখানকার মুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবন যাপন প্রণালী, শিক্ষা সবকিছু কমিউনিস্ট আগ্রাসনের শিকার। এ দিক দিয়ে কমিউনিস্ট আগ্রাসন আমেরিকান, বৃটিশ ও ফরাসীদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের চাইতে কোন অংশে কম নয়। এই কমিউনিস্ট আগ্রাসনকে তাই বলা হয় লাল সাম্রাজ্যবাদ। নিকট অতীতে আলজেরিয়ায় ফরাসী ঔপনিবেশিকতাবাদ যেভাবে মানবতার ধ্বংসলীলা চালিয়েছিল, যেভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনামে মানবতা ধ্বংসী অভিযান চালিয়ে দেখিয়েছিল তার শক্তির দম্ভ, ঠিক তেমনি রুশীয় লাল সাম্রাজ্যবাদ আফগানিস্তানে তার শক্তির মহড়া করে যাচ্ছে।

আফগানিস্তানের সাবেক ক্ষমতাচ্যুত বাদশাহ জহীর শাহের ইসলাম বিরোধী সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁষা নীতি এবং পরবর্তী শাসক দাউদ খানের রুশীয়

কমিউনিস্ট তোষণ নীতির ফলে আজ আফগানিস্তানের মুসলমানরা এই দুর্দিন দেখছে। বন্ধুর বেশে কমিউনিস্ট রাশিয়া আফগানদের মধ্যে নিজের একদল পেটুয়া তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। এই পেটুয়ারা সেখানে একদিন রাতারাতি ঘটালো রক্তাক্ত বিপ্লব। এর নাম দেয়া হয়েছে আফগান স্টাইলে বিপ্লব। এরপর পেটুয়াদের রক্ষা করতে দৌড়ে এলো সারা দুনিয়ায় 'যুদ্ধ নয় শান্তির' অবতার লাল সাম্রাজ্যবাদের লাল ফৌজ। বলি ফিলিস্তিনীদের ঘরছাড়া করে ইসরাইলীদের ইহুদী আগ্রাসন ও আফগানিস্তানে রুশীয় আগ্রাসনের মধ্যে তফাতটা কোথায়? সারা দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের গলায় গলায় মিল। আবার এই সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ যখন পড়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তখন তো আর কোন কথাই থাকে না। তখন তাদের মনের মিলও ঘটে যায় অলৌকিকভাবে। তাই তো দেখা যায় আফগানিস্তানের মতো একটা ছোট দেশের মুসলমানরা যখন বিশ্বের একটা পরাশক্তির চাপিয়ে দেয়া অসম যুদ্ধের মোকাবিলা করে যাচ্ছে পাঁচ বছর ধরে তখন বিশ্ববিবেকেও সাড়া নেই। আর ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মুক্ত বিশ্বের গলাবাজ মাতববর দ্বিতীয় পরাশক্তিটি তার জাতভাইর বিরুদ্ধে শুধু মাত্র দু-চারটে নিন্দে প্রস্তাব পাস করিয়ে এবং নেহাত ধ্বনি সর্বস্ব কয়েকটা হুমকি ধমকি দিয়েই গা এলিয়ে বসে আছে। স্বাধীন বিশ্বের যেন আর কিছু করার নেই। আফগানিস্তানে শ্বেত ভল্লুকের দাপাদাপি চলছে চলুক।

কিন্তু সবচাইতে বড় বিস্ময় হচ্ছে ইসলামী বিশ্বের নিরবতা। এ শতকের গোড়ার দিকে তুরস্কের মুসলিম সম্রাটদের তথাকথিত মুসলিম খেলাফত বিলুপ্ত করার জন্য যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এগিয়ে গিয়েছিল তখন মুসলমানদের মধ্যে যে প্রতিবাদী মনোভাব জেগে উঠেছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, আজ মুসলমানদের একটি দেশকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে উদ্যত এবং সেখানকার লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে শহীদ করার পরও রুশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে তেমন চাঞ্চল্য দেখছি না। মুসলমানদের চল্লিশটিরও বেশী স্বাধীন রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই রুশীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের কোন তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না। বরং কয়েকটা মুসলিম রাষ্ট্রকে রুশ সাম্রাজ্যবাদ নিজের সাথে জড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে।

সাধুতার ছদ্মাবরণে শঠতা এ হচ্ছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাম্রাজ্যবাদের একটা রূপ। বাবরাক কারমালের মতো শিখণ্ডীকে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে একটা পুতুল সরকার। এটা করা হয়েছে শুধু নিজের সামরিক অস্তিত্বকে আইন সংগত করার জন্য। আইনের কাজই যদি হয় বেআইনীকে

কিভাবে আইন সংগত করা যায় তার উপায় বের করা তাহলে এ ধরনের আইন যে মতবাদের অংশ সে মতবাদ মানবতাকে লাঞ্ছনা, দাসত্ব ও ধ্বংস ছাড়া আর কি উপহার দেবে? রাশিয়া যে মতবাদের ধারক সেই মতবাদটিই বিগত পৌনে একশতক থেকে তাকে বিশ্বের এই সবচেয়ে ভয়াবহ সাম্রাজ্যবাদের রূপে উপস্থাপিত করেছে।

আল্লাহ মুসলমানদের এই সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে উদ্ধারের তাওফীক দান করুন।

জাতীয় স্বাধীনতার সার্থকতা

স্বাধীনতার ধারণা আজকের নয়, অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের সমাজ–সভ্যতা–রাষ্ট্রে এর প্রতিফলন ঘটে আসছে। মানুষ নিজের ইচ্ছামতোই সমস্ত কাজ করতে চায়। কারণ তাকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দান করা হয়েছে। যে কোন অবস্থায় যে কোন পরিবেশে অন্তত মনের জগতে সে স্বাধীনভাবে বিচরণ করার ক্ষমতা রাখে, সৃষ্টির প্রথম লগ্নেই স্রষ্টা তার মধ্যে এ ক্ষমতাটুকু দান করেছেন। মনোজগতে স্রষ্টা তাকে এভাবে স্বাধীন করে দিয়েছেন তাকে স্রষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য নয়। অবশ্যি তার বিদ্রোহ করার ক্ষমতা আছে এবং আনুগত্য করার ক্ষমতাও আছেঃ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ – الكهف যে চায় আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে পারে আবার যে চায় তাঁর হুকুম না মেনেও চলতে পারে।

কিন্তু আল্লাহর নাফরমানী করা বা তাঁর হুকুম না মেনে চলার মধ্যে মানুষের পার্থিব জীবন যাপনের সার্থকতা নেই। বরং স্বাধীন বিবেক ও বিচার বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহর আনুগত্য করা ও তাঁর হুকুম মেনে চলার মধ্যেই তার পার্থিব ও অতি পার্থিব জীবনের সফলতা নিহিত। তাই এখানে স্বাধীনতা অর্থ আল্লাহর হুকুমের গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করা। অর্থাৎ তাকে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার ও তাঁর হুকুম মেনে না চলার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। সে স্বাধীনভাবে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার পথ অবলম্বন করেছে। أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى (অর্থাৎ আল্লাহ সমগ্র মানবাত্মাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তারা সমস্বরে বললো ঃ (হাঁ)। কুরআনের এ বর্ণনার মধ্যেও এ সত্যটিরই প্রতিধ্বনি শুনি। মুমিন ও মুসলমানের কাছে স্বাধীনতার এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন ধারণা নেই।

মুসলমানের কাছে স্বাধীনতার ধারণা এটা নয় যে, আমাদের নিজেদের সমাজে, দেশে ও স্বাধীন রাষ্ট্রে আল্লাহর হুকুমের পরোয়া না করে আমরা নিজেদের ইচ্ছামতো একটা ব্যবস্থার এখানে প্রচলন ও প্রবর্তন করবো। এটা কোন কুফরী ও মুশরিকী সমাজের ধারণা হতে পারে। মুসলমানদের স্বাধীনতার ধারণার সাথে এর তিলার্ধও সম্পর্ক নেই। মুসলমানদের স্বাধীন রাষ্ট্র সম্পর্কে সর্বশক্তিমান আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ - (الحج : ٤١)

"তাদেরকে যখন আমি পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করি, তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে।"

তাই মুসলমানের স্বাধীনতা ও অমুসলমানের স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্যের সুস্পষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত হয়ে গেছে। মুসলমানদের স্বাধীন রাষ্ট্রে জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর দীন বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। অন্যথায় তা স্বাধীনতার নামে প্রবৃত্তি ও নফসানিয়াতের গোলামী হিসেবেই বিবেচিত হবে। আধুনিক পরিভাষায় তাকে বলা যাবে মানবরচিত মতবাদের গোলামী। এই গোলামীর স্পর্শ থেকে সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি জীবনকে মুক্ত করে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতাকে সার্থক করে তুলতে হবে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার লানত

ইংরেজ চলে যাবার পর সাঁইত্রিশটা বছর কেটে গেছে।* এই সাঁইত্রিশটা বছর দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণত আমাদের নিজেদের হাতে রয়ে গেছে। তার মধ্যে পঁচিশ বছরে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার দোহাই দিলেও গত বারো বছরের আমাদের কার্যকলাপের জন্য কারোর দোহাই-টোহাই তো খাটবে না।

মূলত ঐ পঁচিশ বছরেও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দায়-দায়িত্ব আমাদের নিজেদের ঘাড়েই ছিল। ঐ পঁচিশ বছরেও আমরা যেখানে ছিলাম এই বারো বছরেও সেখানেই রয়ে গেছি। এটা এমন একটা সত্য-যার জন্য কোন যুক্তি প্রমাণ পেশ করার প্রয়োজনই দেখা দেয় না।

একটা জাতি শুধু রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে হীনবল হবার কারণে অন্য একটা জাতির অধীনতা ও বশ্যতা স্বীকার করে না। রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির সাথে সাথে শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বহু দিক দিয়ে তার দীনতা প্রতিপক্ষের তুলনায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। পরাজিত জাতি যদি শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্যে উন্নত হয় তাহলে তার এ পরাজয় হয় সাময়িক ও আংশিক। কিছু দিনের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিজয়ের মাধ্যমেই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সে তার সামরিক ও রাজনৈতিক পরাজয়ের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়। হিজরী সপ্তম শতকে মধ্যএশিয়া, হিরাত, সিরিয়া, ইরাক ইত্যাদি এলাকার মুসলিম শাসকদের ওপর তাতারীদের সামরিক বিজয় মাত্র পঞ্চাশ ষাট বছরের বেশী টেকেনি। মুসলমানদের উন্নত শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ভাবধারার কাছে তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে হয় অচিরেই। পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে তারা নিজেরাই হয়ে ওঠে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির বাহক। সকালের ক্ষতি যদি বিকেলে পুষিয়ে যায়, তাহলে তাকে ক্ষতি বলা যায় না।

কিন্তু আজ থেকে সোয়া দু'শো বছর আগে বাংলার মুসলমানরা যে সামরিক ও রাজনৈতিক পরাজয় বরণ করে, তার ফলে মুসলমানদের শিক্ষা-সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিতও ধ্বসে পড়ে। এদেশের মুসলমানরা ইংরেজের রাজনৈতিক

* ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

দাসত্বের সাথে সাথে তার শিক্ষা–শিল্প–সাহিত্য–সভ্যতা–সংস্কৃতিরও দাসত্ব গ্রহণ করে। প্রথমে মুসলমানরা এই শিক্ষা ও সংস্কৃতির দাসত্ব গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। তখনকার দিনে এ ধরনের বিকৃত রুচির মুসলমানদের সংখ্যা হাতে গোনা যেতো। মুসলিম সমাজে তারা ছিল ধিকৃত। এ জন্য এক'শো দশ বছর ধরে মুসলমানরা ইংরেজের রাজনৈতিক শক্তির মোকাবিলা করতে থাকে। গোপন সাংগঠনিক তৎপরতা ও প্রকাশ্য জিহাদের পথে তারা এগিয়ে যায়। কারণ তারা জানতো, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে হিজরী সপ্তম শতকের মুসলমানদের মতো শক্তিশালী পজিশনে তারা নেই। আর তাদের প্রতিপক্ষ ইংরেজও তাতারীদের মতো শিক্ষা–সাহিত্য বিমুখ ও অসংস্কৃতিবান নয়। ইংরেজ একটা উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার অধিকারী। শিল্প বিপ্লব প্রচেষ্টা তাদের দেশে অর্থনৈতিক নব দিগন্তের সূচনা করতে চলছে। জ্ঞান–বিজ্ঞানের উন্নতি তাদের দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করছে। তারা একটা অভিনব সভ্যতা–সংস্কৃতির ধারক। ইংরেজের এ শক্তিশালী দিকগুলোর মোকাবিলা করা সেই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের পতনশীল মুসলিম সমাজের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই তারা সহজ, সোজা ও স্বাভাবিক পথটি ধরেই এগিয়ে চলছিল। সেই অবস্থায় প্রতিপক্ষের ওপর রাজনৈতিক বিজয় ছাড়া অন্য কোন বিজয় লাভের শতকরা একভাগও সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের এক'শো দশ বছরের রাজনৈতিক প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পর তাদের সর্বশেষ প্রতিরক্ষা তথা আত্মরক্ষা প্রাচীরও ধ্বসে পড়ে। তারপর শুরু ইংরেজের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মুসলমানদের দীক্ষা গ্রহণের পালা।

মুসলমানদের পরাজয়টা যেমন ছিল দুঃখজনক ও ভয়াবহ, তেমনি তাদের দীক্ষা গ্রহণটাও ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী ভয়াবহ ও দুঃখজনক। ইংরেজের শিক্ষাকে মুসলমানরা গ্রহণ করলো হুবহু। একেবারে আগাসে গোড়া। আর ইংরেজের সংস্কৃতিতে তারা ডুবে গেলো আকণ্ঠ। এ ব্যাপারে কোন প্রকার যাচাই–বাছাইর প্রয়োজনই তারা অনুভব করলো না। সে যুগের মুসলমানদের যারা নেতা ছিলেন, ইংরেজীয়ানার দিকে যারা মুসলমানদের হাঁকিয়ে নিয়ে চলছিলেন, তাদের মধ্যে নিখিল ভারতীয় পর্যায়ে স্যার সাইয়েদ আহমদ খান ও বাংলার নওয়াব আবদুল লতীফের নাম বলা যায়। তাঁরা নিজস্ব জায়গায় ইংরেজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষ থেকে মুসলমানদের আত্মরক্ষার কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তার কোন রেকর্ড অবশ্যি এখনো আমাদের সামনে আসেনি। তবে সেদিনকার আমাদের ইংরেজীয়ানায় আত্মলীন আকাংখার ফসলই আজ আমরা কাটছি মাত্র। সেদিন ইংরেজের শিক্ষাকে যদি আমরা

আত্মসচেতনতার সাথে গ্রহণ করতাম, তার গলদটুকু যদি যথার্থ গলদ হিসেবেই আমাদের সামনে থাকতো। তাহলে আজ আমাদের অন্তত এতবড় দুর্দিন দেখতে হতো না। আজ আমাদের নিজেদের ঘরেই ইসলামে অবিশ্বাসী, দুর্বল বিশ্বাসী, নাস্তিক ও ইসলাম বৈরী মতবাদের প্রচারক ও নায়কদের জন্ম হতো না। আঠারো–উনিশ শতকে মুসলিম সমাজ যতই অধপাতে গিয়ে থাকুক না কেন, অন্তত একটা বিজাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতিকে গ্রহণ করার ব্যাপারে তারা এতটুকু বিশ্লেষণী ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছিল একথা মেনে নেয়া যায় না।

মুসলমানদের এই দীনতা, আত্ম–অসচেতনতা ও দায়িত্বহীনতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলো ইংরেজ। আর শুধু ইংরেজ নয়, সমগ্র ইউরোপেই তখন চলছিল উত্থানের পালা। ইউরোপের বিভিন্ন জাতি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের মুসলিম দেশগুলোর ওপর নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সার বেঁধে চলছিল। আর সারা মুসলিম বিশ্বে তখন নেমে এসেছিল সারিবদ্ধ পতন। বাংলার মুসলমানরা ছিল এই সার্বিক পতনেরই একটি অংশ।

ইংরেজ তার মনমতো একটা শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। ইংরেজের কাজে সাহায্য করার জন্য একদল দেশীয় কেরানী তৈরী করা, ইংরেজের হুকুমতকে টিকিয়ে রাখার জন্য একদল দেশীয় ইংরেজ বানানো ছাড়াও তার আর একটা দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ ছিল এই শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করার পেছনে। এই লক্ষে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ইউরোপের সমস্ত জাতিরা একযোগে কাজ করে গেছে। তা হচ্ছে, মুসলমানদের অমুসলমান বানানো এবং ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতিকে চিরতরে পংগু করে দেয়া, যাতে করে পাশ্চাত্য সভ্যতা–সংস্কৃতির মোকাবিলায় সে আর কোনদিন কোমর সোজা করে দাঁড়াতে না পারে।

আজও ইংরেজের তৈরী শিক্ষা ব্যবস্থার এ লানতগুলো আমরা নিজেদের ঘাড়ে বহন করে নিয়ে চলছি। তাইতো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পঁচিশ বছরের ও বারো বছরের চেহারার কোন ফারাক দেখা যাচ্ছে না।

৩৯
কুরআনের প্রতি আস্থাহীনতা সৃষ্টি কি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ?

বিগত সাঁইত্রিশ বছরে আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার লানত থেকে বাঁচার কোন চেষ্টাই আমরা করিনি। এখনো কোন চেষ্টা চলছে না। এই প্রসঙ্গে এই লানতের চেহারাটাও একটু মেলে ধরলে বিদগ্ধ পাঠকদের পক্ষে ব্যাপারটা বুঝে নেয়া সহজ হবে মনে করি।

ইংরেজের শিক্ষা অনেক দিক থেকে আমাদের লাভবান করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই শিক্ষাকে আমাদের নিজেদের মতো করে গ্রহণ না করে ইংরেজ এবং ইংরেজের ন্যায় অন্যান্য জাতিদের মতো করে গ্রহণ করার কারণে এ শিক্ষা একদিক দিয়ে আমাদের বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আবেগতাড়িত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় নিজেদের লাভ–ক্ষতির খতিয়ান করার সময় কি আমাদের এখনো আসেনি?

মুসলমান এমন এক জনগোষ্ঠীর নাম যারা এক বিশেষ জীবন দর্শনের অধিকারী। এই জীবন দর্শনের প্রতি আস্থা না থাকলে কোন মুসলমান মুসলমানই থাকতে পারে না। এ জীবন দর্শন সৃষ্টির আদি থেকে নিয়ে অন্ত পর্যন্ত সৃষ্টি জগতের একটি ধারাবাহিক কর্মধারায় বিশ্বাসী। আর সৃষ্টির এই ধারাবাহিক কর্মধারার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে মুসলমানের সমগ্র জীবন ধারা গড়ে ওঠে। সৃষ্টির এ ধারাবাহিক কর্মধারার পেছনে রয়েছে সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের কোন প্রমাণিত সত্য (Fact) এর বিরুদ্ধাচরণ করেনি। বিজ্ঞানের জগতে এখনো যেগুলো থিওরীর পর্যায়ে আছে তার কোন কোনটা এর বিপরীতমুখী দেখা গেছে। (আর বিজ্ঞানের থিওরীগুলো সতত পরিবর্তনশীল) কিন্তু বিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্যগুলো শুধু এর সত্যতা প্রমাণ করে নতুন নতুন রহস্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেই চলছে।

এ জীবন দর্শনের একটি মূল কথা হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর দুনিয়ায় বিভিন্ন প্রজাতি সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে মানুষও একটি স্বতন্ত্র প্রজাতি। প্রথম যে মানুষটিকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন তাঁকে দিয়েছিলেন পূর্ণ জ্ঞান। তাঁকে সুসভ্য ও সুসংস্কৃত জীবন যাপনের পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন। প্রথম মানুষটিই ছিলেন আল্লাহর পয়গম্বর। অহীর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে তাঁর সরাসরি যোগাযোগও ছিল। এভাবে মানুষের সভ্যতা–সংস্কৃতি নবীর শিক্ষার অবদান।

কিন্তু ইংরেজের শিক্ষা ডারউইনের তত্ত্বের নামে সৃষ্টিতত্ত্বের এমন এক ব্যাখ্যা শেখালো, যা ইসলামী জীবন দর্শন প্রদত্ত সৃষ্টিতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এ তত্ত্বে মানুষের বর্তমান অবয়ব ও কাঠামোকে একটি দীর্ঘকালীন বিবর্তন প্রক্রিয়ার ফল বলে দাবী করা হয়েছে। ডারউইনের এ তত্ত্ব বিজ্ঞানের চাক্ষুষ প্রমাণিত সত্য বা ফ্যাক্ট নয়। বরং এটা একটা থিওরী এবং এ থিওরীকে বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সৃষ্টির ধারাবাহিক কার্যক্রমের একটা চলনসই ব্যাখ্যা হিসেবে পশ্চিমের বিজ্ঞান জগতের একটা অংশ একে গ্রহণ করে নিয়েছে। আবার একটা অংশ এই ব্যাখ্যার মধ্যকার বিরাট ফাঁকগুলো পূরণে অসমর্থ হয়ে একে নিছক একটা ফাঁকিই মনে করেছে। কাজেই বিজ্ঞানীদের একটা অংশ এই ডারউইন তত্ত্বের ঘোর বিরোধী।

ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী প্রথম মানুষ পূর্ণাংগ মানবিক কাঠামো ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সহকারে আবির্ভূত হয়নি। বরং বিশ্বজগতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক সময় আকস্মিকভাবে জীবনের সূচনা হয়। বিভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্য দিয়ে এক সময় মানুষের অবয়ব ফুটে ওঠে। ধীরে ধীরে মানুষ একটি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবে পরিণত হয়। যতই দিন যাচ্ছে তার বুদ্ধিবৃত্তি পরিণতি লাভ করছে। অর্থাৎ প্রথম মানুষ অসভ্য ছিল। জীবন যাপন ও সমাজ গঠনের পদ্ধতি জানতো না। এক কথায় বন্য পশু থেকে মানুষের উৎপত্তি এবং প্রথম মানুষ আর বন্য পশুর মধ্যে ফারাক খুব কমই ছিল।

এ চিন্তাধারা ইসলামী সৃষ্টি তত্ত্বের সাথে পুরোপুরি সংঘর্ষশীল। কুরআনে মানুষ সৃষ্টির ঘটনাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম মানুষকে সেখানে শুধুমাত্র একটি বুদ্ধিবৃত্তিক জীবই বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে ঃ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا – (البقرة : ٣١)

'প্রথম মানুষ আদমকে তিনি (আল্লাহ) সৃষ্টির প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় বস্তুর পরিচিতি অর্থাৎ জ্ঞান দান করেন।"

প্রথম মানুষকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বে সংঘটিতব্য সমস্ত মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান সম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছিলেন।

কুরআনের এ সৃষ্টিতত্ত্ব ও চিন্তাধারা ডারউইনের চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিরোধী। এই দুই চিন্তাধারার শুধু বিপরীতমুখিতাই বড় কথা নয় বরং দুই চিন্তাধারা দু'টি পৃথক জীবন ধারার ইংগিত দেয়। একদিকে ডারউইনবাদ ইংগিত দেয়

'সারভাইভ্যাল অব দি ফিটেস্ট' তথা দুনিয়ার জীবনে যোগ্যতমই প্রতিষ্ঠা লাভের ন্যায়সংগত অধিকার রাখে। কাজেই এখানে জোর যার মুল্লুক তার। আজকের পশ্চিমী জগত এ নীতির ভিত্তিতে এগিয়ে চলছে।

অন্যদিকে ইসলামী জীবন ধারায় মানবিক গুণাবলী বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এখানে শক্তিমান ও শক্তিহীন উভয় শ্রেণীরই সমান অধিকার স্বীকৃত। দুনিয়ায় বেঁচে থাকার, সম্মানজনক জীবন যাপন করার এবং উন্নতি ও প্রতিপত্তি লাভ করার অধিকার উভয়েরই সমান। প্রথম যে মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তার মধ্যে এই গুণাবলী যেমন পূর্ণাংগ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তেমনি পরবর্তীকালের প্রত্যেকটি সমাজে এবং আজকের সমাজেও এর মূল্য ও কদর ইসলামের দৃষ্টিতে সমান।

সৃষ্টি তত্ত্বের ডারউইনী ব্যাখ্যা ও কুরআনী ব্যাখ্যার কারণে আজকের পশ্চিমী জগতের প্রতিপত্তির যুগে বিশ্বের দুই পরাশক্তি সারা বিশ্বের মানুষকে নিজেদের পদানত ও গোলাম বানিয়ে রেখেছে এবং এটাকে তারা পরোক্ষভাবে নিজেদের যোগ্যতা ভিত্তিক অধিকার বলেই মনে করে। অথচ ইসলামের প্রতিপত্তির হাজার বছরেও মুসলমানরা দুনিয়ার কোথাও মানবতাকে এভাবে লাঞ্ছিত ও পরানুগ্রহ প্রার্থীতে পরিণত করেনি এবং গায়ের জোরে নিজেদের যোগ্যতার স্বীকৃতি আদায় করে নেয়নি।

আজ থেকে সোয়া'শো বছর আগে ইংরেজের গোলামীর প্রথম ফসল কাটতে গিয়ে এক দল মুসলমান তাদের এ চিরন্তন ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করার পথ ধরেছিল। সৃষ্টিতত্ত্বের ডারউইনী ব্যাখ্যাকে তারা হুবহু মেনে নিয়েছিল। এটা ছিল তাদের একটা ভুল। এ ভুলের কারণে পরবর্তীকালে আমাদের সমাজ কাঠামো ও ব্যক্তি মানসও প্রভাবিত হয়। কুরআনের একটি মৌলিক বিষয়কে ভুলের খাতায় লিখে নেবার পর আসলে ধীরে ধীরে তাদের কাছে সমগ্র কুরআনটিই ভুল ও সংশয়পূর্ণ হয়ে ওঠে। এ মানসিকতা আমাদের বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত সমাজে আজো পুরোদমে প্রচলিত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার সাঁইত্রিশ বছরেও আমরা এই দুষ্ট মানসিকতার প্রভাব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করিনি। আজো আমাদের পাঠ্য বইগুলোতে সৃষ্টি তত্ত্বের ডারউইনী ব্যাখ্যা সদম্ভে প্রতিষ্ঠিত। আগে এটা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পঠিত হতো এখন একে স্কুল পর্যায়ে নামিয়ে আনা হচ্ছে। অর্থাৎ তরল মতি ছেলে মেয়েদের মনে একটা মৌলিক আকিদা বিশ্বাসের মতো একে গেঁথে দেয়া হচ্ছে। এরপর তাদের মনে সৃষ্টি তত্ত্বের

কুরআনী ব্যাখ্যা কোথায় স্থান পাবে? কুরআনী ব্যাখ্যা, তার যৌক্তিকতা ও ফলাফলের জ্ঞান তাদের দান করা হচ্ছে না। ফলে তাদের মনে ধীরে ধীরে কুরআনের প্রতি আস্থাহীনতাই ফুটে উঠবে।

তাহলে এটাই কি আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ? এই লানত থেকে সমগ্র জাতিই আজ বাঁচতে চায়।

৪০
শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চাই

যতই দিন যাচ্ছে শিক্ষিত বখাটেদের সমস্যা ঘনীভূত হচ্ছে। পুলিশ বিভাগের রিপোর্ট হচ্ছে, গত কয়েক দিনে স্কুল ও কলেজ ছাত্রীদের উত্যক্ত করার প্রচেষ্টার সাথে জড়িত যে বিপুল সংখ্যক তরুণ ও উঠতি বখাটেদের তারা গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছেন তাদের অধিকাংশই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এরা তরুণ অভিযাত্রী, উঠতি রোমিওর দল। দেশের সিনেমা, রেডিও, টিভি এদের উৎসাহিত করছে, পথ দেখাচ্ছে। আর এদের উৎসাহের সবচেয়ে বড় যোগানদার ও সবচেয়ে বড় পথ প্রদর্শক হচ্ছে বর্তমান লক্ষহীন শিক্ষা ব্যবস্থা।

এই শিক্ষিত বখাটেদের সহায়ক শক্তি আরো অনেক আছে। সেগুলোকে আমরা আপাতত বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি না। কারণ এই শিক্ষা ব্যবস্থাটি যদি অদেরকে দেশের ভদ্র, সৎ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ দিতো তাহলে আজ তাদের এ দশা হতো না এবং দেশ ও দেশের মানুষ এ মারাত্মক সমস্যায় ভুগতো না। অভিভাবকরা তাদের জন্য অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কার্পণ্য করছেন না। প্রতিটি সাধারণ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সংসারে নিদারুণ অর্থ সংকটের মধ্যেও সন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বার্ষিক আয়ের বৃহৎ অংশটিই ব্যয়িত হচ্ছে। কিন্তু দেশের শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণ জাতির প্রতি বড়ই করুণা করে যে শিক্ষা ব্যবস্থা জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন তা জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের দিনের পর দিন কোথায় নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তা অবশ্যই তাদের একবার চিন্তা করার জন্য অনুরোধ করছি। তারা যদি বলেন, এ শিক্ষা ব্যবস্থার কোন দোষ নেই, আর্থ-সামাজিক পরিবেশ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবস্থাই প্রধানত এ জন্য দায়ী। তাহলে সংগতভাবেই সেখানে প্রশ্ন ওঠে, এ আর্থ-সামাজিক পরিবেশ ও অন্যান্য অবস্থার সৃষ্টিতে কি শিক্ষা ব্যবস্থা বৃহত্তম অংশীদার নয়? ধরুন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যদি হুবহু পাশ্চাত্য ধাঁচের না হতো তাহলে কি আমাদের দেশে পাশ্চাত্য ধরনের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ গড়ে উঠতো? তাহলেও কি পাশ্চাত্য সমাজের সমস্ত কলুষতাই আমাদের সমাজে বিরাজ করতো? এগুলো কি হঠাৎ একদিনের সৃষ্টি? এগুলোর পেছনে কি এক ধরনের

জীবনাচরণ ও জীবন চিন্তা নেই? এখানে কি জীবনকে একটা বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হয় না? এ চিন্তা, এ দৃষ্টিভংগী কোথা থেকে পাওয়া?

মানুষ সম্পর্কে যদি এ চিন্তা বদ্ধমূল করে দেয়া হয় যে, মানুষের সৃষ্টি বানর ও পশু থেকে (যার পেছনে আসলে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নেই), তাহলে মানুষ নিজের মধ্যে বানর ও পশু প্রবৃত্তির লালনে তৎপর হলে সে ক্ষেত্রে মানুষকে কি দোষী সাব্যস্ত করা যায়? মানুষকে যদি এ কথা শেখানো হয় যে, সারভাইভেল অব দি ফিটেস্ট হচ্ছে এ দুনিয়ায় মানুষের এগিয়ে চলার ও বেঁচে থাকার মূলনীতি, তাহলে এ ক্ষেত্রে বলবান যেনতেনভাবে তার বল প্রয়োগ করলে এবং অন্যায়ভাবে নিজের অধিকার ও পাওনা গণ্ডার চাইতে অনেক বেশী ছিনিয়ে নিয়ে গেলে তাকে অন্যায় বলা যাবে কোন্ দৃষ্টিতে? আর দুর্বলের মার খাওয়াকে ন্যায় সংগত বলা হবে না কেন?

এগুলো এবং এ ধরনের হাজারো অসংগত ও অসংগতিপূর্ণ জীবন চিন্তা কি আমরা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে এ দেশে আমদানী করছি না? বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক ও টেকনলজির কথা বাদ দিলাম। তবুও এর পেছনেও একটা জীবনদর্শন থাকে। সেটিই একে নিয়ন্ত্রিত করে। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য মানবতার কল্যাণ না ধ্বংস? সংকীর্ণ স্বার্থ-চিন্তা না ব্যাপক কল্যাণাকাংখা? বিজ্ঞানের আগে এ বিষয়টি রয়ে গেছে। যদি সভ্যতার নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক হাতটি ন্যায়নিষ্ঠ ও যথার্থই দায়িত্বশীল হয়, তাহলে বিজ্ঞানের শক্তি মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত হবেই।

বিজ্ঞান ও টেকনলজি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে যেসব চিন্তা আমরা পশ্চিমের কারখানাগুলো থেকে এনে হুবহু আমাদের দেশে চালু করার চেষ্টা করেছি, সে সম্পর্কে কি আমাদের বিশেষজ্ঞদের কিছুই ভেবে দেখার নেই? পাশ্চাত্য চিন্তার সংস্পর্শে আসার দু'শো সোয়া দু'শো বছর পরও কি তারা এখনো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন? তাঁরা যে গাছগুলো লাগিয়েছিলেন তার ফল কেমন তা তো আর এখন কারো অজানা নেই। সবাই এখন হাড়ে হাড়ে তার মজা টের পাচ্ছেন।

আমরা জানি, একটা জীবিত জাতি বাইর থেকে কিছু গ্রহণ করার সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে। তার প্রত্যেকটি দিক যাচাই-বাছাই করে তার কিছু অংশ গ্রহণ করা হলে তাকে নিজের মতো করে গ্রহণ করে। অন্যেরা তাকে যেভাবে গ্রহণ করেছে আমাকে যে সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে এমনতো কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ইসলামী সভ্যতার উন্নতির যুগে ইউরোপ

ইসলামের আইন–কানুন এবং জ্ঞান–বিজ্ঞানের আরো বিভিন্ন অংশের যা কিছু গ্রহণ করেছে তাকে ইসলামী আকীদা–বিশ্বাস ও ইসলামী প্রেক্ষাপটসহ গ্রহণ করেনি। তারা নিজেদের প্রয়োজন মতো গ্রহণ করেছে এবং নিজেদের আঙ্গিনায় নিজেদের একান্ত পরিবেশে তাকে লালন করেছে। ইউরোপ থেকে গ্রহণ করার সময় আমরা যদি সতর্কতার পরিচয় দিতে না পেরে থাকি এবং নিজেদের মতো করে ইউরোপের শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে থাকি তাহলে এটিই কি আমাদের চিরকালীন আদর্শ হয়ে থাকবে? আমরা এক'শো সোয়া'শো বছর আগে যেমন অক্ষম ছিলাম আজো কি তেমনি অক্ষম? স্বাধীনতা কি আমাদের স্বাধীনভাবে পরানুবৃত্তির প্রেরণা যোগায়? আমাদের নিজস্ব সত্তাকে স্বাধীনভাবে পরের পায়ে বিকিয়ে দেবার জন্যই কি আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি? আমরা কবে নিজেদের সম্পর্কে সজাগ হবো? কবে আমরা নিজেদেরকে মর্যাদা দিতে শিখবো?

আমাদের জাতীয় শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি। জাতির ভবিষ্যত বংশধরদের গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের অবশ্যি বাস্তববাদী হতে হবে। শুধু গুটিকয় বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা দপ্তর ও পরিদপ্তর জাতির ভবিষ্যত গড়ে তুলবে না। শিক্ষার ভিত্ যদি মজবুত না হয়, শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলো যদি জাতীয় আশা–আকাংখা পূরণে সক্ষম না হয় এবং জাতীয় ভাবধারা ও আদর্শ অনুযায়ী জাতীয় চরিত্র গঠনে শিক্ষা ব্যবস্থা যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে সে শিক্ষা জাতির জন্য ধ্বংসের পসরা বহন করে আনা ছাড়া আর কিইবা করতে পারে!

জাতীয় শিক্ষানীতি

আমাদের জাতীয় শিক্ষা এমন এক দূর দিগন্ত যার সীমান্তের ঠাঁই মেলা বড়ই কঠিন মনে হয়। নয়তো বিগত পঁয়ত্রিশ বছর থেকে এত প্রচেষ্টা, সাধনা, চিন্তা-গবেষণা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কমিশন, এজিটেশন, খুনাখুনি এবং আরো বহু কিছুর পরও একটা সঠিক ও সুষ্ঠু জাতীয় শিক্ষানীতি গড়ে তোলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হলো না কেন? এমনকি নতুন করে স্বাধীনতা লাভের দশ বছর পর আজ আবার নতুন করে শিক্ষানীতি গড়ে তোলার প্রশ্ন উঠেছে। দশ বছর পর এই প্রশ্ন আবার নতুন করে দেখা দেবে না তাই বা কে বলতে পারে।*

জাতীয় শিক্ষানীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটা একটা মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ প্রশ্নের মীমাংসার ওপর শিক্ষানীতির অনেক কিছু নির্ভর করে। কেন আমরা কোন সঠিক পথ গড়ে তুলতে পারিনি? আর কেনই বা আমাদের বারবার পথ পালটাতে হয়? যে কোন জাতীয় শিক্ষানীতি ও জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই জাতীয় আদর্শ, ভাবধারা, আশা-আকাংখা ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। অন্যথায় তাকে সব সময় এভাবে পথ পালটাতে হবে। আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি গড়ে তোলার প্রশ্নে ইতিপূর্বে এ প্রশ্নগুলোর প্রতি কমই দৃষ্টি দেয়া হয়েছিল। ইংরেজরা আমাদের গোলামীতে আরো পাকাপোক্ত করার এবং সুযোগ্য গোলামে পরিণত করার জন্য এদেশে একটা শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিল। তার পাশাপাশি বৃহত্তর জাতীয় ক্ষতি থেকে আংশিকভাবে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুসলমানদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় জাগতিক প্রয়োজনকে সম্পূর্ণরূপে পাশ কাটিয়ে সীমিত পরিসরে একটা ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ইংরেজকে বিতাড়িত করার পঁয়ত্রিশ বছর পর আজো সেই শিক্ষা ব্যবস্থা হুবহু চালু রয়েছে। একটা স্বাধীন ও আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমানের অধিকারী জাতির উপযোগী করে তাকে গড়ে তোলা হয়নি। বারবার এতে জোড়াতালি দেবার বিভিন্ন চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাতে এর আসল অবয়বে ও চরিত্রে কোন পার্থক্য দেখা দেয়নি।

বর্তমান সরকার একটা সংক্ষিপ্ত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করছেন। তার লক্ষ ঘোষণা করা হয়েছে এদেশের জনগণকে কাজে কর্মে দক্ষ নাগরিক হিসেবে

* ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

তৈরী করা। নাগরিকদের মধ্যে কর্মদক্ষতা সৃষ্টি করা শিক্ষার একটা বড় উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই কিন্তু তার চেয়েও বড় উদ্দেশ্য একটা রয়েছে। দেশের জনগণকে যদি সৎ নাগরিক হিসেবে তৈরী না করা হয় এবং তাদের সততাকে দক্ষতার পরিচালকে পরিণত না করা হয় তাহলে এই শিক্ষা জনগণের নিজেদের দেশের ও বিশ্ববাসীর কোন কল্যাণ সাধনে সক্ষম হবে না। এভাবে কয়েকটা দক্ষ ও উপার্জনক্ষম হাত তৈরী হবে সন্দেহ নেই কিন্তু সেই হাত ডাকাতের ও আত্মসাৎকারীর হাতে পরিণত হবে, যদি তার ওপর সততা ও নৈতিকতার পাহারা বসানো না হয়। কিন্তু শিক্ষানীতির গাইড লাইন হিসেবে এ ধরনের কোন মূলনীতি গৃহীত হয়নি বরং এতে বলা হয়েছে ঃ এমন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে যা ধনী–দরিদ্র, শিশু–যুব, ধর্মীয়–অধর্মীয় নির্বিশেষে সবার উপযোগী হবে। একটি শিশুর ধর্মীয়–অধর্মীয় হবার প্রশ্নই ওঠে না। শিক্ষাই তাকে ধর্মীয়–অধর্মীয় বানাবে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে এমন শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হচ্ছে যা একেবারেই নৈর্ব্যক্তিক ও নির্গমন সম্পন্ন। এ ধরনের শিক্ষানীতি একদল সুবিধাবাদী মানুষ সৃষ্টি করতে পারে, কোন দায়িত্বশীল নাগরিক এবং দেশ ও জনগণের সেবায় উৎসর্গীত কর্মী বাহিনী সৃষ্টি এর সামর্থের বাইরে। চতুরদিকে অমৈত্রীসুলভ জনগোষ্ঠী পরিবেষ্টিত সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বিশ্বের একটি দরিদ্রতম দেশের জন্য এহেন কর্মী বাহিনী কতটুকু উপযোগী তা অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতির আরো দু'টি বৈশিষ্ট হচ্ছে, শিক্ষাকে চারটি স্তরে বিভক্ত করা এবং প্রথম শ্রেণী থেকে আরবী ও ২য় শ্রেণী থেকে ইংরেজী বাধ্যতামূলক করা। চারটি স্তর হচ্ছে প্রাথমিক ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত, প্রস্তুতি ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত, মাধ্যমিক ৯ম থেকে ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত এবং উচ্চতর শিক্ষা। প্রাথমিক ও প্রস্তুতি পর্বের শিক্ষার অন্তরভুক্ত থাকবে সাধারণ বিষয়াবলী। মাধ্যমিক পর্বের শেষ দু'বর্ষে বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের নার্সিং, টেকনিক্যাল, কমার্স, প্রাইমারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সাধারণ বিজ্ঞান ও আর্টস–এর মধ্য থেকে যে কোন একটি বাছাই করে নিতে হবে। আর উচ্চতর শিক্ষা সীমিত হবে। এ জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষার্থী ছাড়া কাউকে সুযোগ দেওয়া হবে না।

শিক্ষার এই স্তর বিন্যাস তখনই কোন সুফল বয়ে আনতে পারবে যখন এর প্রত্যেকটি স্তর একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ মর্যাদা ও মূল্যের অধিকারী হবে। এর প্রত্যেকটি স্তরে যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ঝরে পড়বে তারা যদি শিক্ষালাভের

পরও জীবনের অর্থ খুঁজে না পায় এবং জীবন সংগ্রামে নিজেদেরকে একান্ত অসহায় মনে করে, তাহলে এ শিক্ষানীতিকে সফল বলা কোনক্রমেই সম্ভব হবে না। আর উচ্চ শিক্ষা তো একটি রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। কাজেই শুধু সামর্থবানরাই উচ্চ শিক্ষা লাভের অধিকারী হলে চলবে না, কোন একজন যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীও যেন এ থেকে বঞ্চিত না হয় রাষ্ট্রকে এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

একটি পর্যায়ে সীমিত হারে ইংরেজী শিক্ষার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। কিন্তু দেশের নয় কোটি মানুষকে ইংরেজী শেখাবার যৌক্তিকতা কোথায় (যখন শিক্ষিতের হার হবে শতকরা ১০০ তখন নয় কোটি লোকই ইংরেজী শিখবে)? যে লাখো লাখো বা কোটি কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন প্রাথমিক পর্বের পর শেষ হয়ে গেলো, তারা কেন পাঁচ বছর ধরে ইংরেজীর পেছনে তাদের পাঠ্য জীবনের সিংহ ভাগ সময় ব্যয় করলো? যে লাখো লাখো বা কোটি কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন প্রস্তুতি পর্বের পর শেষ হয়ে গেলো তারাই বা দেশের কোন্ স্বার্থটা উদ্ধার করার জন্য ইংরেজী পড়লো? আর মাধ্যমিক পর্বের সমস্ত বই কি বাংলায় তৈরী করে (আমাদের জানা মতে এখনই সমস্ত বই–ই বাংলায় হয়ে গেছে) সেখানে ইংরেজীর অপরিহার্যতা খতম করা যায় না? বাকি রইলো উচ্চতর পর্যায়। সেখানেও ইংরেজীর অপরিহার্যতা স্বীকার করতে আমরা প্রস্তুত নই। সেখানেও এখনো যে বইগুলো বাংলায় হয়নি সেগুলো বাংলায় করে নেয়া কঠিন হতে পারে কিন্তু অসম্ভব মোটেই নয়। আর সায়েন্স, টেকনোলজি ও উচ্চতর ট্রেড ও কমার্সের জন্য যে সব ট্যালেন্টেড ছাত্রদের ইংরেজী অবশ্যি শিখতে হবে তাদের ইংরেজী শেখার জন্য ছলিমদ্দি কলিমদ্দির মতো ১২ বছর লাগার কথা নয়। ছলিমদ্দি কলিমদ্দির জন্য তৈরী এই বারো বছরের কোর্স তারা দু'বছরেই সারতে পারে। এরা কি জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে গিয়ে ২ বছরের মধ্যে ল্যাংগুয়েজ কোর্স সেরে সে দেশীয় ভাষায় পরীক্ষা দিয়ে সফলভাবে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে আসে না? কেবল মাত্র কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর মুখ চেয়ে দেশের কোটি কোটি লোকের ইংরেজী শেখার যৌক্তিকতা কোথায়? এই ইংরেজীর পেছনে একটা ছাত্রের ছাত্র জীবনের অর্ধেক সময়ই ব্যয় হয়ে যায়। তাছাড়া গত ১০০ বছর ধরে ইংরেজীকে নম্বর ওয়ান গুরুত্ব দিয়ে শিখে আমরা কতটুকু ইংরেজী শিখতে পেরেছি তাও বিচার্য। দুনিয়ার আরো বহু দেশে ইংরেজী নম্বর ওয়ান গুরুত্ব পায়নি। তারা কি আধুনিক বিশ্বে এগিয়ে যায়নি? সার কথা হচ্ছে, এক সময় ইংরেজ যদি আমাদের প্রভু হয়ে না আসতো তাহলে কি আমরা আজো

এত গুরুত্ব দিয়ে চৌদ্দ গোষ্ঠী মিলে ইংরেজী শিখতাম? ভাষা শিক্ষার অহেতুক চাপ থেকে শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যি বাঁচাতে হবে।

রইলো প্রথম শ্রেণী থেকে আরবী শিক্ষা। এখনো আমাদের দেশে প্রথম শ্রেণীরও আগে থেকে আরবী শিক্ষার প্রচলন রয়েছে। বহু স্থানে ছেলেমেয়েরা প্রথমে মসজিদে মকতবে যায়। আবার অনেকে স্কুলের সাথে সাথে গৃহে আরবী শিক্ষক রেখে ছেলে-মেয়েদের আরবী শেখায়। আরবী শেখা আমাদের জন্য কুরআন হাদীস পড়া এবং ইসলামের বিভিন্ন অনুশাসন মেনে চলার জন্য অপরিহার্য বিবেচিত হয়েছে। আরবী শেখার রেওয়াজ গত ৮'শো বছর থেকে এ দেশে প্রচলিত রয়েছে এবং যতদিন মুসলমান থাকবে ততদিন এ রেওয়াজও থাকবে। একে ইংরেজীর বাড়তি চাপের সমপর্যায়ে ফেলা যেতে পারে না।

তবে আরবী শেখার দু'টো দিক রয়েছে। একটা হচ্ছে কুরআন হাদীস পড়া ও নিছক ভাষা শিক্ষা আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে ইসলামী আকায়েদ, শিক্ষা ও অনুশাসন সম্পর্কে জানা। প্রথমটার প্রথমাংশটি লাভের জন্য প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত আরবী বাধ্যতামূলক থাকা উচিত এবং দ্বিতীয়াংশটি লাভের জন্য নির্দিষ্ট পর্যায়ের কোর্স থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রথমটার মাধ্যমে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটা অর্থাৎ ইসলামী আকায়েদ, শিক্ষা ও অনুশাসন সম্পর্কে জানা বর্তমান অবস্থায় মোটেই সহজ সাধ্য নয়। এবং এ ধরনের কোন কথা বলা নিছক এক ধরনের ছল চাতুরী ছাড়া আর কিছুই নয়। এ জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার প্রয়োজন। তবে বর্তমান পর্যায়ে এ উদ্দেশ্যে আবশ্যি বাংলা মাধ্যম ব্যবহার করা যায়। এ জন্য প্রাথমিক পর্ব থেকে উচ্চতর শিক্ষা স্তর পর্যন্ত সর্বত্র এতদসংশ্লিষ্ট ইসলামিয়াত বিষয়টি বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

একটা দেশের শিক্ষানীতি প্রণীত হতে হবে সে দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, অর্থনৈতিক লক্ষ ও সামর্থ এবং সর্বোপরি জনগণের নৈতিক ও জাগতিক প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে। শিক্ষা এমন একটা মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ব্যাপারে কোন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করার আগে যথার্থ পর্যালোচনার মাধ্যমে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন। কিন্তু সরকারী শিক্ষানীতির যে সংক্ষিপ্ত সার আমাদের সামনে এসেছে তা থেকে এর বিস্তারিত চেহারা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তাই আমরা আশা করবো সরকার বিভিন্ন পর্যালোচনার মাধ্যমে গৃহীত বিস্তারিত শিক্ষানীতি শীঘ্রই জাতির সামনে পেশ করবেন।

মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় উপেক্ষার যন্ত্রণা

বিগত সাড়ে তিন দশক থেকে এ যন্ত্রণা ভুগতে হচ্ছে নিজেদের হাতে। ইংরেজ আমলে এক'শো বছরে যে ভোগান্তি ছিল তা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। বরং ইংরেজ যদি এ শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে এর যথার্থ প্রাণশক্তি সহকারে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করতো তাহলে ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক মনে হতো না। যেখানে ইংরেজ তার পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে একদিকে ফারসীকে বিতাড়িত করলো, মোগল আমলে প্রতিষ্ঠিত দেশের সমস্ত শিক্ষায়তনে ভাতা বন্ধ করে দিল এবং অন্যদিকে দেশের স্থানে স্থানে ইংরেজী স্কুল কায়েম করে ইংরেজী ভাষাকে বাধ্যতামূলক করলো, সেখানে মাদরাসা শিক্ষা বিস্তারে ইংরেজের আন্তরিকতা নিশ্চয়ই সন্দেহাতীত থাকতে পারে না। এসব দিক বিবেচনা করেই উপমহাদেশের একদল সংগ্রামী আলেম সরকারের সহায়তা ছাড়াই বরং সরকারী ধরা ছোঁয়ার বাইরে এক ধরনের মাদরাসা শিক্ষার জাল বিস্তার করেন।

তবুও অনেকটা বেকায়দায় পড়েই ইংরেজকে মাদ্রাসা শিক্ষার কিছুটা পৃষ্ঠপোষকতা করতে হয। তাই একশো বছর ধরে এ শিক্ষা ব্যবস্থাটি শুধু উপেক্ষার যন্ত্রণায় ভুগেছে। মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমে নিছক ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের উপযোগী কিছু সংখ্যক উলামা তৈরী ছাড়া মুসলিম মিল্লাতের স্বার্থানুকূল্যে দ্বিতীয় কোন লক্ষ থাকার কোন প্রয়োজনই ইংরেজের থাকার কথা নয়। কিন্তু ইংরেজ উত্তরকালে এ সম্পর্কে জাতীয় সরকারের লক্ষ ভিন্নতর হবে বলে আশা করা গিয়েছিল। মুসলমানদের স্বাধীন সরকার, বিশেষ করে ইসলামের নামে যে দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সেখানে স্বাভাবিকভাবে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাইতো হবে মুখ্য বিষয়। কাজেই দুই শিক্ষা ব্যবস্থাকে এক তথা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টাই চলবে সেখানে, এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু পাকিস্তান আমলের সরকারগুলোর সেক্যুলার চেহারা তাদের থলের বিড়াল বের করে দিতে বেশী দেরী করেনি। মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে তারা একদল ধর্মীয় লোক তৈরীর উপাদান যোগান দেয়ার একটি বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এ শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের নামে আধুনিক তথা ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একে বিলীন করে দেবার জন্য তাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা

আমাদের সামনে রয়েছে। স্বাধীনতার পর গত দশ বছরেও এই একই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

সম্প্রতি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড ১৯৮৫–৮৬ সালের জন্য যে নতুন সিলেবাস জারি করেছেন তা এই শিক্ষা ব্যবস্থাটির পরিসর আরো সংকীর্ণ করার এবং এর একাংশকে আধুনিক শিক্ষার মধ্যে বিলীন করে দেবার খায়েশের সারাংশ ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না।

আমাদের মতে এ শিক্ষা ব্যবস্থাটির প্রধানতম ত্রুটি হচ্ছে, আজ পর্যন্ত এর কোন চূড়ান্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ স্থিরিকৃত হয়নি। উদ্দেশ্য ও লক্ষ স্থিরিকৃত না থাকার কারণে এর মধ্যে আজ পর্যন্ত যতবার পরিবর্তনের হাওয়া বয়েছে প্রতিবারই আধুনিক শিক্ষার লক্ষের দিকে এর অগ্রগতি দেখা গেছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে অবশেষে একদিন অলিখিত ভাবেই আধুনিক শিক্ষার লক্ষই এর যথার্থ লক্ষে পরিণত হবে। সেদিন আধুনিক শিক্ষার মধ্যে এর বিলুপ্তি হবে স্বাভাবিক।

প্রশ্ন হচ্ছে ইংরেজ আমলে এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন হলো কেন এবং বর্তমানে এর চেহারা কেমন হওয়া উচিত? ইংরেজ ঔপনিবেশিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। সে শিক্ষা ব্যবস্থায় মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন পূরণের কোন অবকাশই ছিল না। ফলে নিজেদের পৃথক জাতীয় সত্তার চাহিদা পূরণের জন্য মুসলমানদের নিজস্ব পরিসরে একটি ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করতে হয়। প্রাক ইংরেজ আমলে যখন এখানে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল সে আমলের সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু অংশ এই ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অংগীভূত হয়েছে। একদিকে রয়েছে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, যার সামনে বৈষয়িক লক্ষ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন লক্ষ নেই, এমন কি জাতীয় চরিত্র গঠনের কোন উদ্দেশ্যই তার নেই আর অন্য দিকে মাদরাসা শিক্ষার নামে ধর্মীয় শিক্ষার ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা। এই ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার সাথে বৈষয়িক শিক্ষার কিছু অংশ জুড়ে দিলে তার ত্রুটি দূর হবে না বরং এর ফলে তার পতন ত্বরান্বিত হবে।

বাংলাদেশের জাতীয় সত্তার প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে এর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা। এ দেশের স্বাধীনতা ও এর পৃথক জাতীয় সত্তাকে টিকিয়ে রাখতে হলে এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার লালন অপরিহার্য। জাতীয় সত্তার লালনের ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। কাজেই বাংলাদেশের মুসলিম সত্তাকে টিকিয়ে রাখতে হলে বাংলাদেশকে

অবশ্যি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে ফিরে আসতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে এই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যি ভিত্তির কাজ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে গলা টিপে হত্যা না করে তাকে জাতীয় ক্ষেত্রে কাজে লাগানোই জাতীয় সরকারের লক্ষ হওয়া উচিত। যতদিন জাতীয় সরকারের পক্ষে এই শিক্ষা ব্যবস্থাটিকে কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না ততদিন একে এর যথার্থ প্রাণশক্তি সহকারে টিকিয়ে রাখা এবং নিজস্ব পরিসরে এর উন্নতি ও অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করা দেশপ্রেমিক জাতীয় সরকারের দায়িত্ব বলে আমরা মনে করি।

এ ক্ষেত্রে মাদরাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ হবে ঃ এক, মুসলমানদের ঈমান ও আকীদা-বিশ্বাসকে শক্তিশালী ও মজবুত করা। ইসলাম বিরোধী যাবতীয় বিশ্বাস ও চিন্তার প্রাধান্য থেকে তাদের মন মস্তিষ্ককে মুক্ত করে ইসলামী চিন্তার প্রাধান্যকে সবক্ষেত্রে প্রতষ্ঠিত করা। দুই, তাদের মধ্যে ইসলামী দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করা। দুনিয়ার প্রত্যেকটি বিষয় ও ঘটনাকে যেন তারা আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ, বিধান, উদ্দেশ্য ও ইচ্ছার আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়। তিন, তাদের মধ্যে ইসলামের চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টি করা। কুরআন যে ধরনের মানুষ সৃষ্টি করতে চায় এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সেই ধরনের চারিত্রিক গুণাবলী সম্পন্ন মানুষ গড়ে উঠবে। চার, এদের মধ্যে হালাল ও ন্যায়সংগত জীবিকা অর্জনের যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ স্থিরীকৃত হবার পর মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাস পুনরগঠিত হওয়া উচিত। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ হিসেবে একে গ্রহণ করতে হবে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা হবে জাতীয় আশা-আকাংখার উল্লেখযোগ্য প্রতীক। কারণ যতদিন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা হবে না ততদিন তা আমাদের জাতীয় আশা-আকাংখা পূরণে সক্ষম হবে না। ততদিন মাদরাসা শিক্ষাকে পরিপূরক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে। অন্যথায় স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কোন ক্রমেই সম্ভবপর হবে না।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কি এগিয়ে যাবে?

বাংলাদেশের মুসলমানরা দীর্ঘকাল থেকে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের আকাংখা পোষণ করে আসছে। এ জন্য বিগত দু'দশক থেকে চলছে তাদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। আশির দশকে এসে তাদের এ সংগ্রাম কিছুটা সাফল্যের মুখ দেখলেও এবং বর্তমানে ঢাকার অদূরে টংগীতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে কয়েকটা দালান কোঠা তৈরী হয়ে গেলেও ইসলামী শিক্ষার মৌল কাঠামো ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত অবয়ব সৃষ্টির জন্য মনে হয় তাদের আরো সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

একটা মুসলিম দেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ বছরের সংগ্রামই একথা প্রমাণ করে যে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রসংগটাই শাসক, প্রশাসক, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞ মহলে মোটেই কোন সুস্পষ্ট বিষয় নয়। আমরা মনে করি মূলত অস্পষ্ট ধারণাই এ বিষয়টা দীর্ঘায়িত করার জন্য দায়ী। তবে এর পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য–তা কোন পর্যায়ে গিয়ে সৎ নাও থাকতে পারে– যে একেবারেই নেই তাই বা কেমন করে বলা যায়।

টংগীর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকেই যে পংগুত্ব অর্জন করতে চলেছে সংবাদপত্রের গত কয়েকদিনের রিপোর্ট ও মন্তব্য থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য যতটুকুই বা অনুকূল কারিকুলাম ও সিলেবাস তৈরী করা হয়েছিল তা–ও কার্যকর করা হচ্ছে না। মূল পরিকল্পনা থেকে সরে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে শুনা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়কে সীমিত করে তাকে বলতে গেলে প্রচলিত মাদরাসায় পরিণত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এ ধরনের আশংকা ও মন্তব্য আমাদের কাছে মোটেই অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। মনে হয় ইসলামী জনতার চাপে বাধ্য হয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে তিতো বড়ি গিলে ফেলা হয়েছিল তা এখন একদম উগ্‌রে না ফেলে অকার্যকর করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দেশের শাসকগোষ্ঠী ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞ মহলের এ ব্যাপারে কোন বিশেষ চিন্তা–ভাবনা নেই। তারা মনে করছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টা মাদরাসা শিক্ষারই একটা প্রসংগ, কাজেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে আরেকটু

উন্নত পর্যায়ের একটা মাদরাসা কায়েম করলেই তো হয়ে যায়। আমরা মনে করি তারা যদি এ ধরনের কোন বিভ্রান্তির শিকার হয়ে থাকেন তাহলে তা দূর হয়ে যাওয়া উচিত। এদেশের ইসলামী জনতা নিছক একটা উন্নত পর্যায়ের মাদরাসা কায়েম করার জন্য গত বিশ বছর ধরে সংগ্রাম করে আসেনি। তাদের সংগ্রাম ছিল একটা পূর্ণাংগ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এই লক্ষ অর্জনের পথে একটা পদক্ষেপ। এ পদক্ষেপটা যদি সঠিক না হয় তাহলে এর মাধ্যমে এ লক্ষ অর্জিত হবে না।

প্রশ্ন হচ্ছে একটা পূর্ণাংগ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার দাবী কেন? বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা বা এর সংশোধিত রূপই কি জাতীয় প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট নয়? আসলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের জাতীয় আশা-আকাংখা ও প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। বিগত কয়েক দশকে জাতীয় চরিত্র গঠনে ও জাতির আশা-আকাংখা পূরণে এই শিক্ষা ব্যবস্থা কোন অবদান রাখতে পারেনি। বরং এর ব্যর্থতা প্রতি পদে পদে ফুটে উঠেছে। আজ শিক্ষাংগন থেকে শুরু করে আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের ব্যাপক ছায়াপাত ঘটেছে। এর পেছনে শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতাই সবচেয়ে বেশী উপাদান যুগিয়েছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় চরিত্র গঠনে সাহায্য করছে না। এ শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় আশা-আকাংখা অনুযায়ী দেশ উন্নয়নে সহায়তা দান করতে ব্যর্থ হচ্ছে। পশ্চিমের যে শিক্ষা ব্যবস্থার নকলনবিসী আমরা করে যাচ্ছি পশ্চিমে তার উন্নততর কাঠামোরই বিকাশ ঘটেছে। অথচ আজ সেই পশ্চিমের কী দুরবস্থা। এ শিক্ষা ব্যবস্থা পশ্চিমে আজ শুধু ধ্বংসই ডেকে আনছে। সম্প্রতি আমেরিকা থেকে প্রকাশিত আমেরিকান এডুকেশন পত্রিকার এক সংখ্যায় এরি চিত্র ফুটে উঠেছে। এই পত্রিকায় মিঃ হলাণ্ডের একটি মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। মিঃ হলাণ্ড তার প্রবন্ধে ১৯৭৮ সালের একটি রিপোর্টের বরাত দিয়ে বলেছেন, "আমেরিকার মাধ্যমিক স্কুলগুলোয় প্রতি মাসে ৩০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী অপরাধমূলক কার্যকলাপ করে। আড়াই লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী প্রতি মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুরি ও ডাকাতির শিকার হয়। প্রায় একই পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী মারপিট ও সংঘর্ষে হতাহত হয়। শিক্ষকদের অবস্থাও ভিন্নতর নয়। প্রতি মাসে ২৫ হাজার শিক্ষককে মারপিটের ভয় দেখানো হয়। এক হাজার শিক্ষককে এত বেশী মারধর করা হয় যার ফলে তাদের যথারীতি ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকতে হয়। ...... ১৯৮৩ সালের রিপোর্টে এই পরিসংখ্যানকে আরো কয়েকগুণ বেশী দেখানো হয়েছে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক স্নায়বিক চাপ, উচ্চ রক্ত চাপ, প্রেসার আলসার ও শূলবেদনা রোগে ভুগছেন। এ অবস্থায়

অধিকাংশ শিক্ষক ছাত্রদের সাথে সমঝোতা করে নেন। ফলে তারা ক্লাসে পড়ার ওপর বেশী জোর দেন না এবং ছাত্রদের হোম ওয়ার্কের জন্যও চাপ দেন না।"

প্রবন্ধকার মিঃ হলাও শিক্ষাংগনের এ অবস্থাকে অত্যন্ত ভয়াবহ বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের কাছে এর মোকাবিলা করার জন্য আকুল আবেদন জানিয়েছেন। কারণ তার মতে এর ফলে সমস্ত মার্কিন জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সমগ্র জাতির ভবিষ্যত বিপদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টির কারণ নির্দেশ করে তিনি বলেছেন ঃ "আমরা শিক্ষার নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যমান ও মূল্যবোধগুলোকে উপেক্ষা করে এসেছি। শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্যকে আমরা কোন গুরুত্বই দেইনি। শিক্ষা যাতে মানুষের উন্নত মানবিক প্রবণতাগুলোকে বিকশিত করে আমাদের সেদিকে নজর দেয়া উচিত ছিল। ছাত্রদের জানতে হবে তাদের কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে। শিক্ষার সাথে সাথে তাদের সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নৈতিক চরিত্র গঠনের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। এখান থেকে যেসব ছাত্র পাঠ শেষ করে বের হবে তারা হবে দেশের সৎ, ভদ্র ও দায়িত্বশীল নাগরিক। তাদের মধ্যে থাকবে নৈতিক মূল্যবোধগুলোর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের প্রবণতা, তারা হবে সততা, নেকী ও জ্ঞানের আধার। নিজেদের সৎবৃত্তির জন্য তারা গর্ব অনুভব করবে। সৎবৃত্তি ও সৎপ্রবণতা নিজে নিজেই সৃষ্টি হয় না। বরং এজন্য ছেলে-মেয়েদের প্রশিক্ষণ দেয়া এবং তাদের নিয়ম-শৃংখলার পাবন্দ করার প্রয়োজন হয়।"

আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাটা আমরা যেসব দেশ থেকে ধার করে এনেছি এ হচ্ছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত দেশটির অবস্থা। এ শিক্ষা ব্যবস্থা সেসব দেশে যে অকল্যাণ ডেকে এনেছে এবং তাদের ভবিষ্যত বংশধরদেরকে যেভাবে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে তা থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য চিন্তাভাবনা তারা সর্বত্রই শুরু করে দিয়েছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করে এর মধ্যে নৈতিক শিক্ষাকে মৌলিক গুরুত্ব দান করার বিষয়টিও তারা সামনে আনছে। অথচ শুধুমাত্র এতটুকুতেই তাদের এ শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের ও সারা বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণকর হয়ে উঠবে না।

আসল ব্যাপার হচ্ছে, যে জীবন দর্শনে তারা বিশ্বাসী সে জীবন দর্শনই তাদের জন্য কোন কল্যাণ বহন করতে অক্ষম। তাদের সে জীবন দর্শনে শুধুমাত্র কতিপয় নৈতিক দিকেরই অভাব রয়েছে তাই নয় বরং সেখানে এমন

কোন মৌল আকীদা বিশ্বাস নেই যা তাদের সকল প্রকার চিন্তা-ভাবনাকে সংশয়মুক্ত করতে পারে। পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ভিত যে খৃষ্টীয় জীবন বোধের ওপর গড়ে উঠেছিল বর্তমানে সেখান থেকেও তারা সরে এসেছে। বর্তমানে তারা এমন সব মূল্যবোধে বিশ্বাসী যার নীচে কোন শক্তিশালী বিশ্বাসের ভিত নেই। এ বিশ্বাসগুলো সমুদ্রের ওপর ভেসে থাকা জাহাজের মতো। বড় বড় তরংগের আঘাতে তা স্থানচ্যুত হতে থাকে। ফলে এর মাধ্যমে একটা জাতির ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য কোন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় না। পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে এই দুর্বলতারই শিকার হয়েছে। তাই পাশ্চাত্য জগতের সমগ্র শিক্ষাংগন জুড়ে আজ চলছে নৈরাজ্য, হতাশা অনৈতিকতা ও অমানুষিকতার দাপাদাপি।

আমাদের দেশে এই শিক্ষা ব্যবস্থার আমদানীর ফলে এখানেও এর বিষময় প্রভাব সম্পর্কে অনবহিত নন এমন একজন লোকের নাম পাওয়া যাবে না। আজকে আমাদের দেশে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে অরাজকতা ও অনৈতিকতার সয়লাব বয়ে চলছে, যার ফলে আমাদের জাতীয় জীবন পংগুত্ব বরণ করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা থেকে বাঁচার উপায় কি? এই বাঁচার একটি উপায় হিসেবেই এ দেশের ইসলামী জনতা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের দাবী জানিয়ে এসেছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনেরই একটি পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে বিষয়গুলো পড়ানো হবে মূলত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও তাই পড়ানো হবে। তবে সেখানে এই বিষয়গুলোর পরিকল্পনার থাকবে মজবুত ভিত্তি। সেখানে ইসলামী ঈমান আকীদার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি বিষয় পুনরবিন্যস্ত পুনরলিখিত ও সংশোধিত হবে। বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, দর্শন সব কিছুই ইসলামী চিন্তার আলোকে সংশোধিত হবে। বিশ্ব যতদূর এগিয়েছে সেখান থেকে এক কদমও পিছিয়ে আসা হবে না। তবে তার দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন করা হবে। দেশ-জাতি নির্বিশেষে সমগ্র মানবতার কল্যাণই হবে এই শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ। এমনই একটি শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়নকারী হবে এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। একদিন এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের সাধারণ শিক্ষার সমগ্র দায়িত্ব বহন করতে হবে। এভাবে এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে তৈরী করতে হবে। এবং একে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এটিই ছিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ। এটা কি জাতির জন্য কোন অকল্যাণ চিন্তা? যদি এটা কল্যাণ চিন্তারই একটা অংশ হয়ে থাকে তাহলে এভাবে এ প্রচেষ্টাকে পংগুত্বের দিকে এগিয়ে দেবার অর্থ কি?

ঐক্যই আজকের বৃহত্তম প্রয়োজন

ইসলামী জীবন দর্শন ও সমাজ ব্যবস্থায় ঐক্য, একাত্মতা ও একটি কেন্দ্রীয় শক্তির ওপর খুব বেশী জোর দেয়া হয়েছে। মূলত ঐক্য ছাড়া একটা সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্যান্য জীবন দর্শনের তুলনায় ইসলামী জীবন দর্শনে ঐক্যের ওপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, জাগতিক বিষয়াবলী ছাড়াও ইবাদাত অধ্যায়ে যে কাজগুলো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত পর্যায়ভুক্ত সেগুলো সম্পাদনের জন্যও ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন নামাযের জন্য জামায়াতের বিধান দেয়া হয়েছে। একজনের একাকী নামাযের চাইতে কয়েকজনের ঐক্যবদ্ধ নামাযকে কয়েকগুণ বেশী সওয়াবের অধিকারী গণ্য করা হয়েছে। যাকাত একজনের ঘরে বসে আদায় করলে চলে। কিন্তু তাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংঘবদ্ধভাবে আদায়ের বিধান দেয়া হয়েছে। আর হজ্জের ঐক্য তো আরো চমকপ্রদ। সারা দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে একই দিনে, একই জায়গায়, একই সময়ে এবং একজন ইমামুল হজ্জের অধীনে হজ্জ আদায় করতে হয়। মনে হয় দুনিয়ার অন্য কোন জীবন দর্শন ব্যক্তিগত ও একান্ত ইবাদত অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ঐক্যকে এত বেশী জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে তোলেনি।

কুরআনের পরিভাষায় এ ঐক্যকে بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ –সীসার প্রাচীর ও عُرْوَةُ الْوُثْقٰى –অবিচ্ছেদ্য বাঁধন বলা হয়েছে। সীসার প্রতিটি কণা নিজেদের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য বন্ধন সৃষ্টি করার ফলেই তাদের মধ্যে যে সংঘবদ্ধতা সৃষ্টি হয় তারই মূর্ত রূপ হচ্ছে সীসার প্রাচীর। এহেন অবিচ্ছেদ্য ঐক্যই ইসলামী সমাজের কাম্য। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা দুনিয়ার মুসলমানকে একই ব্যক্তির একটি দেহরূপে চিত্রিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَّاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُه اِشْتَكٰى كُلُّهٗ – اِنِ اشْتَكٰى رَأْسُهٗ اِشْتَكٰى كُلُّهٗ – مشكوة

"মুসলমানরা হচ্ছে একটি দেহের মতো। তার চোখে যন্ত্রণা হলে সারা শরীর যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়। মাথায় যন্ত্রণা হলে যন্ত্রণায় সারা শরীর কঁকিয়ে ওঠে।"

সারা দুনিয়ার মুসলমানরা একই সমিতিভুক্ত। একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। সে ভ্রাতৃত্বের মধ্যে চিড় ধরাবার কোন জায়গা, কোন ফাঁকও নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যটা স্বাভাবিক এবং অনৈক্যটা কৃত্রিম ও বাইর থেকে আরোপিত। তাদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দিলে বুঝতে হবে এটা তাদের নিজেদের চাহিদা নয় বরং শত্রুদের চাল। তাদের পয়লা নম্বর দুশমন শয়তান খুব ভালো করেই জানে, একমাত্র অনৈক্যের মাধ্যমেই তাদেরকে দুর্বল করা যেতে পারে। এছাড়া তাদেরকে দুর্বল করার আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। ঐক্যবদ্ধ মুসলিম বিশ্বে একটি অজেয় শক্তি। এ শক্তির পরিচয় দুনিয়া এর আগে বহুবার পেয়েছে। অনৈক্যই যে স্পেনে মুসলিম শক্তির পতনের প্রধানতম কারণ, তাতারীদের হাতে বাগদাদ ধ্বংসের মূল চালিকা শক্তি এবং পঞ্চাশ বছর ধরে এশিয়ার বিশাল জনপদে বর্বর তাতারীদের হাতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুসলমানের চরম নিগ্রহের জন্য দায়ী, ইতিহাস পাঠকমাত্রই তা অবগত আছেন।

আজকে ইসলামের বিজয়ের শতক হিসাবে চিহ্নিত এই হিজরী পঞ্চদশ শতকের শুরুতেই বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের ওপর নির্যাতন নেমে আসছে, যার আভাস পাচ্ছি আমরা লেবাননে ইসরাইলের হাতে ফিলিস্তিনী গেরিলা শক্তির পতনের মধ্য দিয়ে। সারা দুনিয়ার মুসলিম শক্তিরা দূর থেকে যেন তামাশা দেখছে। এমনকি ধারে কাছের কোন কোন মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে এ অভিযোগও উঠেছে যে, তারা ইহুদী পক্ষকে মদত যুগিয়েছে। অন্য দিকে আফগানিস্তানে মুসলিম মুজাহিদরা শুধু রক্ত দিয়েই যাচ্ছে। বিশ্বের বর্বরতম পরাশক্তিটির বিরুদ্ধে তারা সারা দুনিয়ার মুসলমানদের প্রতিরক্ষা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ মুসলিম মিল্লাত তাকে কোন সহায়তা দিচ্ছে না। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এখনো আফগান মুজাহিদদেরকে সহায়তা দানের জন্য কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

মুসলমানদের অনৈক্যের দরুন আজ মুসলিম বিশ্বের এ করুণ চিত্র আমাদের দেখতে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াস যারা চালাচ্ছেন ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের প্রয়াস অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। আর উম্মতে মুসলিমাকে বিভক্ত করার এবং তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করার যে কোন প্রয়াস আসলে শয়তানের চাল। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি মুসলিম রাষ্ট্রের চিন্তা করা উচিত তাদের যে কোন পদক্ষেপ কতটুকু নিজেদের স্বার্থে এবং কতটুকু মিল্লাতে ইসলামিয়ার স্বার্থে। তার নিজের স্বার্থ যদি মিল্লাতের স্বার্থের পরিপন্থী প্রমাণিত হয় তাহলে আসলে তা শয়তানের স্বার্থই উদ্ধার করছে।

মুসলমানদের নিজেদের আপোশের হানাহানি বন্ধ করে নিজেদের আসল ও চিহ্নিত শত্রুর টুটি চেপে ধরার জন্য এগিয়ে যাওয়া উচিত। আমাকে শক্তিশালী হতে হবে, এ চিন্তা না করে, মুসলমানকে শক্তিশালী হতে হবে, এ চিন্তা করা উচিত। ইসলামের শত্রুরা একমাত্র শক্তিশালী মুসলমানকে ভয় করে, শক্তিশালী আমাকে নয়।

হিজরী পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভ লগ্ন মুসলমানদেরকে আত্ম-পর্যালোচনার আহবান জানাচ্ছে। আত্ম-পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা যদি মিল্লাতের ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌছে যেতে পারি তবেই এ শতক ইসলামের বিজয়ের শতকে পরিণত হবে।

মিল্লাতে ইসলামীয়া রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের হাতে গড়া। আরব জাতি, আরব দেশ বা আরবী ভাষার ভিত্তিতে তিনি এ মিল্লাত গড়ে তোলেননি। বরং একটি বিশেষ চিন্তা-দর্শনের ওপর এর ভিত্ রচনা করেছেন। যে চিন্তা-দর্শন এক ব্যক্তিকে ইসলামের আওতাভুক্ত করে সেই চিন্তা দর্শনই তাকে মিল্লাতে ইসলামীয়ার সদস্যে পরিণত করে। কাজেই যে কোন দেশের যে কোন মুসলিম বিশ্বব্যাপী মিল্লাতে ইসলামীয়ার একজন সদস্য। তাই কুরআনে মুসলমানদের পরস্পর ভাই বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَا لُهُ وَعِرْضُهُ

"প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত-সম্পদ-ইজ্জত-আবরু অন্য মুসলমানের জন্য হারাম।"

সারা বিশ্বে একমাত্র মিল্লাতে ইসলামীয়াই এ অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী। অতীতে মুসলমানদের মধ্যে কুরআন ও হাদীসের বিধানসমূহ জীবন ক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রশ্নে বিভিন্ন মাযহাবের (school of thoughts) সৃষ্টি হয়েছে। মাযহাব ভিত্তিক ইস্তিদলাল ও ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমামগণ বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন কিন্তু ইসলামী চিন্তাদর্শনের মূল কেন্দ্র থেকে তারা এক চুলও এদিক ওদিক হননি। তাই তাদের ইজতিহাদ মিল্লাতকে শক্তিশালী করেছে, করেছে কেন্দ্রাভিমুখী। তাই বিভিন্ন মাযহাবী ইখতিলাফ (যতদিন তার সঠিক প্রয়োগ অব্যাহত ছিল) মিল্লাতের জন্য রহমতে পরিণত হয়েছে। কাজেই মাযহাবী ইখতিলাফগুলো মিল্লাতকে খণ্ডিত করার কোন ক্ষেত্র নয়, দুর্ভাগ্যক্রমে আজ আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি।

কাজেই মিল্লাতের মধ্যে চিন্তার ও কাজের ক্ষেত্রে যে স্বাধীনতা রয়েছে তাকে অনৈক্য সৃষ্টির ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা মোটেই ইসলামী ভাবধারা ও চিন্তা দর্শনের অভিপ্রেত নয়। বরং বহুর মধ্যে এক এবং বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য এই ভাবধারার লক্ষ। রসূল (স) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি নিজেই ছিলেন এই মিল্লাতের ঐক্যের কেন্দ্র। ইসলামী মিল্লাতের সদস্যরা কোন ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিলে তাঁর কাছে চলে যেতেন। সে ব্যাপারে

তাঁর রায়কে সবাই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতেন। এভাবেই তখন সব মতবিরোধ, ইখতিলাফ ও অনৈক্যের অবসান ঘটতো। রসূল (স) তাঁর ইনতিকালের সময় বলে গেলেন ঃ

تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ - كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّتِىْ

"তোমাদের মধ্যে আমি দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি ঃ আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত।"

এর মধ্যে কুরআনকে রসূল (স) নিজেই অবিকৃতভাবে সংকলন করে গেছেন। তাঁর সুন্নাত সংকলনের ব্যাপারে সাহাবা, তাবেঈ ও তাবেতাবেঈগণ চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁদের ও প্রতি যুগের উম্মতের সতর্ক প্রহরীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আল্লাহর ইচ্ছায় এ দু'টি আজো অবিকৃত রয়ে গেছে। ফলে মিল্লাতের আভ্যন্তরীণ ঐক্যের যাবতীয় সরঞ্জাম হাতের কাছেই মওজুদ রয়েছে। এ দু'টি থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং এদের স্বার্থদুষ্ট ব্যবহার ছাড়া উম্মতের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। কাজেই মিল্লাতে ইসলামীয়ার আভ্যন্তরীণ ঐক্য অটুট রাখার গুরুদায়িত্বের একটি বিরাট অংশ বর্তায় উম্মতের উলামায়ে কেরামের ওপর। কারণ উলামায়ে কেরামই হচ্ছেন কুরআন ও সুন্নাহ এবং ইসলামী জ্ঞানের ধারক ও বাহক। এ ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম যদি উম্মতের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিতে তৎপর হন তাহলে এজন্য কিয়ামতে আল্লাহর সামনে যেমন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে তেমনি রসূলের সামনেও তাঁদের লজ্জার সীমা থাকবে না।

মিল্লাতে ইসলামীয়ার রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য তাদের এই আভ্যন্তরীণ ঐক্যেরই ফলশ্রুতি। মিল্লাতের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীক ঐক্যের প্রতীক হচ্ছে খিলাফত। রসূলের পর খিলাফতে রাশেদা মিল্লাতকে এক সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছিল। খিলাফতে রাশেদা খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ (রসূলের পথানুসারী নিখুঁত ইসলামী খিলাফত) হবার কারণে মিল্লাতের রাজনৈতিক ঐক্যের সাথে সাথে তাদের দীনি ও আভ্যন্তরীণ ঐক্যেরও ধারক ছিল। খিলাফতে রাশেদার পর যে বংশ ভিত্তিক রাজতান্ত্রিক শাসন শুরু হয় ইতিহাসে তা খিলাফত নামে আখ্যায়িত হয়ে এলেও আসলে তা খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ ছিল না। তাই এই 'খিলাফত' শুধুমাত্র মিল্লাতের রাজনৈতিক ঐক্যের পতাকাই বহন করতে সক্ষম হয়েছে। খিলাফতে রাশেদার মাত্র পাঁচ ছয়শো বছরের মধ্যে তাতারী আগ্রাসন মিল্লাতের এই রাজনৈতিক ঐক্যকেও ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তারপর নিছক কাবা কেন্দ্রিকতার

কারণেই উম্মতের এই রাজনৈতিক ঐক্যটি নামকাওয়াস্তে জীবিত ছিল। আধুনিক কালে তুরস্কের উসমানী খিলাফত ছিল এরই প্রতীক। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুর্কী খিলাফতের অবসান ঘোষণায় মিল্লাতে ইসলামীয়ার ঐক্যের শেষ প্রতীকটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ইতিপূর্বে তুর্কী খিলাফতের শেষের দিকে বিশ্বব্যাপী মিল্লাতে ইসলামীয়ার রাজনৈতিক ঐক্যের ডাক নিয়ে সারা বিশ্ব তোলপাড় করেন মিল্লাতের অগ্নিপুরুষ জামালুদ্দীন আফগানী। আফগানীর ডাক উপমহাদেশে এবং বাংলার বুকেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই প্রথম মহাযুদ্ধের পর খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতা উপমহাদেশের মুসলমানদের মনে বড় বেশী বেজেছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সারা বিশ্বে মুসলমানরা ছিল ছিন্নবিচ্ছিন্ন। কিন্তু এই সময় আরব বিশ্বে 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' এবং উপমহাদেশে 'জামায়াতে ইসলামী'র ন্যায় দুটি পূর্ণাংগ ইসলামী আন্দোলন মিল্লাতে ইসলামীয়ার মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। মিল্লাত দেখতে পায় তার আভ্যন্তরীণ ও রাজনৈতিক ঐক্যের নতুন মনযিল। মাত্র দুই তিন যুগের মধ্যে এই দু'টি আন্দোলন সমগ্র ইসলামী বিশ্বে তথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। দুনিয়ার যেখানেই মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যা রয়েছে সেখানেই আজ ইসলামী সংগঠন কায়েম হয়ে গেছে। এই ইসলামী সংগঠনগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৫৬ সালে মক্কা মুয়ায্যমায় প্রতিষ্ঠিত হয় "রাবেতায়ে আলমে ইসলামী"। রাবেতার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এক যুগের মধ্যেই মরক্কোর রাবাতে অনুষ্ঠিত হয় মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানদের সম্মেলন। প্রতিষ্ঠিত হয় ওআইসি-অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স। ওআইসি তাই আজ মিল্লাতে ইসলামীয়ার ঐক্যের প্রতীক। চলতি ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে ঢাকার বুকে ওআইসি-এর অধীনে ইসলামী রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ সম্মেলন তার সাফল্যের মাধ্যমে মিল্লাতের ঐক্য প্রচেষ্টাকে আরো জোরদার করতে সক্ষম হোক এ কামনা করি।

৪৬

জাতিগতভাবে সুবিধাবাদ ত্যাগ করতে হবে

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগেও কোন কোন নবীকে আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করেছিলেন। তাঁরা দীর্ঘকাল আল্লাহর হুকুম ও বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন, সমাজ কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন এবং রাষ্ট্র শক্তির সহায়তায় মানবিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আল্লাহর আনুগত্যের প্রেরণা ও ভাবধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে তাদের এসব কর্মকাণ্ডের কোন বিস্তারিত চিত্র আমাদের সামনে নেই। কিন্তু শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজ জীবন, শিক্ষা, অর্থনীতি, নৈতিকতা ও খালেস ইবাদত বন্দেগীকেও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় এনেছেন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সমগ্র জীবন ক্ষেত্রকে যেভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেছেন তার পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের সামনে আজও অম্লান। এখানে কোন ক্ষেত্রে অস্পষ্টতার কোন অবকাশ নেই।

নবীর তিরোধানের পর খোলাফায়ে রাশেদীন সেই কাঠামোয় কোন প্রকার মৌলিক পরিবর্তন না করেই ৩০ বছর পর্যন্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংগনকে নবুওয়াতের প্রতিষ্ঠিত পথে সুসজ্জিত করেছেন। খিলাফতে রাশেদার পর এই কাঠামোয় প্রথম মৌলিক পরিবর্তনের আভাস দেখা দিলে প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত হয় নবীর সাহাবীগণের মধ্য থেকে এবং এই প্রতিবাদে নেতৃত্ব আসে নবীর পরিবার থেকেই। হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এই প্রতিবাদকে ন্যায়সংগত প্রমাণ করার ও কিয়ামত পর্যন্ত একে জীবন্ত রাখার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেন। মহররম মাসের দশ তারিখ হযরত ইমাম হুসাইনের প্রতিবাদ ও প্রাণ উৎসর্গের স্মৃতি নিয়ে আজো আমাদের সামনে জ্বল জ্বল করছে। সারা দুনিয়ার মুসলমানরা এই মাসটিকে শোকের মাস হিসেবে অনুভব করে আসছে। আমি একদল বুক চাপড়ানো লোকের কথা বলছি না। তারা তো ইসলাম সম্পর্কে কেবলমাত্র নিজেদের হতাশারই প্রকাশ করে আসছে। তাদের মনোবলও শূন্যের কোঠায়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী বিশাল উম্মতে মুসলিমার একি দুর্দিন! কোটি কোটি মানুষের শোক প্রকাশ করার জন্য তো ইমাম হুসাইন শাহাদাত বরণ করেননি। তিনি তো কোটি কোটি মানুষকে জাগাতে চেয়েছিলেন। কোটি কোটি মানুষের শোক প্রকাশ করার মানেই তো

তারা বিষয়টির সত্যতা উপলব্ধি করেছেন এবং এর প্রতি নিজেদের সমর্থন জানিয়েছেন। এর পর তো এ বিশাল মানব গোষ্ঠীর চুপ করে বসে থাকা সাজে না। ইমামের মতবাদ অর্থাৎ খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করাই ছিল তাদের দায়িত্ব। ইমামের জন্য শোক প্রকাশ করতে তারা প্রস্তুত। কিন্তু ইমাম যে জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন সেজন্য নিছক শোক প্রকাশ না করে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে তারা প্রস্তুত নন। এটাকে এক ধরনের সুবিধাবাদ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। এ ধরনের সুবিধাবাদী নীতি অবলম্বন করে একটি গোটা মিল্লাত কোন দিন দুনিয়ার বুকে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। নিজেদের অভীষ্ট লক্ষবস্তু থেকে তো তারা দূরে থাকবেই উপরন্তু পার্থিব সাফল্য থেকেও তারা বঞ্চিত হবে। কাজেই সুবিধাবাদ ত্যাগ করে দীনী ও জাতিগত লক্ষ অর্জনের জন্য মিল্লাতকে আত্মোৎসর্গে ব্রতী হতে হবে। এটিই মহররম মাসের আমাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

৪৭
ইসলাম পবিত্র ধর্ম!

এখনো আমাদের দেশে এমন লোকের সংখ্যা বেশ যারা ইসলামকে 'পবিত্র ধর্ম' মনে করে। আর ইসলাম ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য তারা নিজেদের জীবন থেকে শুরু করে দেশ, সমাজ, জাতি ও সারা দুনিয়াকে অপবিত্র রাখতে চায়। কারণ এগুলোকে পবিত্র করলে ইসলাম ধর্মের পবিত্রতা ম্লান হয়ে যাবে। আমাদের জীবনও পবিত্র আবার ইসলাম ধর্মও পবিত্র, তাহলে আর ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব থাকল কোথায়? কাজেই ইসলাম ধর্মের খাতিরে আমাদের জীবন, সমাজ, রাষ্ট্রকে অবশ্যি অপবিত্র থাকতে হবে।

ইসলাম ধর্ম যাদের কাছে পবিত্র, তাদের কাছে আরো কিছু বিষয় পবিত্র আছে। যেমন আল্লাহ পবিত্র, নবী পবিত্র, হুজুর কেবলা পবিত্র, মাজার শরীফ পবিত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলোকেও তারা পবিত্র অর্থাৎ ধরা ছোঁয়ার উর্ধে রাখতে চায়।

ইসলাম ধর্মকে পবিত্র রাখার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের ধারে কাছে না যাওয়া আর পবিত্রতার অজুহাতে ইসলামকেও সবসময় নিজেদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। তারা ইসলামকে পবিত্র রাখতে চায়, কাজেই তাদের নিয়েত ও উদ্দেশ্য সৎ। আর যেহেতু তাদের নিয়েত ও উদ্দেশ্য সৎ তাই তারা সৎলোক। কাজেই প্রমাণ হয়ে গেল, যারা ইসলামকে পবিত্র মনে করে তার ধারে কাছে ঘেঁসতে চায় না তারা সৎলোক। ন্যায় শাস্ত্রের সূত্র অনুযায়ী এর বিপরীত ধর্মীদের অসৎলোক হওয়াই উচিত।

এই ইসলাম থেকে দূরে থাকা 'সৎ' লোকেরা ইসলাম সম্পর্কে যে মতবাদ গড়ে তুলেছে তা চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের চাইতে কম চোখা নয়। এদের এই "পবিত্র ইসলাম ধর্ম মতবাদ" সম্পর্কে বলার আগে এটাও একটু আলোচনা করে নিতে চাই যে, এরা কারা? মূলত এদের একটা বিরাট গ্রুপ ইসলাম অবিশ্বাসী এবং ধর্মবৈরী। আগের জামানায়, এই ধরুন ইংরেজ চলে যাবার কিছুদিন পর পর্যন্তও সাধারণ মুসলমানদের একটা সরল অনভিজ্ঞ অংশও এই রকমের একটা ধারণা পোষণ করতো। কিন্তু এর পেছনে তাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তারা দেখছিল ইসলামের মৌল আদর্শ, ভাবধারা ও নির্ভেজাল সাংস্কৃতিক স্পর্শ থেকে দীর্ঘকাল অসম্পর্কিত থাকার কারণে

তাদের জীবনক্ষেত্র সত্যিই অপবিত্র হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে ইসলামকে অনৈসলামের মিশ্রণমুক্ত রাখাই ছিল তাদের ইসলামকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্য এবং এই সংগে ইসলামের পবিত্রতার স্পর্শে নিজেদের জীবনকে পবিত্র করতেও তারা কম উদ্যোগী ছিল না। কিন্তু এই নতুন 'পবিত্র' ইসলাম ধর্ম মতবাদীরা সম্পূর্ণ আলাদা ধাঁচের। ইসলামের প্রতি এদের বিশ্বাস শুধু টলায়মান নয়, অনেক ক্ষেত্রে এদের ইসলাম অবিশ্বাসের বিষয়টি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেরও অপেক্ষা রাখে না। এদের একদল ইসলাম থেকে দূরে সরে এসেছে। শুধু বাইরে একটা আবরণ দিয়ে নিজেদের এই সরে আসাটাকে ঢেকে রেখেছে মাত্র। অন্য কথায় বলা যায়, শুধুমাত্র মুসলিম সমাজের সাথে সম্পর্কিত থাকার লাভটুকু কুড়াবার জন্যই তারা ইসলামের সাথে নিজেদের সম্পর্কিত রেখেছে। এদের অনেকে আবার ধর্মকে আফিম মনে করে। এই আফিমের নেশায় ভোম ভোলানাথ হয়ে পড়ে থাকতে এরা মোটেই রাজী নয়। সর্বোপরি এই আফিমের নেশা ছুটাবার জন্য এরা যাবতীয় কসরত চালিয়ে যাচ্ছে।

পবিত্র ইসলাম ধর্ম মতবাদীরা ধর্ম সম্পর্কে একটা দ্বান্দ্বিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে। এই তত্ত্বটার সারৎসার হচ্ছে ঃ মানব জাতির জন্মধারার মধ্যে যেমন একটা ক্রম বিবর্তন দেখা যায়, যেমন প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে পাল্লা দিয়ে বিশ্ব জগতে প্রাণের প্রাথমিক স্তর বিকশিত হতে হতে শেওলা থেকে বেংগাচি, বেংগাচি থেকে ব্যাং এবং এভাবে একদিন জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী স্থলচর প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়, তারপর সেখান থেকে ক্রম বিবর্তন ধারায় অগ্রসর হয়ে বানর থেকে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। ঠিক তেমনি প্রাচীন মানব পাথর ও গাছপালা পূজা থেকে উন্নতি লাভ করে নক্ষত্র পূজা, তারপর এই পর্যায় থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে বহু ঈশ্বরের পূজা করতে করতে শেষে একেশ্বরে এসে পৌছেছে। কাজেই একেশ্বরবাদিতা ও তওহীদ মানুষের নিজস্ব চিন্তার ফসল। ধর্মীয় শরীয়ত মানুষের নিজের হাতে গড়া।

পবিত্র ইসলাম ধর্ম মতবাদীরা ইসলাম সম্পর্কে এই চমৎকার মত পোষণ করে থাকে। ইসলামের অনুসারীরা যেহেতু ইসলামকে নিজেদের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসে এবং ইসলামের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, ইসলামের কোন প্রকার অবমাননা তাদের কাছে অসহনীয়, তাই এই ইসলাম বৈরিরা প্রকাশ্যে ইসলামের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে একটা নতুন যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করেছে। এই যুদ্ধ কৌশলটা হচ্ছে, ইসলামকে ধর্ম বানিয়ে তাকে পবিত্রতার মোড়কে মুড়ে হিমাগারে পাঠিয়ে দাও। ইসলাম

হিমায়িত জীবন যাপন করবে আর মুসলমানরা ইসলাম বিরোধী মতবাদের আওতায় নিজেদের জীবন পরিচালনা করবে। এই হচ্ছে আমাদের এদেশীয় একদল ধর্মীয় বিবর্তনবাদীদের কৌশল।

মুসলমানরা কৌশলীদের এ জালে কোনদিন পা দেয়নি। ইসলামকে তারা পবিত্র মনে করে নিজেদের জীবন, রাষ্ট্র ও সমাজকে পবিত্র করার জন্য। ইসলামকে তারা জীবনের সবক্ষেত্রে একমাত্র নিয়ামক মনে করে। মুসলমানরা কৌশলীদের এ ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়েছে দেখে বাংলাদেশে এ কৌশলীদের প্রেতাত্মারা শুধু নিজেদের মাথার চুল ছিঁড়ে বেড়াচ্ছে। তাদের আজ শুধু নিজেদের ঘরোয়া কাগজপত্রে কিছু লেখালেখি করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই।

মুসলমানরা ইসলামী বিধান অনুযায়ী তাদের দেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করবে, এটা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা তাদের ঈমানের দাবী। কোন সত্যিকার মুসলমান এ দাবী অস্বীকার করতে পারে না। কারণ আল্লাহ ও তাঁর রসূল যেখানে কোন বিধান দিয়েছেন সেখানে সে বিধান অস্বীকার করে নিজের মনগড়া কোন বিধান চালু করার অবকাশ ইসলামে নেই।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ - (الاحزاب : ٣٦)

তাই বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী বিধানের দাবী উঠছে বেশ কিছুকাল থেকে। গণতান্ত্রিক পরিবেশে এ দাবী স্বাভাবিক পথে এগিয়ে চলে। যেখানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই সেখানে তা বিকল্প পথ ধরে। মুসলমান দেশগুলোয় দু–একটা ছাড়া কোথাও গণতন্ত্র নেই। তবে যেসব মুসলিম দেশে গণতন্ত্র নেই সেখানে গণতন্ত্রের বুলি আওড়াবারও একটা কসরত চলছে। এভাবে গণতন্ত্রের নামে এক ধরনের স্বৈরতন্ত্র সেখানে চালু রয়েছে। এমনি একটি দেশ হচ্ছে দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া। মুসলমানরা এখানে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কাজেই তারা নিজেদের দেশে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু চল্লিশের দশকের শেষের দিকে ওলন্দাজদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করার পর আজো দেশটি তার অভিষ্ট লক্ষে পৌছতে পারেনি। দেশটিকে ইসলামী নিযাম থেকে বঞ্চিত রাখার উদ্দেশ্যেই গণতন্ত্রের ধারে কাছেই তাকে পৌছতে দেওয়া হয় না। এমনি ধরনের অবস্থা আরো বহু একক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশেরও। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রথম দশ বছরে দেশটিতে যতটুকু গণতন্ত্র ছিল তাতে মুসলিম জনগণের পক্ষ থেকে ইসলামী নিযামের দাবী জোরেশোরে উত্থিত হয়। এ দাবী একটি সুসংগঠিত রূপ লাভ করে। এ দাবীর ধারক মাসজুমী পার্টির দেশের প্রধানতম দলে পরিণত হবার সব লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্ষমতাসীন সেক্যুলার গোষ্ঠী এ অবস্থা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে ইসলামী দলকে বেআইনী ঘোষণা করা হলো।

এরপর থেকে ইন্দোনেশিয়া যে পথে অগ্রসর হলো তা সুস্পষ্ট স্বৈরতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর এদেশের ওপর দিয়ে অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। রক্তাক্ত কমিউনিস্ট বিপ্লবের মুখ থেকেও দেশটি রক্ষা পেয়ে গেছে অতি অল্পের জন্য। এরপরও সেখানে ইসলামের পথের বাধা অপসারিত হয়নি। সেক্যুলার গোষ্ঠী আবার তাদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন চালু করেছে। গণতন্ত্রের তসবী এবারও তাদের হাতে জড়ানো আছে। আর ইসলামী দলের ওপর জুলুম-অত্যাচার চলছে সমানে।

সম্প্রতি এ দেশে নির্বাচন হয়ে গেলো। যথারীতি সরকারী সেক্যুলার গোলকার দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। নির্বাচনের পূর্বে ইসলামী শাসনের দাবী এতই জোরদার হয়ে উঠেছিল যে, সরকার জাকার্তার একমাত্র ইসলামী দৈনিকটির প্রকাশনা বাতিল করে দেন। অথচ পুরাতন এই দৈনিকটির প্রচার সংখ্যা মাত্র বিগত কয়েক মাসের মধ্যে ৬০ হাজার থেকে দেড় লাখে পৌছে গিয়েছিল। নির্বাচনের পূর্বে দেশে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দৌরাত্ম এত বেড়ে গিয়েছিল যে, বিরোধী বিশেষ করে বৃহত্তম ইসলামী দল পিপিপি-এর প্রায় দুশো কর্মী দেশের বিভিন্ন এলাকায় হতাহত এবং হাজার হাজার কর্মী জেলে আটক হয়। ফলে সারা দেশে ইসলামী জনতার মনে নেমে আসে হতাশা। দেশের আধা সামরিক ও আধা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার যুব সমাজ দারুণ বিক্ষোভে ফেটে পড়লেও তাদের করার কিছু ছিল না।

ওদিকে ইসলামী আন্দোলনের পরিচালক ও পিপিপি-এর নেতা আল উস্তাদ মুহাম্মদ দাউদ ব্যুরো গত ১৯৭৪ সাল থেকে কারারুদ্ধ আছেন। তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে দুর্ব্যবহারের জন্য ১৯৭৪ সালের ১০ আগস্ট প্রেসিডেন্ট জেনারেল সুহার্তোকে সাবধান করে দিয়ে পত্র লিখেছিলেন। তার ফল হয়েছে তাঁর অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাবাস। উস্তাদ মুহাম্মদ দাউদের পত্রটির কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করলে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে শাসক সমাজের ব্যবহারের নমুনা পাওয়া যাবে। উস্তাদ দাউদ তার পত্রে বলেছেন ঃ

"একজন ভালো ও সচেতন নেতার অবশ্যই জনগণের আশা-আকাংখার প্রতিনিধি হতে হবে। অন্যথায় সে একজন জালেম স্বৈরাচারী, ধূর্ত ও প্রতারক শাসকে পরিণত হয়। সে নিজের জনগণের থেকে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে। ইতিহাস সাক্ষী জালেম শাসক যে কোন অবস্থায় ধ্বংসের গভীর গহবরে নিক্ষিপ্ত হয়। আমাদের দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট ডঃ অবদুর রহীম সূকার্ণো এ

ধরনের ধ্বংসেরই সম্মুখীন হন। তিনি ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের থেকে হামেশা বিচ্ছিন্ন থাকেন। আমাদের কর্মীদের ওপর চরম জুলুম নির্যাতন চালান। ইসলামপন্থীদেরকে ধ্বংস করার জন্য তিনি পি, কে, আই (ইন্দোনেশিয়া কমিউনিস্ট পার্টি)–এর সাহায্য নেন। পি, কে, আই কেবল ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ওপর আক্রমণ চালায়নি, ইসলামের ওপরও আক্রমণ চালায়। আল্লাহ সুকার্ণোর এ বাড়াবাড়ি পছন্দ করলেন না। সুকার্ণোর মতো সর্বজনপ্রিয় নেতা ক্ষমতাচ্যুত হলেন। তার সাথে কমিউনিস্ট পার্টির দফা রফা হলো। তার স্থলে আপনি ক্ষমতাসীন হলেন।

আমি আজ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনিও সেই একই জুলুম-অত্যাচারের পথে পা বাড়িয়েছেন। আপনিও ইসলামপন্থীদের ওপর জুলুম ও নির্যাতনের স্টীম রোলার চালাতে শুরু করেছেন। আপনি খৃষ্টানদের সাহায্য নিয়েছেন। আমরা অবাক হচ্ছি, আপনি কি চান? আপনার উদ্দেশ্য কি?

আপনি সেই একই পথে চলেছেন, যে পথে আপনার আগের লোকেরা চলে গেছে। নিজের পরিণতির ব্যাপারে আপনি এতই বেখবর কেন? আমার ও আপনার স্রষ্টা সেই মহান আল্লাহ, যিনি সারা জাহানেরও স্রষ্টা, তিনি প্রতি মুহূর্তের প্রতিটি কাজের প্রতি দৃষ্টি রাখছেন। তিনি অবশ্যই জুলুম ও নির্যাতন পছন্দ করেন না।

তাই হে জেনারেল! আমি আপনাকে সিরাতে মুস্তাকীমের দিকে ফিরে আসার আহবান জানাচ্ছি। এখনো সময় আছে, আপনি নিজের ভুল শুধরে নিন। একজন ভালো ও সাচ্চা মুসলমানের মতো নিজেকে ইসলামের হাওয়ালা করে দিন। এ অবস্থায় এ দুনিয়া ও আখেরাত দু'টোই আপনার থাকবে। এ দু'জায়গায় সাফল্যের এই একটিই মাত্র পথ।"

সুহার্তো যদি এ মর্দে মুজাহিদের আহবান গ্রহণ করতে পারতেন। ইসলামী বিশ্বের অন্যান্য শাসকরাও যদি এ আহবানের গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন তাহলে ইসলামী বিশ্বের বহুতর জটিল সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত হতো।

বিশ শতকের শেষের দিকে আমরা এগিয়ে চলছি। এখন আমাদের অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। একশো বছর আগে আমরা যেমন ছিলাম এখন আর তেমনটি নেই। উনিশ শতকের শেষের দিকেও পরাধীনতার গ্লানি, অনগ্রসরতা, অশিক্ষা, দারিদ্র আমাদের পংগু করে রেখেছিল। বিশ শতকের গোড়ার দিকেও আমাদের জড়তা কাটেনি। ইসলামকে নিয়ে চলতে আমাদের বেশ কিছু দ্বিধা ছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিজয়ের সামনে আমাদের নতজানু প্রবৃত্তি আমাদের একদলের কাছে ইসলামকে বিশ শতকের অনুপযোগী করে তুলেছিল। সামগ্রিকভাবে এ মনোভাবও আজ তিরোহিত।

ইসলাম এখন আর পংগু শিবিরে দিন কাটাচ্ছে না। ইসলাম আজ একটি পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা। কেবল ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনে নয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি ক্ষেত্রেও তার উপযোগিতা স্বীকৃত হচ্ছে মুসলিম বিশ্বে এবং বহিরবিশ্বে তার আলোচনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দুর্বল ঈমানদারদের ঈমানও সবল হতে চলেছে।

ইসলামের সাথে এই সংশয়, সন্দেহ, দুর্বল প্রত্যয়, আধা প্রত্যয় প্রভৃতি বিষয়গুলোর ব্যাপারে কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের কোন ভূমিকা নেই। সাধারণ মুসলমানদের ঈমান ইসলামের ব্যাপারে হাজার বছর আগে যেমন সবল ছিল আজো তেমনি আছে। ঈমানের এই তারতম্যটি দেখা দিয়েছে মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে। মূলত এই সমাজের লোকরাই মুসলিম দেশগুলোয় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে আসছে। রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা এদের মধ্যে থাকার কারণে যুগের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এরা পারদর্শিতা অর্জন করেছে। আর আধুনিক যুগে মুসলিম দেশগুলোয় যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থাই হচ্ছে প্রবল। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো কোথাও আধুনিক ধাঁচে গড়ে উঠতে পারেনি। কাজেই পাশ্চাত্য শিক্ষার সাথে সাথে কোথাও কোথাও ইসলামী শিক্ষার দুর্বলতার ছোঁয়াচ এদের গায়ে লেগেছে। তাছাড়া সাধারণ মুসলমানদের ঈমানী জীবনের প্রভাবেরও একটা দিক রয়েছে। এসব কারণে মুসলিম শাসক সমাজের ওপর ধর্ম হিসেবে ইসলামের একটা প্রভাব আছে, একথা অবশ্যই মানতে হবে।

কারণ তাদের ঈমান যতই দুর্বল পর্যায়ের হোক না কেন এবং ইসলামের ওপর তাদের ঈমান যতই টলটলায়মান হোক না কেন ইসলামের গণ্ডী থেকে বের হয়ে আসার কল্পনা তারা করে না। তাই সমাজতন্ত্রকেও যখন তারা গ্রহণ করতে চায় তার ওপর ইসলামের লেবেল লাগিয়ে তাকে "ইসলামী সমাজতন্ত্র" বানাবার কসরত চালায়। ঈমানের এই টাইপকে শুধু দুর্বল ঈমান নয়, বিকৃত ঈমানও বলা যাবে।

আর ঈমানের যে দুর্বল টাইপটা ইসলামী বিশ্বের দেশে দেশে প্রশাসনিক গোষ্ঠীর মধ্যে আজ মহামারীর রূপ নিয়েছে সেটা বড় চমকপ্রদ। ইসলামকে সোনার অলংকারে সাজিয়ে হীরের পোশাক পরিয়ে শাসনতন্ত্রের "রাষ্ট্রীয় ধর্মের" কারাগারে আবদ্ধ রাখার প্রবণতা এর অন্যতম। ইসলামী বিশ্বের এই প্রশাসক গোষ্ঠী দেশের জনগণকে এই বলে বুঝাতে চাচ্ছে যে, দেশের শাসনতন্ত্রে ইসলামকে সর্বোত্তম মর্যাদা দান করা হয়েছে। এই শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আমাদের অজ্ঞতার কোন অভিযোগ নেই। কারণ ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া থেকে নিয়ে মরক্কো-মরিতানিয়া পর্যন্ত এশীয় আফ্রিকীয় ইসলামী ভূখণ্ডে যারাই ক্ষমতাসীন আছেন তারা যে এইসব এলাকার উচ্চ-বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সদস্য এ ব্যাপারে আমরা নিসন্দেহ। তাদের বুদ্ধিহীনতা বা বুদ্ধি ভ্রমের কোন কারণ দেখি না। কাজেই বিশ শতকের এই শেষাংশে ইসলাম যখন একটি পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে তখন তাদের ইসলামকে এই তথাকথিত ধর্মের কারাগারে বন্দী রাখার অভিযানকে অজ্ঞতা প্রসূত বলা যায় না। বরং এটাকে বলা যায়, রাষ্ট্র যন্ত্রে ইসলামকে তার যথার্থ ভূমিকা পালন থেকে বিরত রাখার ষড়যন্ত্র।

কিন্তু মুসলিম দেশগুলোয় ইসলামী আন্দোলনের যে জোয়ার চলছে তার প্রবল স্রোতে প্রায় সর্বত্র ইসলামকে "ধর্ম কারাগারে" বন্দী রাখার ষড়যন্ত্র বানচাল হতে চলেছে। এ অবস্থা দেখে মুসলিম দেশগুলোয় একদল ধূর্ত শাসক তাদের পাঁয়তারা বদলাবার চেষ্টা করছেন। তারা নিজেরাই এখন ইসলামকে পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা বলে ঘোষণা দিচ্ছেন। নিজেদের দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র বলতেও তাঁরা দ্বিধা করছেন না। কিন্তু দেশে ইসলামী আইন জারী করতে তাঁরা নারাজ। কারণ দেশে ইসলামী আইন জারী করলে হয়তো আমাদের আবার সেই সপ্তম শতকে ফিরে যেতে হবে।

ইতিপূর্বে এই দেশগুলোর একদল শাসক ধর্মকে রাজনীতিক্ষেত্রে টেনে না আনার জন্য জোরেশোরে প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়েছিলেন। ধর্মের নামে রাজনীতি করার তারা ছিলেন ঘোর বিরোধী। কিন্তু তাদের সব বিরোধিতা ও

প্রতিরোধ নস্যাত করে দিয়ে ইসলাম রাজনীতি ক্ষেত্রে নেমে এসেছে। আর এই রাজনীতিই এখন এসব দেশের শাসক সমাজের অবলম্বন। অনেকগুলি মুসলিম দেশের শাসক সমাজের মুখে ইসলামই এখন সবচেয়ে বড় বুলি। যে কয়টি মুসলিম দেশে সমাজতন্ত্র প্রচলনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তার মধ্যে আলজিরিয়া ইতিপূর্বে ইসলামী সমাজতন্ত্রের বুলি আউড়ে এসেছে এবং লিবিয়া এখনো আউড়ে চলেছে। সিরিয়া ও ইরাক ইসলামী সামজতন্ত্রের চালুনী গ্রহণ না করে সরাসরি সমাজতন্ত্রে নেমে আসায় সেখানে ইসলামী জনতার সাথে চলছে প্রতিরোধ সংগ্রাম। বিশেষ করে সিরিয়ায় তো এ সংগ্রাম ব্যাপক জিহাদের রূপ নিয়েছে। ইসলামী জনতা এই জিহাদে বিপুল ত্যাগ স্বীকার করে চলেছে। ফলে একদিন ইনশাআল্লাহ তারা সাফল্যের মুখ দেখবে এ ব্যাপারে আমাদের মনে বিন্দুমাত্রও সংশয় নেই। বাদবাকী কয়েক ডজন মুসলিম রাষ্ট্রের শাসক সমাজ ইসলামকে নিয়ে যে মাদারীর খেল্ খেলছেন তা আমরা ইতিপূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি।

মুসলমান দেশগুলোর এই শাসক সমাজ মুসলিম জনগণেরই একটি অংশ। অধিকাংশ দেশে তাদের ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থানের পেছনে জনগণের সহায়তার প্রয়োজন হয়নি। ফলে জনগণের দাবী-ইচ্ছা-আশা-আকাংখা পূরণকে তারা সরাসরি নিজেদের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত করবে না, এটাই স্বাভাবিক। তাদের গদীতে টিকে থাকার জন্য এগুলো যতটুকু পূরণ করা প্রয়োজন ততটুকুই তারা পূরণ করবে। তবে আমাদের মনে হয় নিজেদের মংগলের জন্যই কয়েকটা বিষয় তাদের অবশ্যই সামনে রাখা উচিত। এক, জনগণের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসলে তাদেরকে অবশ্যই জনগণের আদালতে নিজেদের কাজের জবাবদিহি করতে হতো। কিন্তু জনগণের মাধ্যমে ক্ষমতায় না আসলেও গণআদালতের হাত থেকে তাদের রেহাই নেই। তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়ে তারা ধিকৃত, ঘৃণিত বা নন্দিত হন। দুই, ইতিহাসের বিচারের হাত থেকে তাদের রেহাই নেই। যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের পাতায় তাদের কর্মকাণ্ড লেখা থাকবে। ভবিষ্যত বংশধররা তাদের কীর্তিকলাপ পড়ে তাদের প্রশংসা করবে, তাদের জন্য গর্ব অনুভব করবে, দোয়া করবে অথবা তাদের প্রতি নিক্ষেপ করবে ঘৃণিত অভিশাপের বাণ। তিন, মুসলিম হিসেবে তারা পরকালে এবং কিয়ামতে আল্লাহর সামনে হাযির হবার আকীদায় বিশ্বাসী। সেখানে তাদের অবশ্যই মুসলিম সমাজের সর্বময় কর্তৃত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। মুসলিম হিসাবে ইসলামের প্রতি আনুগত্য ঘোষণার পর ইসলামী জীবন 'ব্যবস্থা

নিজেদের দেশে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তারা কতটুকুন আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এ ব্যাপারে জবাবদিহির হাত থেকে তারা কোনক্রমেই রেহাই পাবেন না। তাই কিয়ামতে আল্লাহর সামনে লাঞ্ছিত হবার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং গণআদালতে ও ইতিহাসের পাতায় নিজেদেরকে নন্দিত করার জন্য ইসলামের ব্যাপারে তাদের আন্তরিক ও অকপট হওয়াই ভালো।

৫০
আজো প্রোজ্জ্বল হীরকের মতো

বিশ্বমুসলিমের নিকট হামেশা খেলাফতে রাশেদা একটি আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা রূপে বিবেচিত হয়ে এসেছে। মুসলমান যখনই স্বাধীনভাবে কোন রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছে তখনই খেলাফতে রাশেদার চিত্র তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। একথা সর্বজনবিদিত সত্য যে, খেলাফতে রাশেদার রাষ্ট্রীয় কাঠামো ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্র–কাঠামো সামগ্রিকভাবে বিশ্ব মুসলিমের মনে কোন আবেদন জাগাতে পারেনি। খেলাফতে রাশেদার অবসানের পর আজ সুদীর্ঘ তেরশো বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও মুসলিম সমাজে প্রতি যুগে এ রাষ্ট্র কাঠামো পুনরুজ্জীবনের জন্য আন্দোলন চলে এসেছে এবং আজকের এ চিন্তার নৈরাজ্যের যুগেও সাধারণ মুসলমানরা লোভাতুর দৃষ্টিতে সেই শান্তি, সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও সমৃদ্ধির প্রতীক রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের দিকে তাকিয়ে আছে।

বিগত বার– তেরশো বছরে মুসলমানরা অনেক নতুন নতুন সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে পরিচিত হয়েছে। অনেক শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির বাণী তারা শুনেছে। কিন্তু কোন শ্লোগানই তাদেরকে সেই স্বর্ণযুগের চিত্র রূপায়নের আকাংখা থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। এমনকি মাত্র গত বাইশ বছর আগে সেই স্বর্ণযুগের চিত্র রূপায়নের নামে পাকিস্তানের ন্যায় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।* ক্ষমতালোভী বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী বাইশ বছর ধরে জনগণকে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থেকে বঞ্চিত রেখেছে। এখন জনগণের ক্ষমতা ফিরে পাবার কিছুটা আশা দেখা দিয়েছে। বর্তমান সরকার দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন এবং এজন্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্নমুখী প্রচেষ্টা চলছে। তাই মুসলিম জনগণের জন্যে আর একবার তাদের সেই বহু আকাংখিত খেলাফত ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখা মোটেই বিচিত্র নয়।

তবে খেলাফতে রাশেদা প্রসংগে আমাদের সুধী সমাজের একাংশ একটি ভুল করে আসছেন। তারা মনে করেন, খেলাফতে রাশেদার যুগ ফিরিয়ে আনার অর্থ বুঝি সেই আজ থেকে তেরশো বছর পেছনে চলে যাওয়া, সেই যুগের বিশেষ ব্যবস্থাকে তার সকল খুটিনাটি বিষয়সহ হুবহু এযুগে ও এদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। অথচ বাস্তবে এটা কোনদিন সম্ভব নয়। তাই এর অর্থ

* নিবন্ধটি ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়।

হচ্ছে এই যে, খেলাফতে রাশেদার আমলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন পরিগঠনের জন্যে যে নীতিসমূহ গৃহীত হয়েছিল সেগুলো পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা। কারণ ঐ নীতিসমূহের একটি চিরন্তন আবেদন রয়েছে। এবং প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক সমাজের হৃদয়সত্তাকে ঐগুলোর আলোকে সুসজ্জিত করা যেতে পারে। কাজেই খেলাফতে রাশেদা পুনঃ প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে ঐ নীতিগুলোর প্রতিষ্ঠা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, খেলাফতে রাশেদা যে নীতিগুলোর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলো কি? ঐ নীতিগুলোর ভিত্তিতেই আমাদের ভবিষ্যত ব্যক্তি ও সমাজ জীবন গড়ে তুলতে হবে। খেলাফতে রাশেদার মৌলনীতিগুলোকে আমরা সাধারণত সাতভাগে ভাগ করতে পারি ঃ (১) আইনের শাসন, (২) পরামর্শভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, (৩) জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা, (৪) জনগণের অধিকার ও আজাদী সংরক্ষণ, (৫) নেতৃবৃন্দের সমালোচনা, (৬) দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্যহীনতা এবং (৭) রাষ্ট্র পরিচালকদের দায়িত্বানুভূতি ও তাকওয়া।

রসূলুল্লাহর (স) আমলে দুনিয়ার সকল এলাকায় রাজতন্ত্র বা ব্যক্তির একনায়কত্বমূলক শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর পরিবর্তে তিনি যে রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন করলেন তাতে ছিল আইনের শাসন ও একটি নির্ধারিত শাসনতন্ত্রের কর্তৃত্ব। সেখানে রাজতন্ত্র বা ব্যক্তি একনায়কত্বের কোন অবকাশ ছিল না। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আসল অধিকারী ছিলেন আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর প্রদত্ত আইনই ছিল দেশের আইন। ধনী-নির্ধন, শাসক-শাসিত সবাই ছিল সে আইনের চোখে সমান। সে আইনের সীমা লংঘন করার ক্ষমতা কারুর ছিল না। প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) তাঁর খেলাফত লাভের পর প্রথম ভাষণে একথাই বিবৃত করেনঃ

> "বন্ধুগণ! আমাকে তোমাদের ওপর শাসক নিযুক্ত করা হয়েছে অথচ আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই। যদি আমি সৎ ও জনকল্যাণমূলক কাজ করি তাহলে তোমরা আমাকে সাহায্য করো অন্যথায় আমাকে শুধরিয়ে নিয়ো। যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করি তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করো। আর যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করি তাহলে আমার আনুগত্য তোমাদের ওপর ওয়াজিব নয়।"

এখানে একটি শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থারই চিত্র ফুটে ওঠে। রাষ্ট্রপ্রধান নিজের ইচ্ছামতো কিছু করতে পারেন না। তিনি নিজে একটি আইনের অনুগত। ঐ আইনের প্রবর্তন তাঁর দায়িত্ব। রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকের ন্যায় ঐ

আইন তার নিজের ওপরও সমানভাবে প্রযোজ্য। ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য জায়েয নয় বরং তিনি শরীয়তকে কায়েম করেন বলেই তাঁর আনুগত্য ওয়াজিব। এজন্যেই ইসলামী রাজনীতির মূল কথা হচ্ছে ঃ সৎ ও ন্যায়ের প্রশ্নে নেতার আনুগত্য করতে হবে, অসৎ ও অন্যায়ের প্রশ্নে নয়। কুরআনে একথাটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হয়েছে ঃ "সৎকর্ম ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পরের সাথে সহযোগীতা করো, গুণাহ ও অন্যায়ের ব্যাপারে সহযোগিতা করো না।"

খেলাফতে রাশেদার দ্বিতীয় মূলনীতি ছিল পরামর্শ ভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। আল্লাহ নিজেই রসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ "আর বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করো।" এ নীতির ওপ্নরই খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত ছিল। খেলাফতের প্রতিটি বিভাগে পরামর্শের নীতি প্রচলিত ছিল।

প্রথমত ঃ খলীফার নির্বাচন হতো পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে। সাকিফায়ে বনি সায়েদায় পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে হযরত আবু বকরকে (রা) খলীফা নির্বাচন করা হয়। হযরত উমরের (রা) প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলমানরা স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তাঁকে মনোনীত করে তাঁর হাতে বাইয়াত হন। হযরত উমরকে (রা) মনোনীত করার পর হযরত আবুবকর (রা) সকল বড় বড় সাহাবীর সাথে পরামর্শ করেন এবং হযরত ওমর (রা) সকল মুসলমানের নিকট থেকে সাধারণভাবে বাইয়াত গ্রহণের পরই খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত উসমানের (রা) নির্বাচনের ব্যাপারেও মদীনার প্রত্যেক মুসলমানের সাথে পরামর্শ করা হয় এবং মুসলমানদের সম্মিলিত রায়ের মাধ্যমেই তাঁকে নির্বাচিত করা হয়। হযরত উসমানের শাহাদাতের পর যখন হযরত আলীকে (রা) খলীফা নির্বাচনের প্রস্তাব এলো তখন তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বললেন ঃ আমার বাইয়াত গোপনে অনুষ্ঠিত হতে পারবে না, সকল মুসলমানের সম্মতিক্রমেই তা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

এ থেকে প্রমাণ হয় যে, মুসলমানরা নিজের স্বাধীন ভোটের মাধ্যমে খলীফা নির্বাচন করতেন। কেউ গায়ের জোরে ওপর থেকে মুসলমানদের খলীফা হয়ে বসতেন না।

দ্বিতীয়ত ঃ খেলাফতে রাশেদার আমলে প্রদেশের গভর্নর ও শাসন বিভাগীয় দায়িত্বশীল কর্মচারীদেরকেও সংশ্লিষ্ট প্রদেশ ও এলাকার লোকদের সাথে পরামর্শক্রমে নিযুক্ত করা হতো। কোন এলাকার জনসাধারণ কোন সরকারী কর্মচারীকে পসন্দ না করলে তাঁকে পরিবর্তিত করা হতো।

তৃতীয়ত ঃ রাষ্ট্রের যাবতীয় বিষয় পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে স্থিরিকৃত হতো। রাষ্ট্রপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে নীতি নির্ধারণের পূর্বে জাতির নির্বাচিত বুদ্ধিজীবী ও বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর সাথে পরামর্শ করতেন। দু'টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ পরামর্শের কাজ নেয়া হতো। একটি ছিল মজলিসে শূরা এবং অন্যটি ছিল মুসলমানদের সাধারণ সভা। সাধারণত মজলিসে শূরার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের মীমাংসা করা হতো এবং কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যাপক পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন অনুভূত হলে চারদিকে সাধারণভাবে ঘোষণা করা হত এবং সমস্ত মুসলমান মসজিদে জমায়েত হবার পর আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। সম্পূর্ণ স্বাধীন পরিবেশে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হতো এবং প্রত্যেক মুসলমান নির্দ্বিধায় স্বমত ব্যক্ত করতো।

চতুর্থ বিষয় হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রপ্রধানের একার আইন প্রণয়নের কোন অধিকার ছিল না। আসল আইন ছিল কুরআন ও সুন্নাহ। কিন্তু যে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ নীরব ছিল সে ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধানের ইজতিহাদও নিছক ইজতিহাদের পর্যায়ভুক্ত ছিল। একমাত্র জাতির নির্বাচিত বুদ্ধিজীবী ও বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর ঐকমত্যের পরই তা আইনে রূপান্তরিত হতে পারতো।

খেলাফতে রাশেদার তৃতীয় মূলনীতি ছিল জনকল্যাণ। এমন একটি সামগ্রিক কল্যাণমূলক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই ছিল খেলাফতের উদ্দেশ্য যার মাধ্যমে সৎপ্রবণতার প্রসার ও অসৎ প্রবণতার মূলোচ্ছেদ হয়। এ ব্যাপারে খেলাফতে রাশেদা তিনটি মৌলিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

এক ঃ কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা। হযরত উমর (রা) বলেনঃ "হে আল্লাহ! আমি নিজের সকল এলাকার পদস্থ কর্মচারীদের ওপর তোমাকে সাক্ষী মনোনীত করেছি। আমি লোকদেরকে তাদের দীন ও তাদের নবীর সুন্নাত শিক্ষা দেবার জন্য আমার কর্মচারীদেরকে নিযুক্ত করেছি।" খোলাফায়ে রাশেদীন জনকল্যাণমূলক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে 'কল্যাণ' সম্পর্কে যথার্থ ধারণা ও তার যথার্থ পথ বাতলিয়ে দেবার প্রয়োজন মনে করতেন। আর এ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাত থেকেই লাভ করা সম্ভব হতো। তাই তারা কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা চালাতেন।

দুই ঃ সৎকাজের আদেশ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা। অর্থাৎ রাষ্ট্র সকল ভালো কাজকে প্রতিষ্ঠিত করবে। সৎপ্রবণতাকে বিকশিত করবে। সাদকা-দানের প্রচলন করবে। সততা ও ন্যায়পরায়ণতার ঐতিহ্য কায়েম

করবে। এবং ভালো কাজে সাহায্য করবে ও সৎপ্রবণতার বিকাশদানে সহায়ক প্রতিটি কাজকে উৎসাহিত করবে। অন্যদিকে সকল অসৎকর্ম ও অসৎপ্রবণতার গতিরোধ করবে এবং সমাজকে সকল রকম অসৎবৃত্তি, পাপাচার ও কলুষমুক্ত রাখবে। এভাবে ব্যক্তি ও সমাজের স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব হবে।

তিন, রাষ্ট্র জনগণের পার্থিব উন্নতির জন্য অবাধ সুযোগ–সুবিধা সৃষ্টি করবে। তাদের ওপর অন্যায়–জুলুম উৎপীড়ণ করবে না। তাদের মাথায় এমন বোঝা রাখবে না যা তারা বহন করতে অক্ষম। উপরন্তু রাষ্ট্র চেষ্টা করবে যেন তার আওতাধীনে জাতি–ধর্ম নির্বিশেষে কোন ব্যক্তি তার জীবনের মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত না থাকে। এ নীতি বিশ্লেষণ করে হযরত উমর (রা) তাঁর গভর্নর হযরত আবু মুসা আশ'আরীকে (রা) এক পত্রে লেখেন ঃ

"আল্লাহর নিকট সেই শাসক হচ্ছে সবচাইতে সৌভাগ্যবান যার কারণে তার প্রজারা সমৃদ্ধিশালী জীবন যাপন করে। আর সবচাইতে দুর্ভাগা শাসক হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার কারণে তার প্রজাবৃন্দ দারিদ্র ও অনটনের জীবন যাপন করে। তুমি নিজেকে বক্রতা থেকে বাঁচাও যেন তোমার অধীনস্থরা বক্রতা অবলম্বন না করে।"

খেলাফতে রাশেদার আমলে জনগণকে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ সরবরাহ করার প্রবণতা অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। হযরত উমর (রা) বলতেন ঃ

"আল্লাহর কসম যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে সাফা পাহাড়ে যেসব রাখাল তাদের মেষ চরাচ্ছে ঐ সম্পদ থেকে তারাও নিজেদের অংশ পাবে এবং এজন্য তাদেরকে মোটেই কষ্ট স্বীকার করতে হবে না।"

তিনি আরো বলেন ঃ

"আল্লাহর কসম, ইরাকের বিধবাদের সেবার জন্য যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে তাদেরকে আমি এমন অবস্থায় রেখে যাবো যে, আমার পর তাদের অন্য কোন আমীরের খেদমতের প্রয়োজন থাকবে না।"

খেলাফতে রাশেদার চতুর্থ মূলনীতি ছিল জনগণের অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক আজাদীর হেফাযত। হযরত উমর (রা) নিম্নোক্তভাবে জনগণকে তাদের অধিকার সংরক্ষণের জামানত দেন ঃ

"আমি কোন ব্যক্তিকে অন্যের অধিকার হরণ বা তার ওপর জুলুম করার সুযোগ দেবো না। যে ব্যক্তি এমনটি করবে আমি তার মুখের একটি অংশ

যমীনের ওপর রাখবো এবং অন্য অংশটির ওপর নিজের পা রাখবো। যে পর্যন্ত সে সত্যের সম্মুখে নত না হয় সে পর্যন্ত তাকে ছাড়বো না।"

দুনিয়ার অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের সমালোচনার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু আজকের সভ্য সমাজে অনেক কাঠ-খড় পোড়াবার এবং অনেক নাকের পানি চোখের পানি এক করার পর তবে এক ব্যক্তি এর সীমিত অধিকার লাভ করে। কিন্তু খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই জনগণ প্রত্যক্ষভাবে তাদের এ অধিকার লাভ করে। এবং এটি জনগণের নিছক অধিকার ছিল না বরং সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে এটি ছিল তাদের কর্তব্য। আর এ সমালোচনাই ছিল খেলাফত ব্যবস্থার প্রাণ।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে বিভিন্ন দল থাকলেও খেলাফত ব্যবস্থার মধ্যে কোন দলীয় প্রীতির গন্ধও ছিল না। আধুনিক বিশ্বে দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্য এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, নিজের দল ভালো বা মন্দ যাই করুক না কেন সব ব্যাপারেই তাকে সমর্থন জানানো কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ নিজের দল হচ্ছে হক ও বাতিলের মানদণ্ড। এ পদ্ধতি বিশ্ব রাজনীতিতে নানান জটিলতা সৃষ্টি করার সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বড় বড় জুলুম ও অন্যায়ের জন্ম দিচ্ছে। খেলাফতে রাশেদা ছিল এথেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

খেলাফতে রাশেদার সপ্তম মূলনীতি ছিল রাষ্ট্র পরিচালকদের দায়িত্বানুভূতি এবং এই দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টির মূল উৎস ছিল আল্লাহ বিশ্বাস ও আল্লাহভীতি। এ দু'টি বস্তুই সমগ্র খেলাফত ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও মানবতার জন্য কল্যাণময় পথে পরিচালিত করে।

যে কোন আধুনিক রাষ্ট্রে খেলাফত ব্যবস্থার এ মূলনীতিগুলো আজো প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। এবং এগুলো প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা যেখানে উজ্জ্বল সেখানে মুসলমান অন্য কোন ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে পারে না।

৫১

ইসলামী অর্থব্যবস্থার সাফল্য

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রসংগটা ইসলামী বিশ্বের সর্বত্রই আজ বহুল আলোচিত। শুধু আলোচিতই নয়, সর্বত্রই এর প্রতি প্রায় একটা স্বীকৃতি দেখা যায়। এ স্বীকৃতি কোথাও প্রচ্ছন্ন আবার কোথাও একেবারে সুস্পষ্ট আকারেই দেখা যাচ্ছে। বিংশ শতকের শেষ পাদে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার এটা একটা বড় বিজয় বলা যেতে পারে।

এত বড় বিজয় শুধু ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার একার কৃতিত্ব নয়। এর মূলে বিরাট অবদান রেখেছে প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থার ব্যর্থতা। প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থা এ শতকে তার যে চেহারা আমাদের সামনে তুলে ধরেছে তা হচ্ছে : সুদ, মুনাফাখোরী, মজুতদারী ও শোষণ। মূলত এই চারটিই হচ্ছে আধুনিক অর্থ ব্যবস্থার আসল পরিচয়। সাধারণ মানুষের জন্য এ ব্যবস্থা কোন কল্যাণের বার্তা বহন করে আনেনি। এ অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদের সুসম বন্টনের সুযোগ নেই। সম্পদের চাবিকাঠি একবার যার হাতে ঠেকেছে সে সম্পদের পাহাড় সৃষ্টি করেছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সাধারণ মানুষ খাদে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আর এ ব্যবস্থায় আর্থিক নিরাপত্তা শুধু তার জন্য যে আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী। আর্থিক দিক দিয়ে যারা দুর্বল তাদের জন্য এখানে কোন নিরাপত্তা নেই। বরং তারাই শোষিত নিগৃহীত।

বিশ্বব্যাপী এই জুলুম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুসলমানরা সজাগ হতে পেরেছে, এটিই সবচেয়ে বড় কথা। মুসলিম দেশের শাসকরাও আজ তাদের অর্থ ব্যবস্থাকে ইসলামী মূলনীতির ছাঁচে ঢালাই করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এ প্রসংগে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে একটা সহযোগিতার মনোভাবও গড়ে উঠেছে এবং তারা একে অন্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হবার চেষ্টা করছে। মুসলিম দেশগুলোর প্রতিনিধিদের মুখে আজ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার কথা সুস্পষ্ট ভাবে শ্রুত হচ্ছে। সম্প্রতি কুয়েতের বিশিষ্ট অর্থনীতি বিশারদ ও কুয়েত ফিন্যান্স হাউসের চেয়ারম্যান শায়খ আহমদ বদী ইয়াসীন পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সফর করেন এবং সে দেশে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে সেগুলো পর্যালোচনা করেন। তিনি লাহোরে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের এক সমাবেশে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদ ও

সমাজতন্ত্রের মাঝামাঝি একটি ইনসাফ ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এ ব্যবস্থায় একদিকে সূদ, মজুতদারী ও মুনাফাখোরীর অবকাশ থাকে না এবং অন্যদিকে অর্থোপার্জনের উপায় উপকরণের ওপর একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ইজারাদারী কায়েম হতে পারে না। ইসলামী ইনসাফের সুফল সবার ঘরে সমান ভাবে পৌছে যায়। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে সমগ্র সমাজের ওপর জুলুমের স্টীম রোলার চালানোর পদ্ধতিকে ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না। আবার সমাজের স্বার্থে ব্যক্তির অধিকার বিপন্ন ও গ্রাস করার পদ্ধতিও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় স্বীকৃত নয়। সূদ, মজুতদারী ও মুনাফাখোরী যা বর্তমান অর্থ ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছে–এগুলো ইসলামের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং এই ইসলাম বিরোধী অসদুপায়গুলো বর্তমান মুসলিম জীবনের যাবতীয় বিকৃতির জন্য দায়ী।

শায়খ আহমদ বদী ইয়াসীন ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রসংগে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ও ডঃ আইনী উহদার রচনাবলীর উল্লেখ করে বলেন, তাঁদের রচনাবলীর বদৌলতেই আজ সমগ্র ইসলামী বিশ্বে ইসলামী নীতির ভিত্তিতে অর্থ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কায়েম করার উৎসাহ ব্যাঞ্জক প্রচেষ্টা চলছে।

শায়খ ইয়াসীন যে প্রচেষ্টার কথা বলেছেন তা মূলত আজ প্রায় সব ইসলামী দেশেই কম বেশী চলছে। বিশেষ করে ইসলামী নীতির ভিত্তিতে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন দেশে যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে এবং এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ পর্যন্ত আশাতীতভাবে সফল হয়েছে। এ প্রসংগে সউদী আরব, দুবাই, সুদান, মিসর, কুয়েত ও বাহরাইনের ইসলামী ব্যাংকগুলোর সফল অগ্রগতির দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। পাকিস্তানের বিভিন্ন ব্যাংকে যে সূদবিহীন কাউন্টার খোলা হয়েছিল তার সফলতার কথাও ইতিপূর্বে জানা গেছে। এর ফলে সেদেশে একটি পূর্ণাংগ ইসলামী ব্যাংক কায়েম করার দাবী উঠেছে এবং হয়তো এ দাবী পুরণও করা হবে শীঘ্রই।

বাংলাদেশ সরকারও এদেশে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়েছেন। আগামী জুন মাসের মধ্যে এ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে বলে শুনা যাচ্ছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অর্থই হচ্ছে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলাদেশের অন্তরভুক্তি। এদেশে গত কয়েকশো বছর থেকে যে অর্থনৈতিক শোষণ ও নিপীড়ন চলছে, সাধারণ মানুষ যার অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে এবং একদলের মতে যা এদেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মূল, এই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার প্রচলনই একমাত্র তার

অবসানের গ্যারান্টি দিতে পারে। তবে এই অর্থ ব্যবস্থাকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ ও কর্তৃপক্ষকে আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসতে হবে এবং পূর্বাহ্নেই এর বিরুদ্ধে সব রকমের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। এই সংগে মুসলিম জনগণকেও এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে।

৫২
সামাজিক বিপর্যয় মানুষের স্বোপার্জিত ফসল

আজকের দুনিয়ায় সবচেয়ে সফল জীবনের অধিকারী কে? অনেক দিক দিয়ে হয়তো এ সফলতা যাচাই করা যেতে পারে। কিন্তু প্রথম সুযোগেই যে সফলতাটা সবার মগজে আসে সেটা হচ্ছে দুনিয়াবী ও বৈষয়িক সফলতা। দুনিয়ার মাল মাত্তা, ভোগ ও আয়েশ আরামের সামগ্রী যার সবচেয়ে বেশী করায়ত্ত সে আজকের দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশী সফল পুরুষ।

এই বৈষয়িক সফলতা লাভ করতে গিয়ে সে কি পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, কোন্ কোন্ ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে নিজের আত্মাকে কলুষিত করেছে, এটা আজ আর মোটেই বিচার্য বিষয় নয়। আজকের দুনিয়ায় এই সফলতার পেছনে অপরাধের ফিরিস্তিও সুদীর্ঘ। অপরাধীর অপরাধের শাস্তি অবশ্যই প্রাপ্য। অনেকে হাতে হাতে এ শাস্তি পেয়ে যায়। আবার অনেকে এ শাস্তি পায় স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে। অনেক সময় এ শাস্তির চেহারা হয় স্থূল। সহজে চোখে দেখা যায়। আবার অনেক সময় এমন সূক্ষ্মভাবে এর কাজ চলে যে, আপাত দৃষ্টিতে কিছুই বুঝা যায় না। তাই এই ধরনের কোন অপরাধের শাস্তি কেউ হাতে নাতে পেয়ে গেলে সাধারণ মানুষ অবাক হয়। এটাকে একটা অভিনব ঘটনা বলে মনে করে। এমনি ধরনের একটি ঘটনার উল্লেখ করে সাপ্তাহিক নিউজ উইক পত্রিকায় বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। নিউজ উইকের বিগত এক সংখ্যায় ঘটনাটিকে অভিনব ও অত্যাশ্চর্য বলা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাষ্ট্রে।

নারী হত্যার অভিযোগে এক যুবকের বিরুদ্ধে মামলা চলছিল এক আদালতে। বাদীপক্ষ হত্যার সপক্ষে কোন সাক্ষ প্রমাণ পেশ করতে না পারায় আদালত অভিযুক্তকে মুক্তি দান করে। আদালতের রায় ঘোষণার পর নিহত মেয়েটির বাপ ভরা এজলাসে আবেগময় কণ্ঠে আসামীকে শুনিয়ে বলতে থাকে ঃ "তুমিই আমার মেয়ের হত্যাকারী, একথা তুমিও জানো আর জানেন আল্লাহ। দুনিয়ার আদালতে নিজের চালাকি ও প্রতারণার জোরে তুমি নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করতে পারলে, কিন্তু এই দুনিয়ার মালিক ও প্রভুকে তুমি ধোকা দিতে পারবে না। তিনি তোমাকে মাফ করবেন না। তাঁর পাকড়াও থেকে তুমি বেশীক্ষণ নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না।"

মেয়েটির বাপ একথা বলে আদালত থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু আসামীর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল যেন তাকে কেউ যাদু করেছে। যাদুস্পৃষ্টের মতো সে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে। আদালত থেকে বেকসুর খালাস হবার সমস্ত খুশী তার উবে যায় মুহূর্তেই। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সে হনহন করে বাইরে বেরিয়ে আসে। রাস্তা পার হতে গিয়ে হঠাৎ একটা দ্রুতগতি সম্পন্ন গাড়ির চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে যায় সে।

নিউজ উইক এ ঘটনাটিকে অভিনব বলে বিস্ময় প্রকাশ করেছে। কিন্তু আমাদের মতে এটা মোটেই কোন অভিনব ঘটনা নয়। দুনিয়ার বুকে এমনি ঘটনা হরহামেশা ঘটছে। তবে হয়তো তাদের বাইরের চেহারা–সুরাত ও ধরন ধারণের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কখনো আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ী অপরাধী সরাসরি তার চূড়ান্ত পরিণতির সম্মুখীন হয়। আবার কখনো বা অধিকাংশ সময় দেখা যায় আল্লাহর বিধান ভংগকারী ধীরে ধীরে তার শেষ পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার মানসিক প্রশান্তি সম্পূর্ণ খতম হয়ে গেছে। এই দুনিয়ায় সে যতগুলো সফলতা অর্জন করেছিল তার প্রত্যেকটাই তাকে নতুন মানসিক অশান্তি, নৈরাজ্য, মনপীড়া, কষ্ট, শোক, দুশ্চিন্তা ও এই ধরনের আরো নানা সংকটের আবর্তে নিক্ষেপ করে চলছে। বাইর থেকে তাকে যতই সফল ব্যক্তি বলে মনে হোক না কেন জানালার কপাট খুলে তার ভিতরে একটু উঁকি দিলেই দেখা যাবে তার ভেতরের পাংশুবর্ণ চেহারা, তার চুপসে যাওয়া গাল ও কোটরাগত চোখ। তার ভেতরের আত্মাটির নিসাড় কান্না কানে আসবে। সারারাত ধরে দুচোখের পাতা এক করার জন্য তার সে কী প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। বিভিন্ন প্রকার ট্যাবলেট, ইনজেকশান প্রয়োগ করে সে এক দু'ঘন্টা একটু আরামে ঘুমুবার জন্য। আল্লাহর বিধান অমান্য করে তাঁর তৈরী করা সহজ সরল পথে অগ্রসর না হয়ে অন্য যে কোন পথে জীবন যাপনের চেষ্টা করা হবে, তা এভাবেই প্রতি পদে পদে ব্যর্থতা ডেকে আনবে। দুনিয়ায় আয়েশ আরামের সমস্ত উপাদান থাকা সত্ত্বেও আরাম ও শান্তি কর্পূরের মতো উবে যাবে। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্যই এটা সমান সত্য।

আল্লাহর বিধান অস্বীকার করে যে ব্যক্তি–জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার দুর্ভোগ আজ চরমে পৌছে গেছে। পারিবারিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ ধ্বসে পড়েছে। প্রত্যেকটি গৃহ আজ জেলখানার এক একটি খাঁচায় পরিণত হয়েছে। কিছু লোককে সাময়িকভাবে সেখানে এনে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। প্রথম সুযোগেই তারা প্রত্যেকেই খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত। যে সমাজ যত বেশী সভ্য ও উন্নত বলে পরিচিত সে–ই গোমরাহী,

স্বার্থান্ধতা ও অপরাধ প্রবনতায় তত বেশী পাকাপোক্ত। লক্ষহীনতার ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আতংকগ্রস্ত করে রেখেছে। যুবকরা নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তায় পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। বার্ধক্যের সীমানার দিকে অগ্রসরমান জনতা আগামী দিনগুলো কিভাবে কাটবে, এ চিন্তায় পেরেশান। জোয়ান ছেলে এক সময় বুড়ো বাপের জন্য লাঠির কাজ করতো। আধুনিক সভ্যতা ও তার সীমাহীন ভোগলিপ্সা এই শক্ত লাঠিটাও বুড়ো বাপের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে। নিরাপত্তাহীনতা, মানসিক অস্থিরতা, অশান্তি, সব কিছু আমি একাই ভোগ করবো এই মনোভাব এবং সীমাহীন লালসা আল্লাহদ্রোহী ও আল্লাহহীন সমাজ ব্যবস্থাকে কার্যত জাহান্নামে পরিণত করে দিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী এই ভয়াবহ অবস্থা আজ হঠাৎ সৃষ্টি হয়নি। ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ - (الروم : ٤١)-সমগ্র বিশ্বে–জলে–স্থলে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তা মানুষের স্বোপার্জিত।–(কুরআন) আসলে আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ী তাঁর নাফরমান ও বিদ্রোহী বান্দাদের এটি প্রাপ্য। নিজেদের নাফরমানীর এই প্রতিফল তাদের এই দুনিয়াতেই ভোগ করতে হচ্ছে। যে জিনিসটাকে তারা নিজেদের জন্য ভালো মনে করছে সেটিই প্রমাণিত হচ্ছে তাদের জন্য ক্ষতিকর। মানবিক বুদ্ধি ও বিবেচনার জন্য এর চেয়ে বড় ট্রাজেডি আর কী হতে পারে।

আমাদের বোধোদয় হবে কি?

আমাদের সমাজের চিরন্তন মূল্যবোধগুলো আজ আর স্বস্থানে টিকে নেই। বিগত দ'শো সোয়া'দুশো বছর থেকে তা প্রবল সংঘাতের মুখোমুখি হয়েছে। ইংরেজ আধিপত্যের দু'শো বছর তার প্রতিরোধ ক্ষমতা তবুও এক পর্যায়ে বিরাজ করছিল। কিন্তু ইংরেজ আধিপত্য মুক্ত বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ও নৈতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা যেন দ্রুত কর্পূরের মতো উবে যেতে থাকে। বিগত মাত্র তিন দশকে আমাদের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের একটা বিরাট অংশ এমনভাবে পশ্চাদপসরণ করেছে, যা একটা স্বাধীন দেশে কল্পনাতীত। সেখানে স্থান করে নিচ্ছে পাশ্চাত্যের সামাজিক মূল্যবোধ। আমাদের জাতীয় সকল অংগণ এই নতুন মূল্যবোধের জয়গানে মুখরিত। রাষ্ট্রযন্ত্র, শিক্ষা বিভাগ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অংগণ প্রভৃতির মাধ্যমে এ মূল্যবোধের প্রসার ঘটানো হচ্ছে।

সামাজিক মূল্যবোধের কথাই বিশেষভাবে বলছি। মাত্র তিরিশ বছর আগে আমরা কোথায় ছিলাম এবং আজ কোথায় এসে পৌছেছি। তিরিশ বছর আগেও যে সামাজিক মূল্যবোধগুলোর বাঁধন অটুট ছিল আজ তার ঢিলেমি সুস্পষ্ট। পর্দা আমাদের সমাজের একটা বিশিষ্ট অংগ ছিল এবং নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার কোন সুযোগ এ সমাজে ছিল না। এক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে বিধৃত ইসলামী সমাজের পূর্ণাংগ চিত্র এখনো ফুটে না উঠলেও ইসলামী সমাজের কাছাকাছি থাকার প্রবণতা ছিল তার হৃদয়ের একান্ত কামনা। আর আজ এ কামনা ক্ষীণতর। জাতিগত ভাবে আমরা এ মূল্যবোধকে যেন আর তত আমল দিচ্ছি না। কিভাবে এর বাঁধন ছেঁড়া যায় এ প্রয়াস সামগ্রিকভাবে লক্ষণীয়। পাশ্চাত্য জীবনবোধের সাথে সাথে তার সামাজিক মূল্যবোধও আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। এ যাদুকাঠির স্পর্শে আমাদের সমাজকে তাই রাতারাতি পাশ্চাত্যের কায়দায় আধুনিক করার প্রচেষ্টার বিরাম নেই। কিন্তু এ মূল্যবোধের যাদুকাঠি পাশ্চাত্য সমাজকে কোথায় নিয়ে ঠেকিয়েছে তা আজ কারোর অজানা থাকার কথা নয়। আজকের পাশ্চাত্য সমাজ চিন্তায় এটা বোধ হয় সবচাইতে আলোচ্য বিষয়। এ মূল্যবোধ তাদের সমাজে যে অবক্ষয় ডেকে এনেছে তার গতিরোধের কোন পথই তারা দেখছে না। এর গতিরোধে তারা যতই নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন ও উদ্বোধন করছে

ততই নতুন অবক্ষয় এবং ধ্বংসের অন্তরজ্বালায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে তাদের জীবনাংগণ। তাই তাদের সমাজ বিশেষজ্ঞদের কন্ঠস্বর আজ হতাশায় ডুবে যাচ্ছে। তাদের এতদিনকার বহুনিন্দিত ইসলামের সামাজিক মূল্যবোধগুলোর সত্যতার প্রতি আজ তাদের কারোর কারোর অদ্ভুত প্রত্যয় ফুটে উঠছে।

এমনি এক প্রত্যয়ী সুর বেজে উঠেছে বর্ষিয়সী মার্কিন মহিলা সাংবাদিক হেলেনের কন্ঠে। আমেরিকার সাংবাদিক জগতে হেলেনের পরিচিতি অত্যন্ত ব্যাপক। অন্তত আড়াইশো পত্র-পত্রিকার সাথে তিনি লেখার সূত্রে জড়িত। সম্প্রতি তিনি মার্কিন সমাজে নৈতিক অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ বছরের কম বয়সের যুবক যুবতীদের সমস্যা নিয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন এবং এক্ষেত্রে সৃষ্ট জটিলতার সমাধানের উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবার জন্য তিনি দুনিয়ার বহু দেশ সফর করেছেন। সেখানে অবস্থান করেছেন। বিভিন্ন দেশের যুবক যুবতীদের অবস্থা গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এ সূত্রে তিনি আরব দেশগুলোও সফর করেন। সেখানকার সমাজে পর্দা প্রথা এবং নারী পুরুষের মধ্যে অবাধ মেলামেশার ওপর বিধিনিষেধ তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন আরবী পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে তিনি বলেন : "আরব মুসলমানদের সমাজ একটি সুস্থ মানবিক সমাজ। এখানকার সামাজিক নীতি এতই যুক্তিসংগত ও ভারসাম্যপূর্ণ যে, প্রত্যেকটি যুবক ও যুবতীর জন্য তা গ্রহণীয় হওয়া উচিত। আমেরিকা ও সমগ্র ইউরোপীয় সমাজে এসব নীতির বালাই নেই। সেখানে ছেলে মেয়েদের অবাধ মেলামেশার সাধারণ অনুমতি রয়েছে। মেয়েদের ওপর কোন বিধি নিষেধ আরোপিত নেই। এমনিভাবে বাপমায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বোধও সেখানে খতম হয়ে গেছে। আর এসবের ফলে সেখানকার সমাজ জীবন সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধ হারিয়ে বসেছে। নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা সমগ্র সমাজদেহকে কলুষিত করেছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছদ্মাবরণে সামজদেহ শিকার হয়েছে পর্বত প্রমাণ নৈরাজ্য ও বিশৃংখলার। এর মোকাবিলায় আরব মুসলমানদের সমাজে মেয়েদের ওপর এক পর্যায়ে বিধিনিষেধ আরোপিত রয়েছে, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন এখানে অপরিহার্য গণ্য হয়েছে এবং এখানকার সামাজিক আইন এমন উন্নত ভিত্তিতে রচিত হয়েছে যার ফলে একটি সৎ সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে, নৈতিক মূল্যবোধগুলো বিকশিত হয় এবং নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণীই তাদের যথার্থ অধিকার ও সম্মান লাভ করে।"

মিসেস হেলেন বিশ্ব সমাজ পর্যালোচনার পর আরব মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য সমাজের রীতিনীতি নিজেদের সমাজে আমদানী করে পাশ্চাত্য সমাজের নৈরাজ্য ও হতাশায় নিজেদের সমাজদেহকে জরাগ্রস্ত না করার উপদেশ দেন। তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেন, এর ফলে এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে মুসলমানদের সমাজে পাশ্চাত্য সমাজের ধ্বংস নেমে আসবে।

বিপুল অভিজ্ঞতাপুষ্ট আমেরিকার এ বর্ষিয়সী নারীকন্ঠ হতাশাক্লিষ্ট পশ্চিমের বিভিন্ন অংগণ থেকে উচ্চারিত সত্যের আওয়াজের মধ্য থেকে একটি আওয়াজ মাত্র। এমনি সত্যের বহু আওয়াজ আজ সেখান থেকে ধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের পরানুকরণে অভ্যস্ত নব্য জাতীয় ও সমাজ নেতাদের এতে বোধোদয় হবে কি? আমাদের জাতীয় আদর্শ, ভাবধারা ও ঐতিহ্যের প্রতি অনীহা, অশ্রদ্ধা ও অবহেলা আমাদের ভবিষ্যতকে কোন্ সূত্রে গ্রথিত করছে? বর্তমানই বা আমাদের সামনে কতটা উজ্জ্বল? পশ্চিমের কারিগরি ও জ্ঞানগত উন্নতি অর্জনের জন্য তাদের সামাজিক ব্যাধিগুলোও কি আমাদের সমাজ দেহে পুষে রাখতে হবে? আমাদের কিশোর ও যুব সমাজের মধ্যে পশ্চিমের অপরাধ প্রবণতার পুনরাবৃত্তি না ঘটালে কি আমাদের জাগতিক ও বস্তুগত উন্নতি চিহ্নিত হবে না? আমাদের জাতীয় পুনরগঠনের ক্ষেত্রে এ প্রশ্নগুলো একটি সরল রেখায় গ্রথিত হয়ে আমাদের জাতীয় চেতনাকে আঘাত করছে। আমাদের বোধোদয় হবে কি?

৫৪
মেয়েদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম

কয়েক দিন আগে একটি বিদেশী পত্রিকায় পড়ছিলাম একজন আমেরিকান নওমুসলিমার কথা। অবশ্য তিনি সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেননি। ষোল বছর হয়ে গেছে তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর। কিন্তু এখনো তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের স্মরণীয় ঘটনাকে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে বর্ণনা করার সময় একটুও ক্লান্তি অনুভব করেন না।

আমেরিকান নওমুসলিমা আয়েশা আদবীয়া বর্তমানে তাঁর পাকিস্তানী স্বামীর সাথে নিউইয়র্কে বাস করছেন। দুই স্বামী-স্ত্রী মিলে তাঁরা ইমপোর্ট এক্সপোর্টের বিরাট ব্যবসা গড়ে তুলেছেন। ব্যবসায়ের কারণে এখন তাঁকে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ সফর করতে হচ্ছে।

নওমুসলিমা আয়েশার ইসলাম গ্রহণের চমকপ্রদ ঘটনা বা ব্যবসায়ের উন্নতির বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনায় বসবো না। এ ব্যাপারে আলোচনার অনেক কিছুই রয়েছে। তবুও আমরা অন্য প্রসংগে আসতে চাচ্ছি। ইউরোপ-আমেরিকায় আজকাল প্রতিদিন বেশ কিছু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করছেন। এরা সবাই উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষিত। এদের মধ্যে আবার মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। এরও একটা বিশেষ কারণ রয়েছে। আয়েশা এ কারণটিই বর্ণনা করেছেন বড় চমৎকার করে। তাঁর মতে ইসলাম মেয়েদের যে মর্যাদা দিয়েছে ইউরোপ ও আমেরিকা তা দিতে পারেনি। আয়েশা বলেন, "ইউরোপ আমেরিকার মেয়েরা নিরাপত্তাহীনতা ও ভয়াবহ শোষণের শিকার। অধিকারের সন্ধানে মেয়েরা একবার যখন ঘরের নিস্তরঙ্গ শান্তিময় উঠান পার হয়ে যায়, তখন অধিকার নামক মরীচিকার পেছনে ছুটতে ছুটতে তারা একদিন নিজেদের সবকিছু বিকিয়ে বসে।"

এটা আয়েশার নিছক কোন মন্তব্য নয় তাঁর জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফসল। তিনি নিজে আমেরিকান সমাজের একজন সদস্যা। তিনি আজন্ম আমেরিকান। আমেরিকার এমন এক সমাজে তিনি গড়ে উঠেছেন, যেখানে মেয়েরা নিজেদেরকে পুরুষদের সমপর্যায়ের মনে করে এবং পুরুষদের সাথে সবক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে চলছে। মেয়েরা নিজেদের মধ্যে পুরুষোচিত গুণাবলী সৃষ্টিতে সব সময় সচেতনভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আয়েশা আদবীয়ার নিজের বক্তব্য অনুসারে তিনি ছিলেন একজন অত্যাধুনিকা ভ্রষ্টা মহিলা। চেন স্মোকার ছিলেন এবং দিনরাত মদের মধ্যে ডুবে থাকতেন। তারপর ঘটনাক্রমে ইসলামের দাওয়াত পেলেন। ইসলামী বইপত্র পড়তে থাকলেন। তিনি পড়লেন ইসলাম মদ হারাম করে দিয়েছে। উলংগ থাকা বা এমন পোশাক পরা যার ফলে মেয়েদের উলংগ দেখায়, এর অনুমতি ইসলাম দেয়নি। ইসলাম জীবনের সব ক্ষেত্রে একটা মানদণ্ড কায়েম করেছে। আয়েশা নিজের ভুলগুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন এবং নিজের অজান্তেই একদিন নিজেকে ইসলামের চৌহদ্দীর মধ্যে দেখতে পেলেন। সর্বনাশের গভীর উপলব্ধি তাঁকে সত্যের কাছাকাছি পৌছিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু মুসলিম দেশগুলো সফর করার সময় মুসলিম মেয়েরা তাঁকে সবচেয়ে বেশী নিরাশ করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, মুসলিম দেশগুলো সফর করার সময় আমি দেখি সেখানকার বেশীর ভাগ মুসলমান মেয়ে ইউরোপ আমেরিকার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তারা নিজেদেরকে অত্যাধুনিকা প্রমাণ করার জন্য পশ্চিমা লেবাস-পোশাক ও পশ্চিমা সংস্কৃতির মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। অথচ ইউরোপ আমেরিকার কোন মেয়ে যখন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন সে সর্বপ্রথম নিজেকে এই সমাজের বন্ধন থেকে মুক্ত করে নেয়- যেখানে নেশাজাত দ্রব্য ব্যবহার, মদপান, উলংগতা ও নির্লজ্জতা সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গেছে। এটা বড়ই কঠিন কাজ। কিন্তু ইসলামের কল্যাণে নিজেকে আপ্লুত করার জন্য ইউরোপ-আমেরিকার নওমুসলিম মেয়েরা তাদের সমাজের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কারণ তারা জানে ইসলাম গ্রহণ করার পর নারী হিসেবে তাদের মর্যাদা কত উন্নত হয়ে গেছে। আসলে ইসলাম মেয়েদেরকে যে উন্নত মর্যাদা দান করেছে অমুসলিম মেয়েরা তা উপলব্ধি করতে অক্ষম। তবে ইসলামকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করার পর তারা তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

মুসলিম দেশগুলোয় পাশ্চাত্য প্রভাবিত মেয়েদের অধিকার দাবীর প্রসংগে তিনি বলেন, এই সব মেয়েদের দাবীগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বুঝা যাবে দাবীর আড়ালে তারা আসলে ইসলামের পথ থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিতে চায়। যদি পাশ্চাত্যের মানদণ্ডের রঙীন চশমায় মেয়েদেরকে দেখার চেষ্টা না করা হয় তাহলে সহজেই অনুধাবন করা যাবে যে, ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার কোন বিতর্কিত বিষয় নয়। তিনি বলেন, কিছু কিছু মুসলমান মেয়ের পক্ষ থেকে অধিকারের দাবী আমাকে অবাক করেছে। তারা কিসের দাবী করছে? তারা কি সেই স্থানে অবস্থান করতে চায় যে স্থানে আজ

ইউরোপ–আমেরিকার মেয়েরা অবস্থান করছে এবং যেখান থেকে বের হবার জন্য আজ তারা অস্থির উৎকণ্ঠায় দিন গুণছে?

আমেরিকা ও ইউরোপের যে সমাজে মেয়েরা তাদের অধিকার লাভ করেছে বলে আমাদের দেশের একদল মেয়ের কণ্ঠ সাম্প্রতিক কালে অত্যন্ত সোচ্চার হয়েছে সে সমাজটির চেহারা কি? সেখানে কি মেয়েরা সত্যিই মেয়ে হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে? না, এ মর্যাদা লাভ করার জন্য তাদেরকে পুরুষদের সাথে সমানে সমানে পাল্লা দিতে হচ্ছে। মর্যাদা লাভের জন্য তাদের পুরুষ সাজতে হচ্ছে। মেয়ে হিসেবে মেয়েদের স্থানে অবস্থান করে তারা পুরুষদের সমমর্যাদা পাচ্ছে না। একশো জন মেয়ের মধ্যে ক'জনের পক্ষে এটা সম্ভব? এই অসম্ভব ও অসম প্রতিযোগিতার দৌড়ে মেয়েরা আজ হাঁপিয়ে উঠছে। এই প্রতিযোগিতার দৌড়ে মেয়েদের আজ পেছনে ফেরার কোন উপায়ই নেই। যে গৃহের শান্ত, সুশৃংখল ও মধুময় পরিবেশ তারা একবার ত্যাগ করেছে তার মধ্যে ফিরে যাবার তাদের আর কোন পথই নেই। অফিস, ক্লাব আর বাইরের মোহময় জীবনে নিজেদের ধ্বংস করাই এখন তাদের একমাত্র পথ রয়ে গেছে।

আমাদের দেশে যারা মেয়েদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন আয়েশা আদবীয়া এবং পশ্চিমা সমাজের আরো বহু ভুক্তভোগী মেয়েদের অভিজ্ঞতা থেকে তারা অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করবেন। ইসলাম মেয়েদের যে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার দুঃসাহস কোন ব্যক্তির, সমাজের ও রাষ্ট্রের নেই। আজ আমাদের সমাজের সবক্ষেত্রে এই অধিকার ক্ষুণ্ন হবার কারণে মেয়েরা নিজেদের অসহায় বোধ করছে। আর এই অধিকার ক্ষুণ্ন হবার পেছনে ইসলাম সম্পর্কে, শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতাই বিপুলভাবে দায়ী। ইসলাম যে অধিকার দিয়েছে, সে সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই তা আদায় করার চেষ্টা না করে বরং পাল্টা অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালানো হচ্ছে। ইসলাম যে অধিকার দিয়েছে তা মেয়েদের জীবনের সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর যে অধিকার আদায়ের জন্য মেয়েরা এখন আন্দোলন চালাচ্ছে, মূলত তাদের জীবনের সাথে তার কোন সামঞ্জস্য নেই।

যেমন ধরা যাক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। ইসলাম মেয়েদের যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিয়েছে তা অন্য কোন সমাজে নেই।

কাজেই ইউরোপ–আমেরিকার মেয়েরা নিজেদের সত্তাকে বিকিয়ে দিয়ে যতটুকু অর্জন করতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে তার দিকে অগ্রসর না হয়ে আমাদের দেশের মুসলিম মেয়েদের ইসলাম প্রদত্ত অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করা উচিত।

মানুষের সমাজের প্রথম সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন একজন পুরুষ ও একজন নারী। অন্তত দু'জনের কমেতো একটা সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। তাই আমরা প্রথমে দু'জন পুরুষ ও নারী ধরে নিলাম। অবশ্য ডারউইনী বিবর্তনবাদের দৃষ্টিতে বিচার করলে দু'জন পুরুষও হতে পারে আবার দু'জন নারীও হতে পারে। কারণ অন্য প্রজাতি থেকে যখন তারা মানুষের দিকে মোড় নিতে থাকে তখন হয়তো সেই প্রথম দলটি একদল পুরুষ বা নারী পশু ছিল। সেখানে তো কোন পরিকল্পনা ছিল না, সেখানে ছিল ঘটনাচক্র। আর আমাদের বিশ্বাস মতে বিশ্ব জাহানের সৃষ্টির মূলে একটা পরিকল্পনা রয়েছে। কাজেই প্রথমে মৌলিকভাবে একজন পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করা হয়। তারপর তাদের থেকে গড়ে ওঠে মানুষের বৃহত্তর সমাজ।

যাক মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নয়। সমাজের কথা বলছিলাম। এই সমাজের দু'টোই স্তম্ভ। পুরুষ ও নারী। সমাজে দু'জনের অবস্থান ও কর্মক্ষেত্র কি সমান? দু'জনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রকৃতি কি এক? আজকের দুনিয়ায় এটা একটা বিতর্কিত বিষয়। সম্প্রতি চীনে এই নিয়ে বেশ একটা বিতর্কের ঝড় উঠেছে। "পরিবারের বোঝা কে উঠাবে?" পুরুষ না নারী? নাকি দু'জনে মিলে? রাজধানী বেইজিংয়ের একটি প্রভাবশালী দৈনিকে এ ব্যাপারে একটি বিতর্ক ফাঁদা হয়েছে। পত্রিকার বক্তব্য হচ্ছে পরিবারের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ ও ভরণ- পোষণের দায়িত্ব পুরুষের ওপর থাকতে হবে এবং অন্যদিকে মেয়েদের দায়িত্ব হবে শুধু গৃহস্থালীর কাজ–কারবার পরিচালনা ও ছেলে–মেয়েদের দেখাশুনা করা। কিন্তু পত্রিকা তার এই বক্তব্যের সমর্থনে অতি অল্প সংখ্যক লোকের সমর্থন লাভ করতে পেরেছে। অধিকাংশ লোক তার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে। তানচাংয়ে মেয়েদের একটি সংস্থা এই ব্যাপারে জনমত যাচাইও করেছে। কিন্তু এই জনমত যাচাইয়ে শতকরা নব্বই জন মেয়ে বিরোধী মত প্রকাশ করেছে। কেউ কেউ আবার একথাও বলেছে যে, মেয়েদের অফিস–আদালত, কল–কারখানা থেকে সরিয়ে দিয়ে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে বন্ধ করে দিলে চৈনিক সমাজ অনেক পিছিয়ে পড়বে। অনেকে একে মেয়েদের অধিকার হরণ বলে দাবী করেছে। অনেকে প্রস্তাব করেছে এটা কেবলমাত্র এমন এক অবস্থায় গ্রহণীয় হতে পারে যখন চাকুরীরত মেয়েদের স্বামী, বাপ বা ভাইদের বেতন

দ্বিগুণ করে দেয়া হবে, যাতে তারা সংসারের আর্থিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হয়। আবার কোন কোন মহলের মতে, মেয়েদের কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ চাকুরীগুলো থেকে সরিয়ে দেয়া উচিত।

সমাজে নারী–পুরুষের অবস্থানের এ প্রসংগটি চীনে আজ প্রথম আলোচিত নয়। ইতিপূর্বে যখন থেকে চীনের জনসাধারণ কমিউনিজম ও মার্কসবাদী দর্শন এবং তথাকথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে সমালোচনা মুখর হয়েছে তখন থেকে বিভিন্ন আকারে এ প্রসংগটি বার বার এসেছে। একবার তো একটি পত্রিকা সুস্পষ্টভাবে লিখেছিল যে, গৃহ হচ্ছে নারীর আসল ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান। কারণ প্রকৃতি তাকে এ জন্যই তৈরী করেছে। গৃহ পরিচালনা এবং সন্তান ও স্বামীর দেখাশুনা করাই তার স্বাভাবিক বৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যশীল। সে সময় এবং আজ চীনের এই পত্রিকাগুলো ও তাদের সমমনাদের বক্তব্য চীনের অধিকাংশ অধিবাসীর কাছে গৃহীত হয়নি ঠিকই, কিন্তু চীনাদের চিন্তা–ভাবনায় যে পরিবর্তন আসছে এটা তারই আলামত। আজ হয়তো মাত্র কয়েকজন এ কথা চিন্তা করছে কিন্তু এ চিন্তাটা প্রসারিত হতে থাকবে এবং চীনা জনগণ যতই বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হবে ততই এ চিন্তার বিস্তৃতি ঘটবে। জীবন ও জগত সম্পর্কে চীনের জনগণের দৃষ্টিভংগি ততই পরিবর্তিত হতে থাকবে।

এখানে আমরা বিদগ্ধ পাঠক সমাজকে বিশেষ করে যে বিষয়টা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে, আমরা এখানে সেই চীনের কথা আলোচনা করছি, যে চীন কেবল কমিউনিজমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই নিজের জন্য একটি বিরাট নিয়ামত বলে গ্রহণ করেনি বরং এই সাথে প্রাচ্যের একটি সুসভ্য দেশ ও প্রাচ্যের শালীন সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী ধারক হওয়া সত্ত্বেও মার্কসবাদের আল্লাহবিহীন ও নৈতিক মূল্যবোধ বিবির্জিত সাংস্কৃতিক জীবনধারাকে আঁকড়ে ধরেছিল। জীবনের সবক্ষেত্রে এই আল্লাহবিহীন সংস্কৃতির প্রসারে তারা চল্লিশটা বছর ব্যয় করেছে। মানুষের মন ও সমাজ থেকে স্রষ্টার ধারণা এবং মানবিক নৈতিক মূল্যবোধগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নির্মূল করার জন্য তারা নিজেদের সর্বশক্তি ব্যয় করেছে। এক সময় মনে হচ্ছিল বুঝি চৈনিক সমাজ থেকে মানবতা, ভদ্রতা ও সূক্ষ্ম মানবিক নৈতিক বৃত্তিগুলো বিদায় নিয়েছে। মানুষ ও পশুর মধ্যে বুঝি আর সেখানে কোন পার্থক্য নেই।

কিন্তু চীনের সচেতন জনসমাজ শীঘ্রই নিজেদের ভুল বুঝতে পারলো। কমিউনিজম ও মার্কসবাদের ধ্বংসকারিতা তাদের সচেতন করে দিল। সমাজে

নারীর অবস্থান নিয়ে আজ চীনে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে এটি তাদের সেই সচেতনতারই একটি অংশ, কিন্তু নারীকে গৃহের কর্ত্রীর আসন থেকে টেনে এনে তাকে জনবহুল বিপণী কেন্দ্রের মাঝখানে একটি সুশোভিত পণ্য সামগ্রী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেবার অপরাধ শুধু একা চীন বা রাশিয়ার নয়, যারা স্রষ্টার অস্তিত্বেই বিশ্বাস করে না যে স্রষ্টা নারীকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টাকে স্বীকার করে যে অকমিউনিস্ট বিশ্ব, যেখানে ধর্ম আছে, নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমাজ দেহও আছে তারাও সমানভাবে বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ এই অপরাধে অংশীদার। এই অকমিউনিস্ট বিশ্বে স্রষ্টা আছে কিন্তু স্রষ্টার সঠিক ধারণা নেই। পরকাল, কর্মফল এবং জীবন ও জগত সম্পর্কীয় যথার্থ জ্ঞান ও বিশ্বাস থেকে তারা বহু দূরে অবস্থান করছে।

কিন্তু মানুষের প্রকৃতিকে তো অস্বীকার করা যায় না। মানুষ কতদিন প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে? একদিন তাকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে আবার যথার্থ প্রকৃতির দিকে ফিরে আসতে হয়। কৃত্রিমতার সমস্ত মুখোশ টেনে খুলে ফেলে দিতে হয়। তাইতো ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং আমেরিকায়ও আজ মেয়েদের আসল প্রকৃতি জেগে উঠছে। তাইতো কারখানা ও অফিসে পুরুষদের ভীড়ের চাপ থেক মুক্ত হয়ে এবং বাজারের পণ্য সামগ্রীর আসন থেকে উঠে এবার তারা গৃহকোণে শান্তির অন্বেষায় মাথা খুঁড়ছে। পাশ্চাত্য দুনিয়ায় মেয়েদের এ ধরনের ঘরে ফেরার ডাক প্রায়ই মাঝে-মধ্যে শোনা যায়।

চীনের একশ্রেণীর মানুষের ডাক এই ডাকের সাথেই একাত্ম হয়ে গেছে। এটা আসলে প্রকৃতির ডাক। মানুষকে এই প্রকৃতির ডাক দেবার দায়িত্ব পালন করে এসেছে প্রকৃতির ধর্ম ইসলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় মানুষ সজ্ঞানে তার ডাকে সাড়া দেয়নি। আজ অসচেতনভাবে হলেও মানুষ ইসলামের সেই ডাকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ইসলাম গৃহস্থালী পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব দিয়েছে মেয়েদের আর পুরুষদের ওপর দিয়েছে অর্থোপার্জনের দায়িত্ব। জীবনের আরো কোন কোন প্রয়োজন মতো ক্ষেত্রে ইসলাম মেয়েদের পুরুষদের সাথে কাজ করার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে যথেচ্ছ ভাবে কল-কারখানায়, অফিস-আদালতে, পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মেয়েরা কাজ করে যাবে-এ অনুমতি ইসলাম দেয়নি। চীনে ও পাশ্চাত্য দুনিয়ার আজকের এ আওয়াজ তাই ইসলামের প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনারই প্রতিধ্বনি মাত্র।

৫৬
মেয়েদের জন্য কোন্‌টা ভালো?

আজকের দুনিয়ায় মেয়েরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সংসারের চৌহদ্দি ডিঙ্গিয়ে বৃহত্তর জীবনের সব ক্ষেত্রে পুরুষদের সমানে সমানে মোকাবিলা করছে তারা। সখের মোকাবিলা নয়। অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বলে একে তারা ঘোষণা করেছে। এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে আজ তাদের প্রবেশ ঘটেনি। খেলাধূলা ও শরীর চর্চায় মেয়েরা অংশ নিচ্ছে। বিজ্ঞান, কারিগরী ও মহাশূন্য পরিক্রমায় তারা অংশ নিচ্ছে। শিক্ষা-দীক্ষায়, চাকুরী-বাকুরীর ক্ষেত্রে তো তারা ব্যাপক হারে প্রবেশ করেছে। কোর্ট-কাছারীতে, আইন ব্যবসায়েও মেয়েরা নেমেছে। এমন কি যে এলাকাটা মেয়েদের জন্য কঠিন, দুসাধ্য ও অসাধ্য মনে করা হয়েছিল অর্থাৎ পুলিশ ও সামরিক বাহিনী সে এলাকাও বহু দেশে তারা দখল করেছে। আর প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী হয়ে তো কয়েকটি দেশেই মেয়েরা বেশ রাজনীতি করে যাচ্ছে। সংসার পরিচালনা করতে করতে একেবারে দেশ পরিচালনার মহড়ায়ও তারা পিছিয়ে পড়েনি।

এক কথায় বিংশ শতাব্দীকে মেয়েদের স্বর্ণযুগ বলা যায়। মেয়েদের এ স্বর্ণযুগে আমাদের দেশেও মেয়েরা পিছিয়ে নেই। মেয়ে পুলিশ বাহিনী আমাদের দেশেও গঠিত হয়েছে। কিছুদিন আগেও রাজধানীর পথের মোড়ে মোড়ে তারা দর্শনীয় হয়ে উঠেছিল। আনসার বাহিনীতে তারা অংশ নিয়েছে। সামরিক বাহিনীতেও তারা প্রবেশ করবে। ধীরে ধীরে মেয়ে ব্যাটালিয়ান, মেয়ে ব্রিগেড ও মেয়ে ডিভিশন গড়ে উঠবে। কথায় কথায় বটি-খুন্তি নিয়ে দাম্পত্য লড়াইয়ে বাংগালী মেয়ের রেকর্ড এখন হেভী মেশিনগান ও আধুনিক সমরাস্ত্র সুদক্ষ পরিচালনার মধ্যে কোথায় লুকিয়ে যাবে।

কিন্তু নারী স্বাধীনতা ও নারী অগ্রগতির এ স্বর্ণযুগে হঠাৎ কেমন একটা বেসুরো সুর বেজে উঠলো আমাদের প্রতিবেশী দেশের একটি রাজ্য থেকে। প্রতিবেশী দেশ ভারতের উত্তর প্রদেশের শ্রম মন্ত্রণালয় সম্প্রতি একটি জরীপ চালিয়েছেন। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, স্বাস্থ্য বিভাগ, ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং সরকারী কারখানাসমূহে কর্মরত মেয়েদের মধ্যে এ জরিপ কাজ চালানো হয়। এ জরীপে দেখা যায়, প্রত্যেক তিনটি মেয়ের মধ্যে একটি মেয়ে তার কর্মরত সংগীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়। অনেক সময় তাদের

অফিসাররা গায়ে পড়ে তাদের সাথে সম্পর্ক গভীর করার আশায় মেতে ওঠে এবং এ ব্যাপারে তাদের প্রতিক্রিয়ার আলোকে তাদের কর্মযোগ্যতা যাচাই এবং পদোন্নতির বিষয় বিবেচনা করে। সবচাইতে খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় চতুর্থ শ্রেণীর মেয়ে কর্মচারীদের। শতকরা ৫ জন মেয়েকে তাদের উপরস্তদের কামনার শিকার হতে হয়েছে। শতকরা ১০ জন মেয়ে তো পুরুষদের সাথে কাজ করা অসহ্য বলে ঘোষণা করেছে। জরীপে মেয়েরা একথা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছে যে, "তাদের এই স্বাধীনতা ও পুরুষদের সাথে সমানে সমানে পাল্লা দেবার ব্যাপারে কোন আগ্রহ নেই। তারা তো নিছক নিজেদের পরিবারের আয়ের অংক কিছুটা বাড়াবার জন্য এ প্রতিযোগিতার ময়দানে নেমেছিল। নয়তো কারখানা ও অফিসের এ প্রতিযোগিতার জীবনের তুলনায় তাদের গৃহের শান্তিপূর্ণ জীবন অনেক ভালো ও তাদের কাছে বেশী প্রিয়।" নয়াদিল্লীর দৈনিক "দাওয়াত"–এ রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের এ প্রাচ্যদেশে যেখানে সভ্যতার বিবর্তন এখনো চূড়ান্ত হয়নি, পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের সব অংগণে এখনো পরিপূর্ণভাবে জেঁকে বসতে পারেনি, সেখানে ভারতের উত্তর প্রদেশ সরকারের এ জরীপ কাজটি বিরাট গুরুত্বের দাবীদার। এক সভ্যতার অপসারণের পর যখন আর এক সভ্যতা তার স্থান দখল করে তখন পূর্ববর্তী সভ্যতার গুণাগুণ বিচার ও তুলনামূলক পর্যালোচনা আর সম্ভবপর হয় না। কারণ পূর্ববর্তীটি তখন মৃত, আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত। তখন তার দিকে ফিরে তাকাবার লোকই নেই। নতুন তখন সবাইকে গ্রাস করে নিয়েছে। কিন্তু বর্তমান অন্তরবর্তীকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক পর্যালোচনা আমাদের মেয়েদের জন্য সহজ ও সম্ভবপর। সংসারের আয় বাড়ানো, না সংসারের শান্তি– মেয়েরা কোন্‌টা বাছাই করে নেবে?

মেয়েরা নিজেদের ভাগ্যের ফায়সালা যদি নিজেরাই করে তাহলে সেটিই ভালো মনে হয়। নয়তো মেয়েদের ভাগ্যের ফায়সালা যদি পুরুষদের হাতে চলে যায় তাহলে পুরুষরা কখনো মেয়েদের স্বার্থের দিকে তাকাবে না, তারা তো নিজেদের স্বার্থকে বড় করে দেখবে। উত্তর প্রদেশের শ্রম মন্ত্রণালয়ের জরীপ রিপোর্টটি এ কথাই প্রমাণ করেছে।

এ প্রসংগে আমাদের মুসলিম দেশগুলোর মেয়েদের অবস্থাটা একটু আলোচনা করতে চাই। ইসলাম আইনগত ও নৈতিকভাবে তাদের যে অধিকার দান করেছে তার চেয়ে বেশী অধিকার কোন সরকার, কোন সভ্যতা

ও সমাজ তাদেরকে দিতে পারবে না এবং আজো পারেনি। নিজেদের দেশে অধিকারের নামে আজ তারা যার পেছনে ছুটে চলতে চাচ্ছে বা তাদের ছুটিয়ে নিয়ে যাবার তোড়জোড় চলছে, তা তাদের কি উত্তর প্রদেশের মেয়েদের চাইতে ভালো অবস্থায় নিয়ে যেতে পারবে? এর কোন গ্যারান্টি তারা দিতে পারে কি? কিন্তু ইসলাম তাদের গ্যারান্টি দিয়েছে। ইসলাম মেয়েদেরকে যে অধিকার দিয়েছে প্রথমে তাই আদায়ের জন্য নিজেদের দেশের সরকারের ওপর চাপ দেয়া কি মেয়েদের জন্য ভালো নয়? এ অধিকারগুলো মেয়েদেরকে সমাজে যথার্থ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে কি না তা যাচাই করার পরই তাদের অন্য দিকে দৃষ্টি দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার সামাজিক অধিকারগুলো লাভ করতে গিয়ে তাদের যে সীমাহীন ও অসম প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছে, ইসলাম প্রদত্ত এ অধিকারগুলো লাভ করতে তাদের এর চাইতে অনেক কম কষ্ট স্বীকার করতে হবে এবং এজন্য পুরুষদের সাথে কোন বিরক্তিকর ও অসম প্রতিযোগিতায়ও নামতে হবে না।

৫৭
নারীর মুক্তি কিসে?

"নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস। ওপারেতে সব সুখ আমার বিশ্বাস।" আমাদের দেশের মেয়েরা বিশেষ করে মেয়েদের অভিভাবক সেজে বসে আছেন যে সব পুরুষেরা, তারা ওপারের কথা পাশ্চিমা দেশগুলোর মেয়েদের স্বর্গসুখের কিসসা শুনিয়ে আসছেন বহুদিন থেকে। ওপারের জগত যাকে আমরা নিজেদের ভাষায় বলি পশ্চিমা জগত এই পশ্চিমা জগতে তাদেরই দৃষ্টিতে নারীমুক্তি ঘটেছে মাত্র এই কিছুকাল আগে। জাতিসংঘ মাত্র ১৯৭৫ সালে প্রথম নারী দশক ঘোষণা করে নারীর অধিকার সুনিশ্চিত ও নারী মুক্তির পথ প্রশস্ত করার ব্যবস্থা করেছে। আমাদের দেশে এই কয়েকদিন আগে এরি সাথে সংশ্লিষ্ট আন্তরজাতিক নারী দিবস পালিত হয়ে গেল।

আমাদের দেশের মেয়েদের কিছু অংশ পশ্চিমা দেশগুলোর নারীমুক্তি কার্যক্রমের সাথে নিজেদের একাত্ম করতে পেরে যেমন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন তেমনি তাদের ঐ অভিভাবকরূপী পুরুষরাও অনেকটা দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পেরেছেন। তবে সাম্প্রতিককালে কোন কোন মুসলিম দেশের উলটো স্রোত আবার তাদের ধ্যানে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। মোটামুটিভাবে সব মুসলিম দেশের সরকারগুলো তাদের পক্ষে আছে। সরকারগুলো মুসলিম মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। (আর তাদের মতে মুসলিম মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়াই নারী মুক্তির লক্ষন)। তারা মুসলিম মেয়েদের বোরকা খুলে ফেলার এবং পুরুষদের সাথে সমান তালে কাজ করে যাবার নির্দেশ দিচ্ছে। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুরস্কের কামাল পাশা প্রথমে এর উদ্বোধন করেন। তারপর আফগানিস্তানের বাদশাহ আমানুল্লাহ খান এবং ইরানের রেজা শাহ পাহলবী এগিয়ে আসেন। এরপর পঞ্চাশের দশক পার হতে হতেই প্রায় সব মুসলিম দেশের মেয়েরা পথে নেমে এসেছে। এ প্রক্রিয়া এখনো চলছে। এই তো মাত্র গত ১২ মার্চ মালয়েশিয়া সরকার বোরকায় মুখ না ঢাকার জন্য মহিলা সরকারী কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছে।

তবে এই স্বঘোষিত উদার পন্থীদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলিম দেশগুলোর উঠতি ইসলামী আন্দোলনগুলো। সবার আগে নেকাব ছিঁড়ে যে তুরস্কের মেয়েদের এনে পথে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছিল, সেই তুরস্কের

মেয়েরাই আবার সবার আগে ঘরে ফেরা শুরু করেছে। শরীয়ত মোতাবেক শরীর ঢাকতে না দেয়ায় মেয়েরা সরকারী চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে বের হয়ে আসছে। মাথায় কাপড় দেবার অনুমতি না দেয়ায় ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে ঘরে ফিরে আসছে। মিসরের মেয়েরা আবার ব্যাপকহারে বোরখা পরতে শুরু করেছে। আর মালয়েশিয়ার মেয়েরা তো এক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমেরিকার মতো নারী স্বাধীনতার স্বর্গে প্রবেশ করেও তারা মেয়েদের জন্য নির্ধারিত ইসলামী লেবাসের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। প্রায় প্রত্যেকটি মুসলিম দেশেই আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে ইসলামের দিকে ফিরে আসার আন্দোলন শুরু হয়েছে।

এটা হচ্ছে মুসলিম মেয়েদের এই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অগ্রগতি। মুসলিম মেয়েদের এই অগ্রগতিতে তথাকথিত নারীমুক্তি আন্দোলনকারীরা প্রমাদ গুণছেন। আমাদের দেশের নারীমুক্তি আন্দোলনকারীদের অধিকাংশই মেয়েদের ঘরের চার দেয়ালের বাইরে বের করে এনে মেহনতী মানুষের খাতায় নাম লিখিয়ে দিতে পারলেই নারীমুক্তি হয়েছে বলে মনে করছেন। আর পাশ্চাত্যের একটি অংশের নারী মুক্তির ধারণা প্রায় এরি মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এরি সাথে সমাজের বিভিন্ন বিভাগে পুরুষদের সাথে সমান তালে পাল্লা দিয়ে মেয়েদের এগিয়ে যাওয়াকেও নারীমুক্তি মনে করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশগুলোর নারীমুক্তির ফলে মেয়েরা ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে আর কমিউনিস্ট দেশগুলোয় তারা ভিড়ে গেছে কল-কারখানা ও শস্য খামারের শ্রমিকদের দলে। এই পুঁজিবাদী ও কমিউনিস্ট উভয় দেশেই কোথাও নারীদের নারী হিসেবে মুক্তি লাভ করার কোন উপায় নেই। নারীমুক্তি লাভ করার জন্য তাদের পুরুষ সাজতে হচ্ছে। পাশ্চাত্যের একটি মেয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্মেষের সাথে সাথেই সে নিজেকে পুরুষ বানাবার জন্য শত রকমের কসরত চালায়। লেবাসে-পোশাকে, শরীরের বাইরের আদলে এবং আচার-ব্যবহারে প্রায় সব ক্ষেত্রে কিভাবে পুরুষ হওয়া যায় এ নিয়ে চলে তাদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। এটিই যদি নারী মুক্তির পদ্ধতি ও মানদণ্ড হয় তাহলে পাশ্চাত্য সমাজ ক্ষেত্রে নারীরা কোনদিন মুক্তিলাভ করতে পারবে না। এটা তাদের চিরকাল পুরুষের গোলাম বানিয়ে রাখারই চক্রান্ত। তারা আরো বেশী পুরুষদের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হতে থাকবে এবং আরো বেশী মেহনত ও শ্রম দিতে থাকবে, কিন্তু তার যথার্থ মূল্য পাবে না।

পাশ্চাত্য দেশগুলোয় নারী মুক্তির নামে মেয়েদের প্রতি এই বেইনসাফির বিরুদ্ধে মাঝেমধ্যে সেখানকার মেয়েদের দু'চারটে আওয়াজও শোনা যাচ্ছে।

পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতার পাল্লায় মেয়েরা হাঁপিয়ে উঠছে। সেখানকার মেয়েদের এই প্রতিবাদী কণ্ঠ তাই দিনের পর দিন আরো জোরদার হয়ে উঠবে।

এর মোকাবিলায় ইসলাম চৌদ্দ'শো বছর আগে নারীমুক্তির যে বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছে তা বাস্তবসম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ হবার কারণে যথার্থ নারীমুক্তির সহায়ক হয়েছে। ইসলামের আগমনকালে শুধু আরবের সমাজ ক্ষেত্রে নয় বিশ্বের প্রায় সর্বত্র মেয়েদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। আজকের মতোই সেদিনও তারা ভোগ্য পণ্য হিসেবেই বিবেচিত হতো। তাই ইসলাম নারীমুক্তির জন্য মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছে।

এক, মেয়েদের সামাজিক অবস্থান। দুই, তাদের অর্থনৈতিক অধিকার। তিন, মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব। ইসলাম মেয়েদের বিশেষ দৈহিক গঠনাকৃতি ও ক্ষমতার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রেখেই সমাজে ও পরিবারে তাদের স্থান নির্দেশ করেছে। সামাজিক ক্ষেত্রে এমন কোন অসম অবস্থায় তাদের ঠেলে দেয়নি যেখানে মর্যাদার সাথে ও স্থায়ীভাবে অবস্থান করার যোগ্যতাই তাদের নেই। এ জন্য মেয়েদের করেছে পরিবারের মধ্যমণি। মূলত গৃহকেই তাদের প্রধান কর্মস্থল করেছে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বাইরেও তাদের কর্মস্থল হতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে গৃহের প্রধান কর্মকেন্দ্রকে কখনো দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনা যাবে না।

মেয়েদের অর্থনৈতিক অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পিতার ও স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের উত্তরাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। স্বামীর কাছে তাদের প্রাপ্য মোহরানা ও ভরণ-পোষণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংসারের অর্থনৈতিক দায়িত্বের একাংশও ইসলাম মেয়েদের ঘাড়ে চাপায়নি। এ দায়িত্ব পুরোপুরি পুরুষের। এই অর্থনৈতিক চাবিকাঠি পুরুষের হাতে থাকায় মেয়েরা পুরুষদের গোলামে পরিণত হয়ে যাবে একথা ভুল। বরং বলা যায়, এতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পুরুষরাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ মেয়েরা তো তাদের মোহরানা ও সম্পত্তির মালিক হচ্ছে। এ অর্থকে তারা নিজস্বভাবে ব্যবহার করতে পারে, একে ব্যবসায়ে খাটিয়ে আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে, কিন্তু সেই সম্পদে স্বামীর বা সংসারের কোন অধিকার থাকবে না। অথচ অন্য দিকে স্বামীর সমস্ত আর্থিক উপার্জনের ওপর স্ত্রীর ও সংসারের পূর্ণ অধিকার থাকে। তাহলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বেশী লাভবান হচ্ছে কে? এরপর কি বলা যেতে পারে অর্থনৈতিক কারণে মেয়েরা পুরুষের গোলাম হয়ে থাকে?

তৃতীয়ত মানবিক, নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্বের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী সমান মর্যাদার অধিকারী। এক্ষেত্রে ইসলাম পুরুষ ও নারীর মধ্যে সামান্যতম পার্থক্যও করে না।

তারপর ইসলাম নারীর এই অধিকারগুলোর শুধু মৌখিক স্বীকৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। এগুলো সংরক্ষণ করার জন্য পূর্ণ ব্যবস্থাও অবলম্বন করেছে। নারী ও পুরুষের বৈবাহিক বন্ধনকে একটি চুক্তি হিসেবে গণ্য করেছে এবং সংগত কারণে এই চুক্তি থেকে বের হয়ে আসার ক্ষমতা পুরুষের ন্যায় নারীকেও দিয়েছে।

মোট কথা, ইসলাম মেয়েদেরকে মেয়ে হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাদেরকে পুরুষ হবার জন্য তাগাদা করেনি। ইসলাম চৌদ্দ'শো বছর আগে যে নারী মুক্তি দান করেছে, তা যেমন ভারসাম্যপূর্ণ তেমনি বাস্তব অবস্থার সাথেও সামঞ্জস্যশীল। মুসলিম সমাজে ইসলামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধগুলোর বিলুপ্তিই মেয়েদের সামাজিক দুর্গতির জন্য দায়ী। তাই পাশ্চাত্যের কৃত্রিম ও ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর না হয়ে আমাদের সমাজে যথার্থ ইসলামী মূল্যবোধগুলো প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসা উচিত। আর বোরকার ভয়ে যারা মরে যাচ্ছেন তারা কি বোরকাহীনতার কোন সীমা নির্দেশ করতে পারবেন? এই সীমা নির্দেশ সম্ভব নয় বলেই বোরকাহীন পরিবেশে মেয়েদেরকে ভোগ্য পণ্যে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করারও উপায় নেই। আর বোরকা তো শুধুমাত্র বাইরে চলাফেরা করার সময়। এটা মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণের নয় বরং মর্যাদা বৃদ্ধির উপায়। এর সম্পর্ক সামাজিক মূল্যবোধের উপলব্ধির সাথে।

ধর্মনিরপেক্ষতার দেশে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত। এশিয়ায় এ দেশটির একটি বিশিষ্ট সত্তা রয়েছে। প্রাচ্য যে আত্মার সম্পদে ধনী তা এ দেশটির এক সময় যথেষ্ট ছিল। এ দেশের বুক থেকে মহাবীর জৈন ও গৌতম বুদ্ধ অহিংসার বাণী ছড়িয়েছিলেন সারা বিশ্বে। সে তো আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগের কথা। এরপরও বিভিন্ন যুগে প্রেম ও অহিংসার বাণী নিয়ে যুগে যুগে এদেশে বহু মনীষীর জন্ম হয়েছে। চলতি শতকেও এদেশের কোন কোন দার্শনিক ও রাজনৈতিক নেতার মুখেও প্রেম ও অহিংসার বাণী শোনা গেছে।

কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি গত প্রায় অর্ধ শতক থেকে এদেশটি হিংসা, বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি ও নরহত্যার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাংগা গড়ে বছরের প্রতিদিন একটি থেকে দু'টি করে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মানে প্রতিদিন কোথাও না কোথাও নর রক্তে এদেশের মাটি রঞ্জিত হচ্ছে। শুধু মাত্র গত চার বছরের সরকারী হিসেব এখানে পেশ করছি। সরকারী সমীক্ষা অনুযায়ী গত ১৯৮০ সালে ৪২৭টি, ১৯৮১ সালে ৩১৯টি, ১৯৮২ সালে ৪৭৪টি এবং ১৯৮৩ সালে ৫০০টি সাম্প্রদায়িক দাংগা এদেশে অনুষ্ঠিত হয়। (সাপ্তাহিক দাওয়াত, নয়াদিল্লী, ২ জুন ১৯৮৪)।

এই সাম্প্রদায়িক দাংগাগুলোয় কোটি কোটি টাকার ধন সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা ও পংগু করে দেয়া হয়। হাজার হাজার পরিবারের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। ভারতের যে সব অধিবাসী এসব দাংগার হোতা তাদের দেশপ্রীতি সম্পর্কে কোন কথা বলার অধিকার আমাদের নেই কিন্তু আমরা জানি এতে তাদের দেশের এক কানাকড়িও উপকার হচ্ছে না। ভারতের মতো একটি দেশ এখনো আদিম যুগে অবস্থান করছে বলে তো আমরা কল্পনা করতে পারছি না। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান দু'টি স্বাধীন দেশের জন্ম এক সাথেই হয়েছে। তারপর ১৯৭১ সালে আবার পাকিস্তান থেকে জন্ম হয়েছে বাংলাদেশের। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ দু'টি মুসলিম প্রধান দেশে বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘুর বাস। এখানে দীর্ঘকাল ধরে কোন সাম্প্রদায়িক দাংগা হচ্ছে না। অথচ হিন্দু প্রধান ভারতে সাম্প্রদায়িক দাংগার মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের জানমালের নিরাপত্তা সব সময় বিঘ্নিত হচ্ছে। কেন? এর কারণ

কি? পাকিস্তান ইসলামের নামে অর্জিত হয়েছিল। ইসলামী নেজাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সেখানে এখনো চলছে। বলা হয়েছিল ইসলামী নেজাম প্রতিষ্ঠার জোশে এদেশে অমুসলিমদের কচুকাটা করা হবে। কিন্তু তা হয়নি। বাংলাদেশের জন্ম হয় ধর্মনিরপেক্ষতার নামে। এখন আবার এদেশে ইসলামী নেজামের আওয়াজ উঠেছে এবং এ জন্য প্রচেষ্টাও চলছে। কিন্তু এরপরও এখানে সংখ্যালঘুদের জানমালের ওপর কোন আক্রমণ পরিচালিত হচ্ছে না। অথচ শুরু থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার পতাকাবাহী ভারত ১৯৪৭ থেকে ১৯৮৪ সালের মে মাস পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সমর্থ হয়নি এক দিনের জন্যও। সংখ্যালঘুদের জানমালের মূল্য সেখানে পানির চাইতেও সস্তা প্রমাণিত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীদের পক্ষ থেকে আবার সমস্ত হিংসা ও রক্তপাতের মূল হিসেবে ধর্মকেই গণ্য করা হয়ে থাকে। অথচ ধার্মিকের দল শুধু ভারতে বাস করে না, সমস্ত মুসলিম দেশগুলোয় ধার্মিকদের আবাস রয়েছে। কিন্তু কোন মুসলিম দেশেই সাম্প্রদায়িক দাংগা এবং সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হিংসা নীতি অথবা সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি দেখা যাচ্ছে না। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, তাহলে ভারতের এই ধর্মনিরপেক্ষতা কি শুধু একটি খোলস মাত্র? ধর্মনিরপেক্ষতার আলখেল্লা পরা হয়েছে কি শুধু সংখ্যালঘুদের কচুকাটা করার জন্য?

সাম্প্রদায়িক দাংগা ব্যাপদেশে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে সম্প্রতি একটি পর্যালোচনামূলক পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়। তাতে দেখানো হয় যে, বিগত কয়েক বছরে সাম্প্রদায়িক দাংগাগুলো বিশেষ করে এমন সব শহরে বেশীর ভাগ অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য এবং তারা অর্থনৈতিক দিক দিয়েও সমৃদ্ধ। এ থেকেও বুঝা যায়, সংখ্যাগত দিক দিয়ে মুসলমানদের বিনাশ সাধন এবং তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেংগে ফেলাই এই দাংগাগুলোর উদ্দেশ্য।

এমনি দুনিয়ার আরো কয়েকটি খৃষ্টান ও বৌদ্ধ সংখ্যাগুরু দেশেও সংখ্যালঘু মুসলমানদের মাঝে মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাংগায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে। তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা- وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ -(البقره : ١١٩)- 'ইহুদী ও খৃষ্টানরা তোমাদেরকে তাদের দীনের আওতাধীন না করা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবে না'–কুরআনের এ বক্তব্যেরই সত্যতা প্রমাণ করে যাচ্ছে। কিন্তু ভারত যেমন অনবরত সাম্প্রদায়িক দাংগার বিষবাষ্প উদগীরন করে যাচ্ছে এমনটি আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এ দেশটির এই মারাত্মক ধরনের সাম্প্রদায়িক

উত্তেজনা ও হিংস্রতার পেছনে আমাদের মতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কাজ করে যাচ্ছে।

এক ঃ সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর সাময়িক স্বার্থ। নিজেদের দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ক্ষমতাসীন সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো অনেক সময় দাংগায় উস্কানি দেয় তারপর ঘোলাপানিতে সহজে মাছ শিকার করার প্রচেষ্টা চালায়। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে এ ধরনের বিভিন্ন অভিযোগ সে দেশের পত্র–পত্রিকায় বহুবার ছাপা হয়েছে।

দুই ঃ কতিপয় দাংগাবাজ দলের অস্তিত্ব। ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে আর, এস, এস, (রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ), শিবসেনা, আনন্দমার্গ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ইত্যাদির ন্যায় কয়েকটি দাংগাবাজ দলের অস্তিত্ব সাম্প্রদায়িক দাংগার পথ প্রশস্ত করেছে। এই দলগুলোর কয়েকটির মূল লক্ষই হচ্ছে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা হ্রাস করা। এ জন্য তারা নিজেদের আখড়ায় দস্তুরমতো খুনাখুনি ও দাংগার ট্রেনিং নিয়ে থাকে। আসামের সাম্প্রতিক বড় দাংগা এবং ভারতের অন্যান্য বড় বড় শহরের সাম্প্রদায়িক দাংগায় আর, এস, এস, এর সুস্পষ্ট ও সক্রিয় ভূমিকার সমালোচনা বার বার বিভিন্ন মহল থেকে এসেছে।

তিন ঃ তৃতীয় বিষয়টি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও মারাত্মক। সুদীর্ঘকাল থেকে ভারতের বিভিন্ন ভাষার বইপত্রে মুসলমানদের কুৎসিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। এ বিষয়টি সংখ্যাগুরু হিন্দুদের সহজেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ও মারমুখো করে তুলেছে। শুধু বাংলা ভাষার কথাই বলি, একা বংকিম চন্দ্র যে কাজটি করেছেন, তার সাহিত্য পড়ার পর কোন বাংগালী হিন্দু মুসলমানদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করতে পারে? বংকিমের উত্তরসূরীরাও বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক ফুলঝুরি করেছেন। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোথাও ডাহা মিথ্যা আবার কোথাও সত্যমিথ্যায় মিলিয়ে এমনি অনেক সাম্প্রদায়িক বিভেদের সরঞ্জাম সরবরাহ করা হচ্ছে। এগুলো যতদিন থাকবে ততদিন ঐ দাংগাবাজ দলগুলোর পক্ষে ময়দান থাকবে সহজতর। ততদিন রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারকারীরাও দাংগার রাজনীতির রথে চড়ে চমক সৃষ্টি করতে পারবেন।

ভারতের শুভবুদ্ধির কাছে আমাদের আবেদন, আমাদের জানামতে শুভবুদ্ধির সেখানে অভাব নেই, বিদেশে বিশাল ভারতের মর্যাদা রক্ষায় আপনারা এগিয়ে আসুন। ভারতে যারা এই সাম্প্রদায়িক দাংগার

পৃষ্ঠপোশকতা করছে তারা আসলে বিদেশে ভারতের মর্যাদাকে ধূলায় লুটিয়ে দিচ্ছে। তারা সমগ্র বিশ্ববাসীর ঘৃণার দৃষ্টির সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়কে। হিন্দু সম্প্রদায়কে এই অপমান থেকে বাঁচান।

৫৯
আরেক দিগন্ত

মানুষ স্বাভাবতই দুর্বল। জন্মের পর থেকেই নিজের ক্ষুদ্র অস্তিত্বটুকু টিকিয়ে রাখার জন্য তাকে বাইরের সাহায্য সহযোগিতার ওপর পূর্ণ নির্ভরশীল হতে হয়। জীবনধারণ, চলাফেরা, কথা বলা, সব কিছুর জন্য তাকে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। প্রথমে নিজের চেষ্টায়, নিজের ইচ্ছায় কিছু করার শক্তিই তার থাকে না। এমনকি সামান্য ইচ্ছাশক্তিটুকু অর্জন করতেও যথেষ্ট সময় লাগে। অতপর শক্তির উন্মেষ ও বুদ্ধির বিকাশের সাথে সাথে সে নিজেকে কিছুটা শক্তিশালী অনুভব করে। কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে পদে পদে নিজের শক্তির সীমিত পরিমাণ সম্পর্কে সে অবহিত হতে থাকে। কোন মানুষ আজো নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, অসীম শক্তিশালী, সকল কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা সম্পন্ন প্রমাণ করতে পারেনি।

ইতিহাসে সৃষ্টি ও প্রলয়, উত্থান ও পতনের এমন একটি ধারাবাহিক ছাপ সুস্পষ্ট যা প্রত্যেকটি মানুষকে, প্রত্যেকটি জাতিকে, প্রত্যেকটি সভ্যতা-সংস্কৃতিকে তার সীমিত ক্ষমতা ও সময়কাল সম্পর্কে সজাগ করে দেয়। ব্যাবিলনের সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলো আজ কোথায়? নীল নদের তীরে যে সভ্যতার সৌধ নির্মিত হয়েছিল তাকি আজ নিছক জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত হয়ে দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়নি? এথেন্স, রোম, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সভ্যতা কি আজ নৃতত্ত্ববিদদের গবেষণার বিষয়বস্তু নয়? আদ ও সামুদের ন্যায় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জাতিরাও কি দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি? তারা পাথর কেটে কেটে যে সুরম্য সুবিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করতো সেগুলি আজ কোথায়? আলেকজাণ্ডার ও চেংগিজ খানের সেই বিপুল পরাক্রমশালী বিশ্বত্রাস বাহিনীর কোন চিহ্নও আজ কোথাও পাওয়া যায় কি? এ শতকের প্রথমার্ধেও যে বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেতো না, যে বৃটিশ সিংহের গর্জনে সারা দুনিয়া থরথর করে কাঁপতো, সে সিংহ কি আজ নিজের গুহায় গা ঢাকতে ব্যস্ত নয়? বিশ্বব্যাপী উত্থান ও পতনের এমনি অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের চতুরদিকে ছড়িয়ে আছে। যখনই যে ব্যক্তি, যে জাতি, যে সভ্যতা বিজয়ীর আসন লাভ করেছিল তখনই সে বিস্মৃত হয়েছিল তার সীমিত ক্ষমতা, যোগ্যতা ও সময়কাল। ক্ষমতার অহমিকায় সে জ্বাজ্জল্যমান সত্যকে বিস্মৃত হয়েছিল। সে ভূলে গিয়েছিল একদিন এমনও ছিল যখন তার মধ্যে

সামান্যতম ক্ষমতাও ছিল না। একদিন এমনও ছিল যখন তার অস্তিত্বও ছিল না। এ মহাবিস্মৃতি তার গৌরবের দিনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। আল্লাহতা'আলা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মানব জাতি ও সভ্যতার এ পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানিয়েছেন, সুরা আলে ইমরানের চতুর্দ্দশ রুকুতে বলা হয়েছে ঃ

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ - فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ (ال عمران : ١٣٧)

"তোমাদের আগে অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তোমরা বিশ্ব পরিভ্রমণ করো এবং (সত্যকে) মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিনাম প্রত্যক্ষ করো।"

অন্যত্র সুরা আনয়ামের প্রথম রুকুতে বলা হয়েছেঃ

"তারা কি দেখেনি, তাদের পূর্বে কত জাতিকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি? তাদেরকে পৃথিবীর বুকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেমনভাবে তোমাদেরকেও প্রতিষ্ঠিত করিনি। আকাশ থেকে তাদের ওপর প্রচুর বৃষ্টিপাত করতাম এবং তাদের জমিনে পানির নহর প্রবাহিত করেছিলাম। অবশেষে তাদের কৃতকার্যের ফল স্বরূপ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। এবং তাদের পর অন্য জাতির সৃষ্টি করেছি।"

মানুষ প্রকৃতিকে জয় করেছে। অবশ্যই বিশ্ব প্রকৃতিকে মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ তাকে কাজে লাগাবে। তার বিভিন্নমুখী ও অমিত শক্তি সম্ভার ব্যবহার করে জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তুলবে। কিন্তু প্রকৃতির শক্তির পরিমাণ সম্পর্কে মানুষ কি সঠিক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে? প্রকৃতির শক্তির রূপ–রং, বিচিত্র প্রকাশ, অভিনব গতিধারা সম্পর্কে মানুষ আজ পর্যন্ত কতটুকু জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে?

সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই মানুষকে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে। এ যুদ্ধে জয়লাভ করেই মানুষ এতদূর অগ্রসর হয়েছে। কাজেই প্রকৃতির বিপুল শক্তি সম্ভার সম্পর্কে মানুষ কখনো ভুল ধারণা পোষণ করতে পারে না। প্রকৃতির শক্তি মানুষের নিকট ভয়ের বস্তু না হলেও বিস্ময়ের বস্তু নিশ্চয়ই। প্রকৃতির সামান্য সামান্য উপাদানের মধ্যে যে বিপুল শক্তি নিহিত রয়েছে তা অবশ্যই মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। যে বাতাসের মধ্যে আমরা অহরহ ডুবে আছি, যার সাহায্য ছাড়া আমরা এক মুহূর্ত বাঁচতে পারি না, এক কথায়

যা আমাদের নিত্য ও প্রতি মুহূর্তের সহচর, সেই বাতাসও সময় সময় এমন প্রচণ্ড রুদ্র মূর্তি ধারণ করে যা আমরা কোনদিন কল্পনাও করতে পারি না। মুহূর্তের মধ্যে নগর জনপদ ওলট পালট করে দিয়ে চলে যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের শ্রম মেহনতে যে নগর–সভ্যতা গড়ে ওঠে বাতাসের মুহূর্তের প্রবাহ সেখানে প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে দেয়। সবকিছু ধূলায় মিশিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যায়। বাতাসের এ ক্ষমতার দিকে কুরআনের সূরা মুরসালাতের শুরুতে সামান্য ইংগিত করা হয়েছে ঃ

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا عُذْرًا اَوْ نُذْرًا اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ (المرسلت : ١-٧)

"সেই বাতাসের কসম যা একটানা প্রবাহিত হয়, তারপর প্রবলবেগে বয়ে চলে (গাছ পালা ঘরবাড়ী উড়িয়ে নিয়ে ভয়াবহ ধ্বংস কাণ্ড সৃষ্ট করে)। আর সেই বাতাস যা মেঘকে উড়িয়ে আনে, তারপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত করে ছড়িয়ে দেয় দিকে দিকে। অতপর এ দু'ধরনের বাতাস মানুষের মনে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মানুষ ক্ষমাপ্রার্থী হয় বা ভীত সন্ত্রস্ত হয়। নিসন্দেহে তোমাদের সাথে যে বিষয়টির ওয়াদা করা হয়েছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।"

বাতাসের সৃষ্টি ও প্রলয়ধর্মী দু'টো চেহারা এখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিকে সমুদ্র থেকে বাষ্প উঠিয়ে এনে বিশুষ্ক ক্ষেত ও জনপদের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীকে নবজীবন দান করা হয়। আবার অন্যদিকে প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়ে এই সমগ্র সৃষ্টিকে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করা হয়। সত্যিই প্রকৃতির এ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদানের বুকে প্রচ্ছন্ন বিপুল শক্তি যুগে যুগে মানুষকে তার ক্ষমতা ও কর্ম সম্পর্কে চিন্তা করার আহবান জানিয়েছে। মানুষ অবাক হয়ে চিন্তা করে এ শক্তির উৎস কোথায়? সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। শক্তির বিপুলতা, ধ্বংসের ভয়াবহ চেহারা প্রত্যক্ষ করে ভীত–সন্ত্রস্ত হয়। প্রকৃতিকে জয় করার পরও প্রকৃতির এ শক্তি মানুষের মনে আজো বিভীষিকার সৃষ্টি করে রেখেছে। কিন্তু কেন?

আসলে মানুষ যতই শক্তিমত্তার পরিচয় দিক না কেন প্রকৃতিগতভাবে সে দুর্বল। তার এ দুর্বলতা মানবেতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে প্রমাণিত। তাই এ

প্রেক্ষিতে চিন্তা করলে সে একজন মহান ক্ষমতা সম্পন্ন সর্বশক্তিমান সত্তার সম্মুখে মাথা নত করতে বাধ্য হয়। নিজের ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়। যুগে যুগে বার বার এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়।

সাম্প্রতিক কয়েক বছর থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে আমাদের দেশে গণজীবন বিধ্বস্ত হচ্ছে। এ দুর্যোগের হাত থেকে নিস্কৃতি লাভের জন্য বস্তুগত দিক দিয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে সে সম্পর্কে চিন্তা-পরিকল্পনা-পদক্ষেপ গ্রহণ করার সাথে সাথে আর একটি দিক দিয়ে চিন্তা করাও আমাদের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে গত মাসের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় পূর্ব পাকিস্তানের নগর-বন্দর-জনপদে যে ভয়াবহ ধ্বংসের স্বাক্ষর রেখে গেছে তা একটি মুসলিম জাতি হিসেবে অবশ্যই আমাদের নিজেদের দায়িত্ব ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে চিন্তা ও পর্যালোচনা করার আহবান জানায়।*

* নিবন্ধটি ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়।

৬০
বন্যার পরের কিছু ভাবনা

বন্যা, ঝড়, মহামারী ইত্যাদিকে বলা হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রকৃতির সাথে মোকাবিলা করে মানুষ দুনিয়ায় টিকে আছে। প্রকৃতিকে বশ করার জন্য মানুষ তার চেষ্টা, আয়োজন, কসরত চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতিকে বশ করতে পারুক বা নাই পারুক মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে। কিন্তু মানুষের সব প্রচেষ্টা কসরত ছাড়িয়ে প্রকৃতি মাঝে মাঝে মারাত্মক দুর্যোগের চেহারা নিয়ে হাজির হয়। আবার প্রমাণ হয় প্রকৃতির হাতে মানুষ নামের জীবটি নিছক একটা খেলনা মাত্র। আসলে মানুষ প্রকৃতিকে বশ করেনি। প্রকৃতিকে যিনি মানুষের বশ করে দিয়েছেন তিনি যে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন এবং মানুষের সব ক্ষমতা তারই দান এ কথা বুঝাবার জন্য তিনি অবুঝ, নির্বোধ ও বিদ্রোহী মানুষকে মাঝেমধ্যে প্রকৃতির হাতের পুতুলে পরিণত করে দেন। কুরআনের সূরা আল-মুরসালাতে বলা হয়েছে ঃ "শপথ সেই (বাতাস সমূহের) যা পর পর ও ক্রমাগতভাবে পাঠানো হয়। পরে প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে চলতে থাকে এবং (মেঘমালাকে) উর্ধে নিয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে দেয়। পরে তাকে টুকরো টুকরো করে আলাদা করে দেয়। পরে (লোকদের মনে আল্লাহর) ভয় জাগিয়ে দেয়।"

সামান্য বাতাসকে কিভাবে প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত করে এই বিশ্বরাজ্যে আল্লাহ তাকে ব্যবহার করছেন তাতো আমাদের সামনেই আছে। বাতাস না হলে এক মুহূর্ত আমাদের চলে না। আবার এই বাতাসকে এমন এক মহাশক্তি বানিয়ে আল্লাহ আমাদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেন যার মোকাবিলা করার কোন ক্ষমতাই আমাদের নেই। তখন আমরা তাকে বলি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। পানির শক্তিকেও এভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন, যা প্রাকৃতিক দুর্যোগরূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়।

বন্যা তাই মানুষের কাছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাংলাদেশে এবারো বন্যা হয়েছে। বন্যা বাংলাদেশে এবার প্রথম নয়। বিগত তিন দশক থেকে প্রায় প্রতি বছরই কম বেশী এ দেশে বন্যা হচ্ছে। বন্যা এখন এখানকার জীবনে একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু ভয়াবহ বন্যা মাঝেমধ্যে হয়। জেলার পর জেলার আমন ও আউশ ধান বন্যার পানিতে ভেসে যাওয়া, কাঁচা ঘর-বাড়ী বানের

তোড়ে বিধ্বস্ত হওয়া, হাঁস-মুরগী, গবাদি পশুর ব্যাপক প্রাণহানি হওয়া এবং মানুষের জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির ব্যাপারটা আবার সব সময় তত বেশী ঘটে না। কিন্তু এ বছরের বন্যার ভয়াবহতা আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এক বছরে তিনবার বন্যা হয়েছে। প্রথমবারের বন্যার পর কৃষকরা আবার নতুন ফসলের প্রস্তুতি চালিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার বন্যা এসে তাদের সব প্রচেষ্টা বালির বাঁধের মত ধূলিস্মাত করে দিয়ে গেছে। এভাবে চারপাঁচ মাসের মধ্যে এসেছে পর পর তিন তিনটি ভয়াবহ বন্যা। এখনো কৃষকদের নতুন উদ্যমের সামনে প্রকৃতি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির মোকাবিলা করার জন্য সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ মোকাবিলা তো করে যেতেই হবে। কারণ মানুষকে দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু এই সাথে এ কথাটাও মনে রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি যে, এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আল্লাহর বিরূপতা ও মারাত্মক ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের যাবতীয় অবিমৃশ্যকারিতা, আল্লাহর দীন থেকে দূরে সরে যাওয়া, আল্লাহর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে প্রকাশ্যে তাঁর নাফরমানী করা, জীবনের প্রতি পদে পদে নিজেদের মোনাফেকী চরিত্রের প্রকাশ ঘটানো, একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের পূর্ণ সামর্থ থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা না করা বরং প্রকাশ্যে তার বিরুদ্ধাচরণ করে যাওয়া-এ সবগুলো এবং এমনি আরো অনেক অনভিপ্রেত কাজ ও কাজের সংকল্প মহান আল্লাহর ক্রোধকেই উদ্দীপিত করেছে মাত্র। মহা দুর্যোগের মোকাবিলা করার সময় এ দিকটাও আমাদের একটু ভেবে দেখা দরকার। দুর্যোগ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা সিগন্যাল। বুদ্ধিমানের জন্য এ সিগন্যাল যথেষ্ট হওয়া উচিত।

এমনিতে সমস্ত মানুষকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ দুনিয়ায় আল্লাহর উদ্দেশ্য সম্পাদন করার দায়িত্ব বর্তেছে সমস্ত মানুষের ওপর। তার মধ্যে আবার মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে বিশেষ এবং বেশী। কারণ তারা এ দায়িত্ব সম্বন্ধে অবগত হবার পর একে মেনে নিয়েছে। তাই পৃথিবীতে মুসলমানের কর্তব্য নির্ধারিত হয়ে গেছে এবং সেই কর্তব্যই তাকে পালন করে যেতে হবে। এ ব্যাপারে যখনই সে গাফলতি ও গড়িমসি করবে বা অবহেলা দেখাবে তখনই তার প্রতি নেমে আসবে আল্লাহর বিরূপতা, ক্রোধ, শাস্তি ও আযাব।

আল্লাহর বিরূপতার প্রকাশ বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন তিনি মুসলমানদের ওপর এমন সব লোককে শাসক নিযুক্ত করতে পারেন যাদেরকে মুসলমানরা চায় না এবং মুসলমানদেরকেও তারা চায় না। গত কয়েকশো বছর থেকে মুসলমানদের ওপর এই আযাব চলে আসছে। বর্তমানে এটা একটা চরম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আর আল্লাহর এই বিরূপতার চরমতম প্রকাশ ঘটে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে। কুরআনে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জাতির ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যে জাতিকে চান দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে তাকে প্রথমে একের পর এক ছোট বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাতে সতর্ক করার ব্যবস্থা করেন, তারপর হয়তো কোন মারাত্মক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে সে জাতিকে দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। তবে মুসলমানদের জন্যে এগুলো সবই সতর্কবাণী ও পার্থিব চরম আযাবের ব্যবস্থা, এতে সন্দেহ নেই।

গত কয়েক বছর থেকে আমাদের দেশটি এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে। দুনিয়ায় প্রকৃতির সাথে লড়াই করে মানুষকে টিকে থাকতে হয়। তাই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা মানুষ প্রথম দিন থেকেই করে আসছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দান করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন :

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ (الجاثيه : ١٣)

"আকাশসমূহ ও পৃথিবীর মধ্যকার সমস্ত বস্তুকে তিনি মানুষের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।"

কিন্তু বস্তুগুলো মূলত আল্লাহর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি এগুলোকে যতটুকু মানুষের নিয়ন্ত্রণে আনার সুযোগ দিয়েছেন ততটুকুই মানুষ এগুলোকে ব্যবহার করতে পারছে। প্রকৃতির ওপর মানুষের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে আমরা আধুনিক পরিভাষায় বলি বিজ্ঞানের শক্তি। এই বিজ্ঞানের শক্তির সাহায্যে মানুষ প্রতি যুগেই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে। কিন্তু এই বিজ্ঞানের শক্তি অসীম নয়। অথচ বিজ্ঞান যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাচ্ছে অর্থাৎ প্রকৃতি এক অর্থে তার শক্তি অসীম। এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, অসীম ক্ষমতার অধিকারী এক মহান সত্তা এই সমগ্র প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন। প্রকৃতির শক্তি তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে। তাই মানুষকে তার ওপর নামকাওয়াস্তে আংশিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দান করলেও ইচ্ছেমত মানুষের বিরুদ্ধেও তিনি এটাকে ব্যবহার করেন। যারা এই অসীম শক্তিধর মহান সত্তা তথা আল্লাহকে স্বীকার করে না তারা এটাকে বলে 'প্রকৃতির খেয়াল'। প্রকৃতির এই খেয়ালের কোন ব্যাখ্যা তাদের কাছে নেই। এটা আসলে কেবল তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অপারগতাই নয়, তাদের বক্রবুদ্ধি ও বিকৃত বুদ্ধিরও প্রমাণ। নিজেদের জিদ ও হঠধর্মিতার কারণে সত্যকে স্বীকৃতি দেবার ক্ষমতাই তারা হারিয়ে ফেলেছে। তারা প্রত্যেকটা কথার বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা চায় কিন্তু তাদের এই কথার কোন বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা তাদের কাছে নেই।

তাই প্রকৃতির এই খেয়াল আসলে আল্লাহরই ক্ষমতা যা তিনি ইচ্ছে মত মানুষের ওপর ব্যবহার করেন। একে আমরা বলি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা আল্লাহর গযবের রূপে আমাদের ওপর নেমে আসছে। গত কয়েক বছর থেকে আমাদের দেশটি এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে এ বছরের শুরু থেকেই এ দুর্যোগের পালা শুরু হয়েছে একটানা। আবহাওয়াবিদদের আন্দাজমতে এ অবস্থা দীর্ঘায়িত হতে পারে। উত্তর বংগে পদ্মা পারে এবং দেশের আরো বিভিন্ন জায়গায় এবারের ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসকারিতা একবার বিশ্লেষণ করলে এই গযবের রূপটা সামনে ভেসে উঠবে। এই ঘূর্ণিঝড়ে কয়েকটি গ্রাম একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। হাজার হাজার ঘর-বাড়ী এমনভাবে লণ্ডভণ্ড হয়েছে যেন দেখলে মনে হবে কোথাও আগে কোন ঘরবাড়ী ছিল না। অনেক বড় বড় গাছকে একেবারে মূল শুদ্ধ উপড়ে এক জায়গা থেকে উড়িয়ে আরেক জায়গায় ফেলে দেয়া হয়েছে। গাছপালা নিশ্চিহ্ন হয়ে কোথাও একদম ফাঁকা মাঠে পরিণত হয়েছে। ফসলের

মাঠ লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। রবিশস্য ও মওসুমী ফসল বিধ্বস্ত হয়েছে। চার পাঁচ সের থেকে দশ পনর সের পর্যন্ত ওজনের শিলাবৃষ্টি হয়েছে। শত শত গবাদি পশু ও বহু লোকের মৃত্যু ঘটেছে। এটা এমন একটা আকস্মিক ধ্বংসযজ্ঞ, যার হাত থেকে বাঁচার কোন ক্ষমতা মানুষের ছিল না।

দুর্যোগের এই ভয়াবহতা আমাদের দ্রুত উদ্বুদ্ধ করবে দুর্যোগ পীড়িত মানবতার সেবায়। সরকার ও জনগণ সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধ করার সাধ্য মানুষের নেই। তাই দুর্গত মানবতার সাহায্য করার সাথে সাথে আমাদের আসলে আত্মবিশ্লেষণেও উদ্বুদ্ধ হওয়া দরকার। মহান স্রষ্টার অনুগত বান্দা তথা মুসলিম হবার দাবীদার হয়েও আমরা যেভাবে তাঁর নাফরমানি এবং তাঁর সমগ্র বিধান ও আদেশ নিষেধ অমান্য করে আমাদের জীবনধারা গড়ে তুলছি তা আমাদের দাঁড় করিয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে একজন বিদ্রোহীর ভূমিকায়। নিজেদের এই বিদ্রোহী ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। আনুগত্যের দাবী করার পর এই বিদ্রোহীর ভূমিকা আল্লাহর ক্রোধ উদ্দীপিত করার জন্য যথেষ্ট। তাই আমাদের আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মসংশোধনে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহর যথার্থ অনুগত বান্দার ভূমিকা পালন না করলে আল্লাহর এই ক্রোধের অগ্নিকে নির্বাপিত করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়।

সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে পাশ্চাত্য সভ্যতা মুসলমানদের চিন্তার দূর্গপ্রাকারে অসংখ্য ছিদ্র সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ ও রসূলের বাণীর ভিত্তিতে যে দূর্গ নির্মিত হয়েছিল তার মধ্যে আল্লাহ-বিমুখতা ও আল্লাহ-অবিশ্বাসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মুসলমানদের চিন্তা আজ যথার্থ স্থবিরত্বে পৌছে গেছে। পাশ্চাত্যের চিন্তা দর্শন, জীবন ব্যবস্থা, সমাজ কাঠামো, পারস্পরিক সম্পর্কের রীতিনীতি, আন্তরজাতিক সম্পর্কের রূপকল্প নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মুসলমানের নিজস্ব কোন চিন্তা দর্শন নেই। বিশ্বকে নতুন কিছু দেবার মতো ক্ষমতা মুসলমান হারিয়ে ফেলেছে। অন্যকথায় মুসলমান এখন অন্যের উচ্ছিষ্টভোগী

আধুনিক শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সমাজের তো কথাই নেই, পাশ্চাত্য চিন্তা-দর্শন-সভ্যতার বিজয় কাহিনীই তারা পড়ে এসেছেন। তার উল্লাস ধ্বনিই তাদের কানে শ্রুত হয়েছে। তারা দেখে এসেছেন তার বিজয়োদ্ধত স্ফীতোদর চেহারা। ইসলামের পূর্ণাংগ চেহারাই তাদের সামনে পরিস্ফুট হয়নি। আর কখনো হয়ে থাকলেও তা এমনই বিকৃত ও বীভৎস ছিল যে, তা থেকে হাজার বার তাওবা করাই তারা শ্রেয়ঃ মনে করেছেন। তাই ইসলাম সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের বিভ্রান্তির অবশ্যই যথার্থ কারণ আছে। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় তখন যখন ইসলামী শিক্ষিত সমাজের বিভ্রান্তির চেহারা ভেসে ওঠে।

শুধুমাত্র ধর্ম ও রাজনীতি পৃথকীকরণের কথা আলোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও নজীর থাকা সত্বেও পাশ্চাত্য চিন্তা কিভাবে সমগ্র মুসলিম সমাজকে বিরাট বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। যেখানে কুরআনে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করা হয়েছে যে, "তিনি (আল্লাহ) নিজের নবীকে হেদায়াত ও দীন-জীবন ব্যবস্থা দিয়ে পাঠিয়েছেন এ জীবন ব্যবস্থাকে দুনিয়ার সকল জীবন ব্যবস্থার ওপর বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে", যেখানে রসূলুল্লাহর (স) জীবনে ধর্ম ও রাজনীতির কোন পৃথক অস্তিত্ব ও ধারণাই ছিল না, যেখানে খেলাফতে রাশেদার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থিত এবং আজো মুসলিম সমাজে একমাত্র আদর্শ বলে বিবেচিত হচ্ছে সেখানে মুসলিম সমাজে এই চিন্তা কেমন করে শিকড় গেড়ে বসলো, তা অবশ্যই পর্যালোচনা

সাপেক্ষ। আসলে মুসলমানদের মধ্যে এ চিন্তার প্রসার হচ্ছে পূর্ণত ইহুদী ও খৃষ্টবাদী ষড়যন্ত্রেরই ফলশ্রুতি। ইহুদী ও খৃষ্টধর্মের আভ্যন্তরীণ গলদ, দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতার কারণে পাশ্চাত্যে এ চিন্তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর পাশ্চাত্যের গোলামীর মাধ্যমে মুসলিম মানসেও হয় এর প্রতিফলন। পাশ্চাত্যের গোলামীর পূর্বে মুসলমানদের বারো সাড়ে বারোশো বছরের ইতিহাসে কোথাও ধর্ম ও রাজনীতির পৃথক অস্তিত্বের নজীর নেই। মূলত এ চিন্তাটি আমাদের বিগত দুশো বছরের গোলামীরই একটি দান। আজাদীর বাইশ বছর পর আজো আমাদের সমাজের একটি প্রভাবশালী অংশ গোলামীর এ 'দান'টিকে আঁকড়ে ধরে আছে।

অথচ আজাদীর অর্থ শুধুমাত্র একটি বিদেশী জাতিকে শাসন ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়া নয়। এইসংগে তার যাবতীয় চিন্তা, প্রভাব, প্রতিপত্তির গোলামী থেকেও–যার মাধ্যমে সে আমাদের জাতীয় বৈশিষ্টকে ধূলিস্মাত করার চক্রান্ত করেছিল– নিস্কৃতি লাভও সমান জরুরী। বরং এই শেষোক্ত গোলামীর বন্ধন ছিন্ন করাটাই আসল আজাদী। আর এ বন্ধন ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত বিদেশী ও বিজাতির তল্পীবহনের কাজ অব্যাহত থাকবে। বিশেষ করে বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন শিল্পের বৈজ্ঞানিক উন্নতির সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদিতার শিল্পেরও বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ আজ আর উলংগ নয়, এগুলোর স্থূল প্রকাশ আজকাল অতি অল্পই হয়ে থাকে। সূক্ষ্ম আবরণ ও শৈল্পিক কারুকার্যের মধ্যে এখন এগুলো ঢাকা থাকে। তাই পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদীরা এখন শিল্প সম্পদে সুসজ্জিত হয়ে নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এখন তারা চিন্তা ও সাংস্কৃতিক গোলামী এবং আধিপত্য বিস্তারের পথ অবলম্বন করেছে। মুসলমানরা তাদের রাজনৈতিক গোলামী মুক্ত হলেও এখনো চিন্তা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের গোলামীর জোয়াল ঠেলে ফেলতে পারেনি।

এই পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের রাজনৈতিক গোলামীর সাথে সাথে তাদের চিন্তা, ভাবধারা ও সাংস্কৃতিক গোলামী থেকে মুসলমান যেদিন মুক্তি লাভ করবে একমাত্র সেদিনই তারা সত্যিকার আজাদী লাভ করবে। অবশ্যই আমাদের একথা থেকে পাশ্চাত্য চিন্তার সবকিছুই বর্জনীয়, এ ধারণা পোশণ করা সংগত হবে না। আমরা শুধু পাশ্চাত্য চিন্তার গোলামীর কথা বলেছি। পাশ্চাত্য চিন্তার গ্রহণীয় অংশকে ইসলামী চিন্তার ছাঁচে ঢালাই করে সংশোধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে গ্রহণ করা যেতে পারে। সেখানে ইসলামী চিন্তার প্রাধান্য ফুটে উঠবে, পাশ্চাত্য চিন্তার নয়।

এ প্রেক্ষিতে ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণের মনোভাব পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এর মধ্যে পাশ্চাত্য চিন্তার গোলামী অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ইসলামী অনুশাসন, রসূলুল্লাহর জীবন ও খেলাফতে রাশেদার কার্যাবলী এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ ক্ষেত্রে এ চিন্তা-দর্শনকে গ্রহণ করার পেছনে পাশ্চাত্যের গোলামী ছাড়া অন্য কোন মনোবৃত্তি সক্রিয় থাকতে পারে না। আমাদের দেশে অধুনা যারা মসজিদে রাজনীতি না করার জিগির তুলছেন এবং রাজনীতিতে ইসলামের অনুপ্রবেশকে ধর্ম ব্যবসায়ের সাথে তুলনা করছেন, তারা আসলে পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্যের গোলামীরই অংগীকার করে যাচ্ছেন। তারা মানসিকভাবে এখনো স্বাধীন হতে পারেননি। তাদের মনোজগতে এখনো সাম্রাজ্যবাদের শাসন চলছে। এই সাম্রাজ্যবাদকে ঝেড়ে মুছে ফেলে সঠিক ইসলামী চিন্তাকে গ্রহণ না করা পর্যন্ত নিজেদেরকে একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক মনে করা তাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর এবং ন্যায়সংগতও নয়।

৬৩
পশ্চিমের ইসলামী গবেষকরা কি চান?

পশ্চিমের একদল অমুসলিম ইসলাম বিশেষজ্ঞের কাছে আমরা প্রাচ্যের মুসলমানরা ঋণী, একথা আমাদের দেশের একদল শিক্ষিত লোকের মুখে প্রায়ই শোনা যায়। তাদের লেখায়ও একথা ভেসে ওঠে। পশ্চিমের এই ইসলাম বিশেষজ্ঞদের আমরা বলি প্রাচ্যবিদ। ইসলামী ইলম ও চিন্তাধারা এবং ইসলামের ইতিহাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের দায়িত্ব তারা পালন করে থাকেন। কিন্তু এই সংগে একথাও সত্য যে, এই চিন্তাবিদদের অধিকাংশই বিভিন্ন ইহুদী সংস্থার কর্মচারী অথবা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের এজেন্ট অথবা কোন খৃষ্টান চার্চের সাথে সংশ্লিষ্ট। আবার অনেককে দেখা যায় একই সাথে চার্চ থেকে বেতন নিচ্ছেন আবার সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চাকুরীও করছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা এখানে ফরাসী প্রাচ্যবিদ ম্যাসিনিউ, হ্যামিলটন জিব ও হিউল্যাণ্ডের নাম করতে পারি। এরা সবাই সরকারী চাকুরীর সাথে সাথে খৃষ্টান মিশনেও কাজ করেন। এজন্য মিশনারী প্রতিষ্ঠানগুলো এদের রচনা থেকে সব সময় সাহায্য গ্রহণ করে থাকে।

এই প্রাচ্যবিদরা মুসলমানদের মধ্যে যে সব বিষ ছড়াচ্ছেন তার একটি হচ্ছে তারা মুসলমানদের মধ্যে তাদের দেশের ইসলাম পূর্ব সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রীতি-নীতির পুনরুজ্জীবনের উস্কানী দিয়ে চলছেন। এ জন্য তারা বিভিন্ন দেশে আন্দোলনও শুরু করে দিয়েছেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর এ সভ্যতা ও রীতিনীতিগুলো মৃত সভ্যতা হিসেবে শুধু ইতিহাসের পাতায় অসাড় হয়ে পড়েছিল।

দেশবাসীর জীবনের সাথে এগুলোর আর কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রাচ্যবিদরা মিসরে ফেরাউনী সভ্যতা, সিরিয়ায় আসিরীয় সভ্যতা এবং লেবাননে ফিনিকীয় সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের জন্য জোরদার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে যদি তারা কামিয়াব হতে পারেন তাহলে হাতে হাতে লাভ। অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে যদি তারা একবার প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের কোন্দল বাধিয়ে দিতে সক্ষম হন তাহলে তারা তাদের মধ্যে এমন এক ভয়াবহ প্রবণতার প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারবেন যা মুসলমানদের দ্রুত ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে থাকবে।

কিন্তু প্রাচ্যবিদরা যখন দেখলেন তাদের গোপন উদ্দেশ্য জাহির হয়ে গেছে এবং মুসলমানরা তাদের ষড়যন্ত্র টের পেয়ে গেছে তখন তারা নতুন পথ ধরলেন। তারা বলতে লাগলেন, আমাদের খামাখা বদনাম করা হচ্ছে, আমরা তো নিছক ইল্‌মী গবেষণা করতে চাচ্ছি। তাদের সদুদ্দেশ্যের প্রমাণ স্বরূপ তাদের প্রচেষ্টায় লণ্ডনে, প্যারিসে ও বার্লিনে এবং আমেরিকার ম্যাকগিলে প্রাচ্য ভাষা শেখার জন্য তিনটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। মুসলমান ছাত্রদের এই কলেজগুলোয় প্রাচ্যভাষা ও প্রাচ্যজ্ঞান শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হলো। নিরপেক্ষ অধ্যয়ন ও জ্ঞান-গবেষণার নামে তারা এগুলো করছিলেন। কিন্তু তাদের আসল লক্ষ ছিল মুসলমানদের চিন্তাগত ভিত্তিগুলোর ওপর আক্রমণ চালানো, মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া এবং মুসলিম যুবসমাজকে ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেয়া। এ ব্যাপারে তারা যথেষ্ট সফলকাম হয়েছেন। কারণ ঐ সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত অধিকাংশ মুসলমানই ইসলাম থেকে দূরে সরে গেছে, তারা ইসলামী আইন ও বিধিবিধানের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব প্রদর্শন করতে শুরু করেছে, এমন কি সুযোগ পেলে এগুলোর প্রতি বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ করছে এবং নিজেদের দীনী সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ পালন করতে লজ্জা অনুভব করছে। মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পলিসির ওপর প্রাচ্যবিদদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ অপরিসীম। মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থায় তারা এমন এমন সব বিষয় অন্তরভুক্ত করাতে সক্ষম হয়েছেন যা তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। ডক্টর ইবরাহীম লিয়ান বলেন ঃ "প্রাচ্যবিদরা আমাদের জন্য একটি বিপদ। এ বিপদটা দীনী ও সাংস্কৃতিক উভয় দিক দিয়ে। কারণ তাদের চিন্তাধারা ভালো-মন্দ, ভুল-নির্ভুল যাই হোক না কেন, মিশ্রভাবে আরব ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় প্রভাব বিস্তার করছে। আর বুদ্ধিজীবীদের ওপর তাদের প্রভাব পড়ছে নেতিবাচক। তারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকেই নিজেদের সাহায্যকারী, নিজেদের উদ্দেশ্যের ধারক-আহবায়ক এবং নিজেদের জ্ঞান ও সাহিত্যের প্রচারক তৈরী করে নিচ্ছেন।"

প্রাচ্যবিদরা নিজেদের বইগুলোর মধ্যে যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছেন, তা আরো মারাত্মক। প্রাচ্যবিদরা জাহেলী যুগ এবং সেই যুগের মূর্তি পূজার আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে অধ্যয়ন করেন গভীরভাবে এবং তাকে পেশ করেন সাহস, ভদ্রতা ও মহান সাংস্কৃতিক যুগের চমকপ্রদ খোলসে। তারা জাহেলীয়াতকে এমনভাবে পেশ করেন যাতে মনে হয় যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের অব্যবহিত পূর্বেই আরব জাতি

সভ্যতা–সংস্কৃতির উচ্চতম শীর্ষে অবস্থান করছিল এবং তাদের মধ্যে জ্ঞান, নৈতিকতা, সুরুচি ও নাগরিক অনুভূতির চরম বিকাশ ঘটেছিল। নবীর আগমন এ ক্ষেত্রে আরবদের জন্য কোন অবদান রাখতে পারেনি। বরং তিনি আরবদের এই জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নতি থেকে লাভবান হন এবং একে নতুনভাবে পেশ করেন মাত্র।

বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ হ্যামিলটন জিব জাহেলিয়াতের যুগকে সাহসিকতা ও বীরত্বের যুগ আখ্যা দিয়েছেন। এভাবে বহু প্রাচ্যবিদ জাহেলিয়াতকে অন্ধকার বলতে আপত্তি করেন। বরং তারা একে আলোকিত সুসংস্কৃত অধ্যায় বলে থাকেন এবং এর মোকাবিলায় ইসলামের যুগকে সম্প্রসারণবাদিতার যুগ আখ্যা দেন। এভাবে তারা মানুষের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি করতে চান যে, ইসলামের আগমন আসলে জাহেলিয়াতের পরিশিষ্টের কাজ করেছে। ইসলাম আরব সমাজে পরিবর্তন আনার সামান্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে মাত্র বরং প্রাচীন চিন্তা ও ভাবধারাগুলোকে প্রায় ক্ষেত্রে অবিকৃতই রেখেছে।

প্রাচ্যবিদরা জাহেলী যুগের প্রতি মুসলমানদের মধ্যে এই যে আকর্ষণ সৃষ্ট করার প্রয়াস চালিয়েছেন, এটা আসলে ইহুদীদের ফ্রীম্যাসন আন্দোলনের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল। ফ্রীম্যাসন আন্দোলনও দীর্ঘদিন থেকে ইসলামপূর্ব যুগের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই যুগকে নতুনভাবে পেশ করছে এবং মুসলমানদের পুনর্বার এ যুগের ভাবধারা অবলম্বন করার উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে।

ফ্রীম্যাসন আন্দোলন ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের বহু কিসসা কাহিনী ঐতিহ্য ও রীতিনীতি হিমাগার থেকে উঠিয়ে এনেছে এবং সেগুলোর মধ্যে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করেছে। এসব কাহিনী ও ঐহিত্য তারা উদ্ধার করেছে ইবরানী, তুরানী, গ্রীক, হিন্দী ও সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার থেকে। এর মধ্য দিয়ে এ আন্দোলনটি জাহেলীযুগের গভীর তাৎপর্যময় রহস্য ও ইংগিতসমূহ মুসলমানদের মনে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবল প্রচেষ্টা চালিয়েছে। নিছক মুসলমানদের মন থেকে ইসলামের গুরুত্ব কমিয়ে দেবার জন্য তারা প্রাচীন আরবী, গ্রীক ও ভারতীয় সাহিত্যের কচকচি মুসলমানদের সামনে পেশ করেছে। এ আন্দোলনটি মুসলমানদের মধ্যে অনৈসলামী কার্যকলাপ বৃদ্ধি করার জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এরা অনুভব করতে সক্ষম হয়েছে যে, মুসলমানরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত থাকে তাহলে এই ইসলাম বিরোধীরা নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারবে না। তাই জ্ঞান চর্চা ও তাত্ত্বিক গবেষণার নামে তারা মুসলমানদের মধ্যে বিশৃংখলা ও

নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উম্মতে মুসলিমা মাত্র অর্ধ শতক পূর্বেও একটি দলভুক্ত ছিল। কিন্তু ফ্রীম্যাসন ও প্রাচ্যবিদদের এ আন্দোলনের ফলে বর্তমানে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মিসরে ফেরাউনী সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। শ্লোগান দেয়া হয়েছে : নাহনু আবনাউ ফেরায়েনা–"আমরা ফেরাউনের বংশধর।" লেবাননে ফিনিকী সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এবং এটা লেবাননবাসীদেরকে ইসলামী সভ্যতা থেকে সম্পর্কচ্যুত করে তাদের প্রাচীন জাহেলী সভ্যতার সাথে সম্পর্কিত করার দুরভিসন্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবে আরবে, ইরানে ও তুরস্কেও এ প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

হিমালয়ান উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যেও ফ্রীম্যাসন ও প্রাচ্যবিদদের এ প্রচেষ্টা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। বাংলার মুসলমানদেরকে ইসলামের কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এখানে তারা ইসলাম পূর্ব বাংলার জাহেলী সভ্যতার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা চালিয়েছে। জাহেলী যুগের বাংলার যে শাসকের সাথে মুসলমানদের প্রথম সংঘর্ষ বাধে সেই লক্ষণ সেনকে তারা উপস্থাপিত করেছে একজন সফল বীর ও দয়ালু শাসক হিসেবে। ইসলাম পূর্ব সপ্তম শতকের বাংলার হিন্দু শাসক শশাংককে উপস্থাপিত করেছে বাংলার আদর্শ নায়ক রূপে। এভাবে জাহেলী যুগের বাংলাকে বাংলার মুসলমানদের সামনে উপস্থাপিত করেছে আদর্শ হিসেবে।

প্রাচ্যবিদদের ইসলামের ব্যাখ্যা ও মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতির পেছনে যে ভাবধারা ও উদ্দেশ্য কাজ করছে সে সম্পর্কে মুসলমানরা সতর্ক হতে চলেছে। কিন্তু মুসলিম দেশের সরকারগুলো এখনো তাদের খপপর থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারেনি।

৬৪
জাতিসত্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

বিদ্রোহ শব্দটার মধ্যে অনেক তেজ আছে। একে বুদ্ধিমানরা ব্যবহার করে, বোকারাও ব্যবহার করে আবার ব্যবহার করে স্বার্থবাদীরাও। শক্তিমানরা একে ব্যবহার করে শক্তি বাড়ায়। আর শক্তিহীনরা একে ব্যবহার করে শক্তি অর্জন করে। বিদ্রোহ সংগঠিত ও অসংগঠিত দুই ভাবেই হয়। তবে অসংগঠিত বিদ্রোহ সব সময় কাল হয়ে দাঁড়ায়। পরিণামে হয় ক্ষতি ও ধ্বংস। আবার বোকার বিদ্রোহ ও স্বার্থবাদীদের বিদ্রোহও এরি আশেপাশেই জায়গা করে নেয়।

উপমহাদেশে ইংরেজের আগমন, ইংরেজের শাসন ক্ষমতা দখল ও পরিচালনা এবং ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রসারের সাথে সাথে মুসলিম সমাজের এক অংশের চিন্তায় ও মননে এক ধরনের বিদ্রোহের বীজ উপ্ত হয়। এই বিদ্রোহ ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়, আবার ইংরেজ আনীত শিক্ষা ও সভ্যতার বিরুদ্ধে নয়। বরং এ বিদ্রোহ ইংরেজের চিন্তা ও ভাবধারা সঞ্জাত। ইংরেজের এতবড় হৃদয়বত্তা ছিল বলে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই যে, নিছক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে তারা এদেশের মানুষকে উন্নত জীবন ধারার সাথে পরিচিত করতে চাচ্ছিল। বরং ইংরেজের উদ্দেশ্য ছিল, শিক্ষার মাধ্যমে এ দেশের মানুষের চিন্তায় ও মননে তাদের চিরাচরিত বিশ্বাস ও রীতি–নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব জাগিয়ে তোলা। ইংরেজ তার এ উদ্দেশ্যে সফল হয়েছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানের মনে ইংরেজ এই বিদ্রোহের বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছে। একদল মুসলমান, নিজেদের জাতীয় শিক্ষার সাথে যাদের কোন সম্পর্ক ছিল না বা সম্পর্ক থাকলেও দুর্ভাগ্যক্রমে জাতীয় শিক্ষার বিকৃত চেহারার সাথেই যারা পরিচিত ছিল, তারা এই বিদ্রোহের বলী হয়। নিজেদের ঈমান–আকীদা, জাতীয় ভাবধারা, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, সবকিছুর বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করে। গত একশো বছর থেকে উপমহাদেশে এ বিদ্রোহের ঝান্ডা নিয়ে মুসলমান নামধারী বেশ কিছু লোক এগিয়ে গেছে। তারা কখনো প্রগতিবাদ কখনো মুক্তবুদ্ধির ধূয়া তুলেছে। তাদের কিছু অংশ আবার অতি উৎসাহী ও অতি বিদ্রোহী। তারা বিদ্রোহ করেছে সবকিছুর বিরুদ্ধে। ঈমান আকীদা তো আছেই, এটা নেহাতই সেকেলে বস্তু, প্রচলিত সব রীতিনীতির বিরুদ্ধেও তাদের বিদ্রোহ।

এমনি এক বিদ্রোহীর সাথে জাতিকে পরিচিত করবার দায়িত্ব পালন করেছেন ঢাকার একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। এই বিদ্রোহী ব্যক্তিটি নাকি মস্তবড় পণ্ডিত। তিন দশক থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জ্ঞান দিয়ে আসছিলেন। বর্তমানে এই দায়িত্ব থেকে অবসর লাভ করেছেন। পত্রিকা কর্তৃপক্ষও তাঁর বিদ্রোহকে বেশ জাঁকিয়ে ফলাও করেছেন, যেন তিনি আমাদের জন্য মহত্তম আদর্শ।

এই মহাজ্ঞানী ব্যক্তিটির জ্ঞানের বহর একটু দেখুন। আমাদের শাসক ও রাজনীতিবিদদের প্রচারিত ইসলামের চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেন ঃ "আমেরিকাই তো ইসলাম প্রচার করাচ্ছে।" তার মানে হচ্ছে, এখন আমেরিকা ইসলাম ছড়াচ্ছে আর যখন আমেরিকা ছিল না তখন ইংরেজ ইসলাম ছড়িয়েছে। আর যখন ইংরেজ ছিল না তখন হিন্দুরা ছড়িয়েছে। মোটকথা ইসলামের নিজের মধ্যে কোন শক্তি নেই। সবসময় সে তার শত্রুর করুণার মুখাপেক্ষী।

আরো একটু দেখুন। আমাদের দেশের ইসলামের প্রবক্তাদের চরিত্রের স্বরূপ কি– এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেন ঃ "আমি মনে করি ইসলামের প্রবক্তারা 'মক্কর' (ভণ্ড)। কারণ তাদের জীবনে ইসলাম যতোটা আছে আমাদের জীবনেও ততোটা আছে। ইসলাম তাঁরা জীবনে আচরণ করেন না, সরকারী সুযোগ পেয়ে তারা নেতা হয়ে আমাদের ইসলাম শেখান। ইসলামে সব সমস্যার সমাধান আছে, একথা বলেন কিন্তু নিজেরা বিশ্বাস করেন না। ইসলামকেই শ্রেয় মনে করলে নিজেদের জীবনে তার বিকাশ সাধনের চেষ্টা না করে নিজেদের সন্তানদের মাদরাসায় না দিয়ে বিলেতে আমেরিকায় পাঠাতেন না। কাজেই তাঁরা ধর্মের কথা বলেন জনসাধারণকে প্রতারণা করার জন্য।"

তিরিশ বত্রিশ বছর ধরে জাতির কেন্দ্রীয় প্রধান শিক্ষায়তনটিতে যিনি মানুষ গড়ার কারিগরের কাজ করেছেন তাঁর জ্ঞানের বহরটুকু একবার দেখে নিন। তাঁর জ্ঞান সিন্ধুর গভীরতা দেখে করুণা করা ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকে না। এই জ্ঞান তিনি এতদিন হাজার হাজার ছেলেমেয়েদের মগজে পাচার করেছেন। আর এই জ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি নিজেকে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আসলে একটা জিনিসকে ভেঙে ফেলা যেমন সহজ তেমনি সবকিছুকে 'না' বলে দেয়াও সহজ। কিন্তু একটা জিনিসকে গড়া সেটাকে ভেঙে ফেলার চেয়ে যতগুণ কঠিন ঠিক তেমনি কোন কিছুকে 'না' বলে দেওয়ার তুলনায় সেটিকে 'হাঁ' বলাও ঠিক ততগুণই বরং তার চেয়ে অনেক

বেশী কঠিন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মহাজ্ঞানী ডক্টরেট ডিগ্রীধারী অধ্যাপক সাহেব, যিনি নাকি এদেশে 'অনন্য' যতটুকুন কুয়োর জ্ঞান আহরণ করে ঈমান, ঐতিহ্য ও প্রচলিত প্রথাকে অস্বীকার করতে পেরেছেন, তাকে স্বীকৃতি দেবার জন্য তার চেয়ে অনেক বেশী সাগরের জ্ঞান লাভের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা তিনি লাভ করতে পারেননি। তাই তাঁর এ বিদ্রোহ এক ধরনের বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই বোকামীর ওপর করুণা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

এ ধরনের বোকামীকে মাথায় বসিয়ে একদল লোক ধেইধেই করে নাচতে ভালোবাসেন। ভাবটা এই, যেন তারা বাজীমাত করে ফেলেছেন। কিন্তু এতে যে তাদেরও বোকামী ধরা পড়ে যায় সেদিকে তাদের নজর নেই। অবশ্যই একটা জাতি সম্পর্কে এভাবে চিন্তা করা যায় না এবং দুনিয়ায় কোনদিন কেউ চিন্তা করেনি। একটা জাতি তার বিশ্বাস, আদর্শ, ঐতিহ্য, রীতিনীতি নিয়েই পৃথক জাতিসত্তার অধিকারী। আর কুসংস্কার, ভুল বিশ্বাস ও কুরীতি ইত্যাদিগুলো কোন দিন কোন জাতির উন্নতির সহায়ক হয়নি। এগুলো কোন জাতিসত্তার অংশ নয়। কাজেই এই স্বতন্ত্র জাতিসত্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার ইন্ধন যোগানো মোটেই শুভলক্ষণ ও শুভবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। বরং আমাদের প্রশ্ন তো এখানেই যে, এ ধরনের চিন্তা ও ভাবধারার অধিকারী লোকদের–যারা আমাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তার ভিত ধ্বসিয়ে চলেছে কিভাবে তিরিশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত জাতির ভবিষ্যত বংশধরদের গড়ে তোলার শ্রেষ্ঠ কারখানায় বসিয়ে রাখা হয়েছিল? এবং এ ধরনের কারিগর নিশ্চয়ই এসব কারখানায় আরো অনেক আছেন, যারা আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের উচ্ছৃংখল ও নীতিহীন করার কাজে সাহায্য করেছেন ও করে যাচ্ছেন, যার ফলে আমাদের জাতীয় চরিত্র আজ ভগ্ন দশায় উপনীত হয়েছে। একটি জাতিসত্তার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত পর্যায়েও নিজস্ব মতবাদ ও ভাবধারা প্রচার করার অধিকার যদিও তর্কাতীত নয় এবং দুনিয়ায় এমন কোন নির্বোধ ও অচেতন জাতির কথা আমাদের জানা নেই যারা আত্মহননের এহেন প্রচেষ্টার অনুমতি দিয়েছে, তবুও আমরা বলবো, জাতির অর্থে গড়ে তোলা এসব জাতি গড়ার কারখানায় এই ধরনের অনুমতি তো কোন ক্রমেই দেয়া যেতে পারে না। সমগ্র জাতিকে এ ব্যাপারে সজাগ ভূমিকা পালন করতে হবে।

এটাই বা কম কিসে। দেশের একদল শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী জাতির ভবিষ্যত বংশধরদের ভবিষ্যত ঝরঝরে করে দেবার জন্য গত দু'দশক থেকে উঠেপড়ে লেগেছেন। তার ওপর আছে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো শিক্ষা বিভাগের আদর্শ ও লক্ষহীনতা। আন্তরজাতিক সুরের সাথে তাল মিলিয়ে একদল জন্ম দিয়েছেন সেক্যুলার সাহিত্যের, নীতি বিগর্হিত জীবনাচরণের। আর শিশুদের জন্য সেখানে পাত পেতে দেয়া হল উদারভাবে। কিভাবে এখানে স্বীকৃত হয়ে গেল যে, ভবিষ্যত বংশধরদের শুধু আমোদ আহলাদের মধ্য দিয়ে শুধু হাস্য-কৌতুকের বিষয় শিক্ষা দিতে হবে? সিরিয়াস কোন বিষয়ের ধারে কাছে তাদের নিয়ে যাওয়া যাবে না? জাতীয় আদর্শ, ভাবধারা, উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী শিক্ষা দেয়া তাদের জন্য হলাহল? যাতে শিশুদের জীবন গড়ে ওঠে, তারা দেশ, জাতি ও মানবতাকে সত্যিকারভাবে ভালোবাসতে পারে, উন্নত, সৎ ও আদর্শ জীবন গঠনের মালমশলা সংগ্রহ করতে পারে শিক্ষার অংগণ ও পাঠ্য বইয়ের মধ্য থেকে-এদিকে নজর দেওয়াকে দস্তুরমতো হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আর আজ জাতীয় পর্যায়ে হা-হুতাশ করা হচ্ছে, কোরাসে কান্না জুড়ে দেয়া হয়েছে : হায়, আমাদের ছেলেরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষাংগণে গুণ্ডামী আর বদমায়েশী আস্তানা গেড়েছে। শিক্ষায়তনগুলো হয়ে উঠেছে বখাটে, হাইজাকার ও লুচ্চা তৈরীর কারখানা। এসব কাদের কর্মফল? بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ -আমাদের বড়দের, জ্ঞানীদের, জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের স্বোপার্জিত এই উপহার। যেমন আমরা গভীর চিন্তা-ভাবনা করে, আন্তরজাতিক পাণ্ডিত্যের বহর দেখিয়ে বীজ বুনেছিলাম তেমনি তার ফসল কাটতে এখন আর ব্যাজার কেন?

তারপর এই জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের এক অংশ আর এক ষড়যন্ত্রে মেতেছেন। শিশু ও কিশোর শিক্ষার পাঠ্যসূচী থেকে সততা, নৈতিকতা ও সৎবৃত্তির বিকাশ উপযোগী সমস্ত বিষয় ঝেঁটিয়ে বাদ দিয়েও তারা নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। গত অর্ধ যুগ থেকে তারা নেমে পড়েছেন শিশু-কিশোরদের মাথা খাবার অভিযানে। শিশু-কিশোরদের মগজ ধোলাই এখন তাদের একটা পবিত্র দায়িত্ব। বিগত পঞ্চাশ-ষাট বছর থেকে রাশিয়ায় ও চীনে মার্কসবাদীরা তাদের দেশের মানুষদের ক্ষেত্রে যে পবিত্র দায়িত্বটা পালন করে আসছেন,

অর্থাৎ মগজ ধোলাই করে যেভাবে দেশবাসীদের নাস্তিকতাবাদের অংগণে ঢোকাবার চেষ্টা করে আসছেন, ঠিক তেমনি আমাদের দেশের গুটিকয় হস্তিপণ্ডিত মার্কা বুদ্ধিজীবী শিশু-কিশোরদের মগজ ধোলাইয়ে নেমে পড়েছেন। আর তাদের এই শিশু-কিশোর মগজ ধোলাই কারখানাটির কেন্দ্রীয় অংশ স্থানান্তরিত হয়েছে মনে হয় বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে।

এটা একটা চমকপ্রদ বিষয়। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ যাদের পঁচাশি থেকে নব্বই ভাগ মুসলমান, আর বাকি যে দশ পনের ভাগ আছে অমুসলিম তাদের সবাইও ধর্মভীরু, এহেন জনতার অর্থে গড়ে ওঠা সরকারী শিশু প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়েছে একদল বর্ণচোরা নয়, বিঘোষিত নাস্তিকের হাতে। এটা রাতদিন ইসলামের নাম ভজনকারী সরকারের কোন্ ধরনের ইচ্ছা, মানসিকতা ও সংকল্পের পরিচায়ক তা অবশ্যই আমাদের জানতে হবে। এই একাডেমীটি 'জ্ঞানের কথা' নাম দিয়ে রকমারি আকর্ষণীয় চিত্র সাজিয়ে সুন্দর ছাপা ও বাঁধাইয়ে ২২৫ পৃষ্ঠার যে একখণ্ড বই খাড়া করেছে তার মধ্যে মূলত অজ্ঞানের কথাই রয়ে গেছে। জ্ঞানের কথার মধ্যে শিশু কিশোরদের যে জ্ঞান তারা দিতে চেয়েছে তার মূল বিষয়বস্তু ও চালিকাশক্তিই দেশের শতকরা ৯৯ জন লোকের কাছে নিরেট অজ্ঞানতা। বিশ্ব-জগতের সৃষ্টির মূলে কোন স্রষ্টা নেই এই ভাবধারা রাশিয়া বা চীনের মতো দেশে শিশুদের দেবার একটা আইনসংগত ভিত্তি আছে। কিন্তু বাংলাদেশের শিশুদের এ জ্ঞান দেবার আগে জাতীয় পর্যায়ে এটা আগে স্বীকৃত হয়ে যাওয়া দরকার যে, বিশ্ব-জগতের সৃষ্টির মূলে কোন স্রষ্টা বা আল্লাহ নেই। এটা কি সমগ্র জাতি মেনে নিয়েছে? তাহলে জাতি না মেনে নিয়ে থাকলে জাতীয় ভাবধারা, আদর্শ ও জাতীয় বিশ্বাস বিরোধী (বিশেষ করে দেশের শাসনতন্ত্রের ভূমিকায় যেখানে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থার কথা লিখিত হয়েছে) এ ধরনের চিন্তা শিশুদের মগজে পাচার করার দায়িত্বটা শিশু একাডেমী কোন্ সুবাদে পেল? জাতির অর্থে জাতির ভবিষ্যতকে এভাবে ধ্বংস করার সাহস তাদেরকে কে যোগাল?

বিশ্বকোষ ধরনের এ বইটি ২০ খণ্ডে উপস্থাপন করার ইচ্ছা একাডেমী পোষণ করেছে। তার মাত্র এই প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এই খণ্ডের ১৯টি বিষয়ের মধ্যে ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, খেলাধুলা, পৌরনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সবকয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই স্থান পেয়েছে। পরবর্তী পর্যায়েও এমনিতর জানার মতো প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো স্থান পাবে। এমনিতর জ্ঞান বাংলাদেশের শিশুদের জন্য যে প্রয়োজন তাতে

কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রথম খণ্ডেই একাডেমী যে জ্ঞানের বহর দেখিয়েছে এবং যেভাবে মার্কামারা নাস্তিক, কমিউনিস্ট, মার্কসবাদী ও সেক্যুলারিস্টদের দিয়ে এই জ্ঞানের জাহাজের মালমসলা তৈরী করা হয়েছে তাতে এটা ঢাকার পরিবর্তে মস্কোর নভোস্তি প্রকাশনীর একটা বাংলা সংস্করণ বলেই মনে হবে। কমরেড অজয় রায়, হায়াৎ মামুদ ইত্যাদিকে দেখে তো এই একিন আরো পোখতা হবে।

বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা বাংলাদেশকে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত করতে না পারলেও মুসলমান জনগণের টাকায় আর রাতদিন ইসলামের নাম ভজনকারী সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাংলাদেশের মুসলমানদের ছেলেমেয়েদের কমিউনিস্ট ও নাস্তিক বানানোর সুযোগটা পেয়ে গেছেন। জ্ঞানের কথায় জ্ঞানের নামে জ্ঞানের সাথে মিশিয়ে অজ্ঞানের বড়ি শিশুদের গেলাবার কাজটা তারা ভালভাবেই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের এই অজ্ঞানতা দেশের জনগণ মেনে নেয়নি। কিন্তু সরকারী ছত্রছায়ায় তারা এটা করতে সক্ষম হচ্ছেন।

এখন তাদের এই জালিয়াতি ধরা পড়ার পর তাদের উচিত শাস্তি প্রাপ্য হয়ে গেছে এতে সন্দেহ নেই। একটা মুসলিম দেশে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা ও ভাবধারা বিরোধী তাদের এই নাস্তিক্যবাদী চিন্তার প্রচারের সুযোগ কতটুকু আছে তা যথারীতি তর্কসাপেক্ষ হলেও (তাদের আদর্শ স্বপ্নের দেশ রাশিয়ায় কি কমিউনিজম বিরোধী কোন কিছু প্রচারের সুযোগ আছে?) সরকারী অর্থে তাদের এই প্রচারণার কোন অধিকারই নেই। এটা এক ধরনের খেয়ানত এবং অবশ্যই এর শাস্তি হওয়া উচিত। এভাবে সরকারী অর্থে বিভিন্ন ঘাঁটিতে বসে তারা জাতির শিকড় কেটে চলেছেন।

তাদের এই অবাক করা দুসাহস ও অজ্ঞতার কোন সীমা নেই। প্রেসিডেন্ট এরশাদ বইটি সংশোধন করে বাজারে ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মতে এটা সংশোধনের অযোগ্য। কারণ এর ভাবধারা, যা বইটির প্রতিটি বিভাগে ও প্রতিটি পাতায় সঞ্চরণশীল, সত্য এবং ইসলামী ভাবধারার সম্পূর্ণ বিরোধী। বিজ্ঞানের নামে এখানে কিছু গাঁজাখুরী চিন্তাকে স্থান দেয়া হয়েছে। দেশের জাতীয় সংবাদপত্রগুলোয় এ নিয়ে যথেষ্ট লেখালেখি হয়েছে এবং এর গলদের অনেকগুলো দিক চিহ্নিত হয়ে গেছে। তবে বইটির মূল গলদ এখানেই যে, সমগ্র বইটিই কুরআন বিরোধী ও নাস্তিক্যবাদী চিন্তার ভিত্তিতে লিখিত। কুরআনের সাথে বিজ্ঞানের প্রমাণিত সত্যের কোন বিরোধ নেই-এটা আজকের বিশ্বে সর্বজন স্বীকৃত। এমনকি কুরআনে চৌদ্দশো বছর আগে সৃষ্টি

জগতের যে রহস্যের সন্ধান দেয়া হয়েছে বিজ্ঞান আজ তার কোন কোনটার দ্বারোদঘাটন করছে মাত্র। কুরআন মহাশূন্যে পৃথিবীর মতো আরো অসংখ্য পৃথিবীর এবং সেখানে মানব জাতির মতো সৃষ্টিকূলের যে সন্ধান দিয়েছে বিজ্ঞানের কাছে এখনো সেটা থিওরীর পর্যায়েই রয়ে গেছে। এ প্রসংগে তথাকথিত জ্ঞানের কথা বইয়ের পণ্ডিতদের লেখা একটা মাত্র দৃষ্টান্ত আমি দিতে চাই। জ্ঞানের কথা ভাষা অধ্যায়ে ২৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছেঃ "পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মানুষেরই ভাষা আছে। পাখী ভয় পেলে চিৎকার করে, আনন্দে সুর তোলে, বানরেরা চিৎকার করে রাগ, ভয় ও আনন্দ প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু পশু-পাখীর শিস, সুর বা চিৎকার ভাষা নয়। মানুষের ভাষাই শুধু ভাষা, কেননা তা সুশৃংখল ও ব্যাপক।" অথচ আপনি কুরআন খুলুন, তার বহুস্থানে পশু পাখির ভাষার সন্ধান পাওয়া যাবে। সূরা নামলে ২০নং আয়াতে হুদহুদ পাখির সাথে নবী সুলায়মান আলাইহিস সালামের দীর্ঘ কথোপকথন পাওয়া যাবে। একই সূরার ১৮ নং আয়াতে দেখা যাচ্ছে সুলায়মান আলাইহিস সালামের বাহিনীকে দেখে পিঁপড়ে দলের সরদার তার দলবলকে এই বলে সতর্ক করে দিচ্ছেঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا۟ مَسَـٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَـٰنُ
وَجُنُودُهُۥ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (النمل : ١٨)

"হে পিঁপড়ের দল। তোমাদের নিজের নিজের গর্তে ঢুকে পড়ো, যাতে সুলায়মান ও তাঁর সৈন্যরা তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের পায়ের তলে দাবিয়ে না দেয়।"

এ ছাড়া একই সূরার ১৬ নম্বর আয়াতে হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালাম বলেছেনঃ "হে লোকেরা! আমাকে পাখির ভাষা শেখানো হয়েছে।" এ থেকে বুঝা যায়, মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীরও ভাষা আছে। কিছুকাল পূর্বে পাশ্চাত্যের একজন পশু বিজ্ঞানীর নিজস্ব অভিজ্ঞতার খবরও বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি কয়েক বছর হাঁস-মুরগীর খোঁয়াড়ে তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের ভাষা শিখে ফেলেছিলেন।

এই প্রেক্ষিতে জ্ঞানের কথার এই সাধারণ জ্ঞানটার কথা বিবেচনা করুন। আসল জ্ঞান থেকে দূরে শিশুদের কোন্ ধরনের সাধারণ জ্ঞান দিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এভাবে সমস্ত বইটিই আসলে যথার্থ বিজ্ঞান সম্মত ও যথার্থ জ্ঞানের পরিবর্তে একটা আজগুবি তথাকথিত জ্ঞানের কথায় পরিণত হয়েছে।

সরকারী অর্থের এভাবে অপচয় করার জন্য শিশু একাডেমীর পরিচালকবৃন্দের অবশ্যই যথাযোগ্য শাস্তি হওয়া উচিত। এবং এই সাথে সরকারী অর্থে পরিচালিত প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে জাতীয় আদর্শ ও ভাবধারা বিরোধীদের ছাঁটাই হওয়া একান্ত প্রয়োজন। 'জ্ঞানের কথা' আমাদের যে জ্ঞান দিয়েছে তা থেকে আমাদের এ চৈতন্য হওয়া উচিত। নয়তো একদিন দেখা যাবে এই জ্ঞানের কথার সহোদর জ্ঞান পাপীরা অমাদের জাতীয় জ্ঞানেরই শিকড় কেটে দিয়েছে। এবং নিজেদের জ্ঞানের রাজ্যে আমরা আগাছায় পরিণত হয়েছি। কাজেই সময় থাকতেই সাবধান হওয়া উচিত।

৬৬
অনৈসলামী চিন্তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে

ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো বিগত দু'শো বছরে মুসলিম দেশগুলোয় যে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তা আমাদের সবচাইতে বড় ক্ষতি সাধন করেছে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। এই ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো সর্বত্র একজোটে মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম, ধর্মীয় শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে তারা এমনভাবে ঢেলে সাজিয়েছে যার ফলে মুসলমানদের মাথার খুলির মধ্যে গড়ে উঠেছে অমুসলিম মস্তিষ্ক। শিক্ষিত মুসলমান মানেই ইসলাম বিরোধী চিন্তার ধারক, ইসলাম বিরোধী চিন্তার সাথে আপোশকামী, ইসলাম বিরোধী চিন্তার প্রতি অনুরক্ত অথবা কমপক্ষে ইসলাম বিরোধী চিন্তার প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছে। আর শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে যারা ইসলামের ওপর এখনো প্রতিষ্ঠিত আছে, তাদের এই মনোভাব ও মনোবলের কারণ এই শিক্ষা নয়, অন্য কিছু।

এইভাবে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় আমাদের ঔপনিবেশিক প্রভুরা আমাদের বৃহত্তর ও সর্বাধিক কর্মক্ষম অংশটিকে ইসলাম থেকে আলাদা করে ফেলেছে। এই অংশটিকে ইসলাম থেকে স্থায়ীভাবে আলাদা করে রাখার জন্য তারা নিজেদের অন্য সমস্ত মতবাদের তুলনায় তাদের জন্য মার্কসবাদকে বেশী পছন্দ করেছে। অথচ এই মার্কসবাদকে তারা নিজেদের জন্য মোটেই পছন্দ করে না। একে তারা নিজেদের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করে। কিন্তু মুসলমানদের জন্য একে পছন্দ করার কারণ হচ্ছে এই যে, ইসলামের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক এত বেশী নিবিড় এবং আল্লাহর কিতাব কুরআনের প্রতি তাদের বিশ্বাস এত বেশী পাকাপোক্ত যে, কোন সেক্যুলার চিন্তা তাদের এই বিশ্বাসের ভিত চিরতরে ধ্বসিয়ে দিতে সক্ষম নয়। তাই তারা নাস্তিক্যবাদপ্রসূত এমন এক বিশ্বাসের ভিত মুসলমানদের জন্য পছন্দ করেছে, যার মধ্যে প্রবেশ করার পর মুসলমানদের আর তা থেকে ফিরে আসার কোন সুযোগই থাকবে না। পঞ্চাশের দশকে আলজিরিয়ার আযাদী সংগ্রামের সময় ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসকরা আলজিরীয় মুসলিম স্বাধীনতা সংগ্রামী

দলগুলোর মধ্যে পরিকল্পিতভাবে মার্কসবাদী চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটায়। ফলে ঔপনিবেশিক শাসকদের বিদায়ের সময় তারা মার্কসবাদ প্রভাবিত নেতৃত্বের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা সোপর্দ করে চলে গেছে।

এর ফলে ঔপনিবেশিক শাসকদের যে সবচেয়ে বড় লাভটি হয়েছে সেটি হচ্ছে, স্বাধিকার লাভ এবং নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গড়ে তোলার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার লাভ করার পর মুসলমানরা ইসলামী বিপ্লব সাধনের প্রচেষ্টায় ব্রতী না হয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে ঢলে পড়েছে। আর এই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমাদের পশ্চিমা পুঁজিবাদী প্রভুদের ঠিক সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রাণঘাতী প্রতিযোগী নয়। বরং তাদের সাথে একই সভ্যতার ধারক প্রতিদ্বন্দী মাত্র। অন্যদিকে ইসলামী ব্যবস্থা তাদের প্রাণঘাতী শত্রু। সারা বিশ্বে সেক্যুলারবাদ, নাস্তিক্যবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ তথা পাশ্চাত্য চিন্তা ও সভ্যতার মূলোৎপাটনই এই ইসলামী ব্যবস্থার প্রধানতম দায়িত্ব।

তাই আমাদের ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক প্রভুরা ইসলামকে তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করেছে। বিভিন্ন মুসলিম দেশে তারা ইসলামের আগমনের পথ রোধ করেছে এবং এ জন্য মার্কসবাদের সাহায্য গ্রহণ করেছে। এমন কি আমাদের এই উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক শাসক ইংরেজদের সুযোগ্য নাগরিক ভারতীয় কংগ্রেসের নেতা পণ্ডিত নেহরুও ভারতীয় মুসলমানদের জন্য ইসলামের তুলনায় মার্কসবাদ বেশী ফলপ্রসূ বলে মনে করতেন। পণ্ডিতজী নিজে নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুদের মধ্যে মার্কসবাদের প্রসার পছন্দ করতেন না। কিন্তু মুসলমানদের রোগের জন্য তিনি এটাকেই সবচেয়ে ভালো প্রতিশেধক মনে করতেন। তাঁর মতে কুরআন ও ইসলামের প্রতি মুসলমানদের অবিচল ঈমান তাদের ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়ানকে গভীরভাবে ভালোবাসার পথে একটি বড় বাধা। কুরআন ও ইসলামের প্রতি মুসলমানদের ঈমানে চিড় ধরাতে না পারলে তারা "ভারত মাতাকে" গভীরভাবে ভালোবাসতে পারবে না। আর তাদের এই ঈমানে চিড় ধরাবার ক্ষমতা একমাত্র সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদের করায়ত্ত। পণ্ডিত তাঁর আত্মজীবনীতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আমাদের দেশে শিক্ষিত সমাজে মার্কসবাদী ভাবধারা আজ মুসলমানদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিতে চলেছে। শিক্ষার মাধ্যমে বলতে গেলে গত ৫০ বছর ধরে এই ভাবধারাটিই মনের মধ্যে গভীরভাবে বসিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র

ইত্যাদির মধ্যে অবশ্যি সর্বত্র মার্কসবাদকে সক্রিয় দেখানো হচ্ছে। এমন কি বাংলা ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস এবং বাংলার সাংস্কৃতিক গতিধারায়ও একে চালিকাশক্তি হিসেবে দেখানোর চেষ্টা চলছে। শিক্ষিত সমাজের একটি অংশ বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে মার্কসবাদী চিন্তাকে জনপ্রিয় করার রেডিও, টিভি ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলোর অব্যাহত প্রচেষ্টা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশেষ করে ইসলামী ভাবধারার শিক্ষা যেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এবং দেশের প্রচার মাধ্যমগুলো যেখানে দিনের পর দিন ইসলাম বিরোধী প্রচারণায় মুখর হতে চলেছে এবং ইসলামী ভাবধারা, আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের প্রতি তরুণদের মনে বিকর্ষণ সৃষ্টিতে তৎপর সেখানে এই মার্কসবাদী উপস্থিতিকে তরুণদের ওপর পূর্ণ বিজয় লাভ করার একটি কৌশল হিসেবেই ধরা যেতে পারে।

এর চাইতে আর এক পা এগিয়ে গেলে আমরা দেখি, দেশের যে সাধারণ অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে মার্কসবাদ ও নাস্তিক্যবাদের প্রবেশের কোন পথ নেই, সেখানেও এই মতবাদে বিশ্বাসীরা আজ রাজনীতির অংগণ দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা চালাচ্ছে। চলতি নির্বাচন যতই প্রহসনমূলক হোক না কেন ক্ষুদ্র হলেও একটি মার্কসবাদী গ্রুপের এতে সাফল্য গুরুত্বের দাবীদার। জনগণের ভোট নেবার জন্য জনগণের সামনে মার্কসবাদ ও নাস্তিক্যবাদের ব্যাখ্যা দেবার এদের প্রয়োজন হয় না। বরং এ ধরনের ব্যাখ্যা দিলে মুসলিম জনগণ প্রথম পর্বেই তাদেরকে পগার পার করে দিয়ে ছাড়বে। তাই সেখানে তারা পশ্চিমা মিশনারীদের কায়দায় অগ্রসর হয়। তারা যা চায় তা তারা জানে। কিন্তু জনগণের কাছে যা বলতে হয় তাই তারা বলে। এভাবে তাদের ও জনগণের মধ্যে একটা বিশাল ফাঁক থেকে যায়। কিন্তু আমাদের মতে এই ফাঁকটিই তাদের জন্য সবচেয়ে বড় ও সার্বক্ষণিক বিপদ। একটি অনুন্নত ও দারিদ্র পীড়িত দেশ হবার কারণে খৃষ্টান মিশনারীদের মতো মুসলমানদের ওপর তাদের বিজয় সীমিত পর্যায়ের ও সাময়িক। ইসলামী আন্দোলনের অগ্রগতির সাথে সাথে তাদের পশ্চাদপসরণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তবে এ ক্ষেত্রে যে কাজগুলো করা দরকার তা হচ্ছেঃ এক ঃ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। ইসলামী চিন্তার সাথে সংঘর্ষশীল চিন্তা ও ভাবধারা থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো মুক্ত করতে হবে। আর যেখানে এগুলোর স্থান দেয়া একান্তই প্রয়োজন সেখানে যথার্থ পর্যালোচনা ও এর মৌলিক গলদ চিহ্নিত করেই একে পাঠ্যপুস্তকে স্থান দিতে হবে।

দুই ঃ দেশের প্রচার মাধ্যমগুলোকে একদিকে ইসলামী ভাবধারা ও মতাদর্শ বিরোধী প্রচারণামুক্ত করতে হবে এবং অন্যদিকে ইতিবাচক প্রচারণার দৃষ্টিতে এই মাধ্যমগুলোকে গড়ে তুলতে হবে।

তিন ঃ অভাব, দারিদ্র, দুর্নীতি দূর করার ও চারিত্রিক বিপর্যয় রোধ করার জন্য দেশে ইসলামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে।

ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এই বিধান মানুষের জৈবিক ও আত্মিক উভয় প্রকার চাহিদা পূরণ করেছে। যিনি এই চাহিদা সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান রাখেন তিনিই এই চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই এই জীবন বিধান তিনিই তৈরী করেছেন। আর যেহেতু এই জীবন বিধান মানুষের জন্য তাই একজন মানুষের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এর প্রচলন করেছেন। সেই মানুষটি হচ্ছেন নবী বা রসূল। মানুষের মধ্যে এই জীবন বিধানের প্রচলন করতে গিয়ে নবী যা কিছু করেছেন আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী করেছেন এবং যা কিছু বলেছেন আল্লাহর কাছ থেকে পাঠানো বক্তব্য অনুযায়ীই বলেছেন। এই বিধান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নবীর যাবতীয় কৃতিত্ব পুরোপুরি আল্লাহরই অবদান।

আল্লাহ ও তাঁর রসূল এই দুই সত্তাই হচ্ছে ইসলামী বিধানের পেছনে কার্যকরী শক্তি। ইসলামী বিধানের মৌল কাঠামো এই দুই সত্তাই রচনা করেছেন। আর এই দুই সত্তার যেহেতু কোন বিকল্প নেই তাই এই বিধানের মৌল কাঠামো পরিবর্তন করা এবং তার মধ্যে কোন প্রকার কমবেশী করার ক্ষমতা আল্লাহ এবং তার রসূল ছাড়া অন্য কোন মানুষের নেই।

তাই বলে ইসলামী জীবন বিধান কোন স্থবির ও অনড় বিষয়ও নয়। জামানার পরিবর্তনশীল অবস্থায় নিজেকে সচল ও কার্যকর রাখতে হলে এর মধ্যে পরিবর্তন গ্রহণের ক্ষমতা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন নতুন বিধান তৈরী করার ক্ষমতাও তার থাকতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রসূল ইজতিহাদের মাধ্যমে তার এই সচলতা ও সক্রিয়তা বজায় রাখার ব্যবস্থা করেছেন। ইসলামী বিধানের মৌল কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী তাকে কার্যকর করার ব্যবস্থাই হচ্ছে ইজতিহাদ। অর্থাৎ আল্লাহর কুরআন ও রসূলের সুন্নায় ইসলামী জীবন বিধানের যে মূলনীতিগুলো বর্ণিত হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত জীবন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সেগুলোকেই মূলনীতি বলে গ্রহণ করতে হবে এবং সেগুলোর ভিত্তিতেই বিস্তারিত জীবন বিধান রচনা করতে হবে। নবুওয়াত লাভ করার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেইশ বছর মুসলমানদের মধ্যে জীবন যাপন

করেন। তেরো বছর তিনি একটি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যান। এই সময় ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী মুসলিম সমাজকে পরিচালনা করা তাঁর জন্য কোন সমস্যা ছিল না। তাঁর কাছে সরাসরি আল্লাহর ওহী নাযিল হতো এবং তিনি নিজেও যে সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করতেন সেগুলোও করতেন আল্লাহ প্রদত্ত পরোক্ষ ওহী মুতাবিক। তাঁর এইসব সিদ্ধান্তও কার্যক্রম থেকেও ইসলামী বিধানের মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছে। তাঁর ইন্তিকালের পর আল্লাহর ওহী নাযিলের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই ইসলামী বিধানের জন্য মূলনীতি প্রদানের প্রক্রিয়াও সমাপ্ত হয়েছে। তাঁর পর তাঁর সাহাবীগণ যখন ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধার হন, তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত মূলনীতির ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন নতুন আইন প্রণয়নের জন্য ইসলামী মূলনীতি ও মানবিক সমস্যা সম্পর্কে উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন সাহাবীগণের সমন্বয়ে 'মজলিসে শূরা' গঠন করেন। এই শূরার ইজতিহাদ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরামকে এই ইজতিহাদ করার পদ্ধতি শিখিয়ে গেছেন। তাঁর প্রথম সারির সাহাবীদের অন্যতম হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি ইয়ামনে প্রশাসক নিযুক্ত করে পাঠাবার পূর্বে জিজ্ঞেস করেন, সেখানে গিয়ে তুমি লোকদের সমস্যার সমাধান কিভাবে করবে? হযরত মু'আয (রা) জবাবে বলেন : হে আল্লাহর রসূল! কোন সমস্যা দেখা দিলে প্রথমে আল্লাহর কিতাবে তার সমাধান খুঁজবো। সেখানেও সমাধান না পেলে আপনার সুন্নাতে এর সমাধান তালাশ করবো। সেখানেও সমাধান না পেলে নিজের বুদ্ধি ও জ্ঞানের সাহায্যে আমি ইজতিহাদ করবো। হযরত মু'আযের এই জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ইজতিহাদের এই পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে উম্মতের জন্য রহমত ও বরকত এবং এরি মধ্যে নিহিত রয়েছে তার জীবনী শক্তি। কুরআনকে আল্লাহ পরিপূর্ণ জীবন বিধান اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ এবং তাঁর পূর্ণাঙ্গ নিয়ামত ও দানরূপে চিত্রিত করেছেন। কাজেই কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে জীবন সমস্যার সমাধান খুঁজে না পাওয়া আসলে আমাদের জ্ঞান, উপলব্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তিক ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এর মধ্যে সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করতে হবে। আর এই অনুসন্ধানের পদ্ধতি হচ্ছে : কুরআন ও সুন্নাহকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে এবং রসূল ও সাহাবীগণ কিভাবে একে নিজেদের জীবনে কার্যকর করেছেন তা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করতে হবে। এই গভীর

অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে নিজের মধ্যে যে বিশ্লেষণ ক্ষমতার সৃষ্টি হবে যুগ–সমস্যার সমাধানে তাকে ব্যবহার করতে হবে।

সাহাবায়ে কেরাম এভাবে কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতির ভিত্তিতে ইজতিহাদ করেছেন। সাহাবীদের পরও কয়েকশো বছর পর্যন্ত এই ইজতিহাদের সিলসিলা জারী থেকেছে। উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহ এই ক্ষমতা দান করেননি। লাখের বা কোটির মধ্যে হয়তো এক বা একাধিকজন এই ক্ষমতা ও যোগ্যতার অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু রসূলের পর থেকে কয়েকশো বছর পর্যন্ত ইসলাম এভাবেই একটি গতিশীল জীবন বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে সময় লাখো লাখো কোটি কোটি সাধারণ মানুষ, যাদের মধ্যে ইজতিহাদ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা ছিল না তারা তাদের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য মুজতাহিদের রায় গ্রহণ করে নিতেন। আল্লাহ এবং রসূলের নির্দেশ ছাড়া বাকি সমস্ত রায়ের ব্যাপারে দ্বিমত সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ তাঁরা সবাই মানুষ। আল্লাহ এবং রসূলের নির্দেশের ভিত্তিতে তাঁরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন রায় দিয়েছেন। একই বিষয়ে দেখা যাচ্ছে দু'জন সাহাবী দুই মত পোষণ করেছেন। দশজন মুজতাহিদের রায় দশ ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই মত বা রায় বিভক্তি নিয়ে কোন বিরোধ বা কোন্দল দেখা দেয়নি। কারণ তাঁরা কেউ নিজেদের রায়কে চূড়ান্ত সত্য বলে মনে করতেন না, ظن غالب তথা সত্যের কাছাকাছি মনে করতেন। আর তাদের রায় যারা গ্রহণ করতেন তারাও তাকে চূড়ান্ত সত্য বলে গ্রহণ করতেন না বরং তারাও কয়েকটি সত্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সত্য বলেই তাকে গ্রহণ করতেন। তাই অন্য একজন মুজতাহিদের রায় পরবর্তীতে বেশী নির্ভুল বলে মনে হলে তারা আগেরটা বাদ দিয়ে সেটিই মেনে নিতেন। এ ছিল নবুওয়াত ও রিসালাতের যুগের কাছাকাছি অবস্থানকারী লোকদের অবস্থা।

আর নবুওয়াতের চৌদ্দশো বছর পর বিভিন্ন মুসলিম দেশে এবং বিশেষ করে আমাদের দেশে মযহাবী ফিরকাবন্দী যে চেহারায় আত্মপ্রকাশ করেছে তার সাথে সত্যের সম্পর্ক কতটুকু? আমাদের দেশের দক্ষিণ–পূর্বাঞ্চলে সাবেক চট্টগ্রাম জিলার কয়েকটি এলাকায় প্রায়ই এই মযহাবী দাংগার খবর পাওয়া যায়। সম্প্রতি উত্তরাঞ্চলে সিরাজগঞ্জের গ্রামেও এমনি ঘটনা ঘটেছে। সেখানে দু'টি মযহাবী গ্রুপের ঝগড়ায় দশজন আহত হয়েছে। একদল আরেক দলের লোকদের গ্রাম ঘেরাও করে রেখেছিল দু'দিন ধরে। পুলিশ গিয়ে তবে তাদের উদ্ধার করে।

মযহাবী ফিরকাবন্দীর এই চেহারা মোটেই ইসলামের অভিপ্রেত নয়। এটা মূর্খতা ও অজ্ঞতার চেহারা। ইসলামের এই চেহারা নির্মাণে তথাকথিত এক জাতীয় আলেমদেরই অবদান বেশী। জিহালত বা অজ্ঞতা ও স্বার্থবাদিতা তাদের ইলমকে ঢেকে ফেলেছে। দেশে যথার্থ ইল্‌মের চর্চা যত বাড়বে এবং কুরআন, হাদীস ও ইসলামের মৌল জ্ঞানের দিকে মুসলমানদের দৃষ্টি যত বেশী আকৃষ্ট হবে ততই এ অজ্ঞতার আঁধার দূর হতে থাকবে।

ইসলামী ফিক্হ একাডেমী যুগের একটি প্রয়োজন

চৌদ্দশো বছর পর আজো মুসলমানরা একটি বিশ্বজনীন মিল্লাত হিসেবে টিকে আছে। ইসলামী পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টাও চলছে কম বেশী সব মুসলিম দেশে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকেও ইসলামী কাঠামোয় দাঁড় করাবার চেষ্টা চলছে অনেক দেশে। এ জন্য ইসলামী আইনের পুনরগঠন ও সংস্কার প্রয়োজন। ইসলামী আইনের এই সংস্কার ও পুনরগঠনের কাজ চলেছে রসূলের পর সাহাবীদের জামানা থেকেই। এই সংস্কার ও পুনরগঠনকে ফিক্‌হ্‌র পরিভাষায় বলা হয় ইজতিহাদ। মূলত ইজতিহাদই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র ও আইন ব্যবস্থার মৌল প্রাণশক্তি।

মোটামুটি হিজরী তৃতীয় শতক পর্যন্ত ইজতিহাদ পূর্ণ শক্তিতে সক্রিয় ছিল। ফলে তখন ইসলামী আইনের বিকাশ ঘটেছে ব্যাপকভাবে। বিশেষ করে তাতার আক্রমণের পর এই ধারার ওপর প্রচণ্ড আঘাত এসেছে। তাতারীরা ইসলামী জ্ঞান–বিজ্ঞান সমৃদ্ধ ইসলামী বিশ্বের একটি বিরাট এলাকা বিধ্বস্ত করে। ফলে একদিকে যেমন ইসলামী জ্ঞানের বিকাশের ধারা হঠাৎ অনেকটা স্তব্ধ হয়ে যায় তেমনি অন্যদিকে দেখা দেয় প্রতিভাধর ইলমী ব্যক্তিত্বের অভাব। এটা ছিল অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতি। এর পরও ইজতিহাদের ধারা পুরোপুরি ব্যাহত হয়নি। ভারতবর্ষে মোগল শাসনের শেষের দিকে ঈসায়ী সপ্তদশ অষ্টাদশ শতক পর্যন্তও ইসলামী আইনের কোন কোন দিকে আংশিক ইজতিহাদ চলেছে। বিগত দু'শো আড়াইশো বছর থেকে এই ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে। এই সংগে বিজাতীয় আইনও মুসলমানদের ওপর চেপে বসেছে। অনেক দেশে মুসলিম পার্সোনাল'ল নামে বিয়ে, তালাক ও মীরাস সংক্রান্ত কিছু কিছু আইন জারি আছে। তাও বিজাতীয় আইনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোন কোন মুসলিম দেশের শাসক গোষ্ঠি এই আইনের মধ্যে এমন সব পরিবর্তন এনেছেন যা কুরআন ও সুন্নার মূলনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ ধরনের সংস্কার সরকার চাপিয়ে দিয়েছেন কিন্তু মুসলিম জনগণ মনে প্রাণে তা মেনে নিতে পারছে না।

আসলে মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যেখানে কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে একদিকে যেমন তাদের পুরাতন আইন ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন তেমনি অন্যদিকে নতুন সমস্যার প্রেক্ষিতে নতুন আইন

প্রণয়নেরও প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই প্রয়োজনগুলো সামনে রেখেই ১৯৮১ সালের জানুয়ারী মাসে তায়েফে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে 'মাজমাউল ফিক্হ আল ইসলামী' বা ইসলামী ফিক্হ একাডেমী কায়েমের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৮১ সালের এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৩ সালের জুন মাসে এই একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই একাডেমী প্রতিষ্ঠার ফলে ইসলামী চিন্তাধারার মধ্যে ঐক্য ও একাত্মতা সৃষ্টি হবে। বিভিন্ন মুসলিম দেশ বিভিন্নভাবে নিজেদের প্রয়োজন মতো ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সংস্কার সাধন ও নতুন আইন প্রণয়ন করার চেষ্টা করছে তার মধ্যে একাত্মতা সৃষ্টি হবে। ইসলামী ফিক্হ একাডেমী সবগুলোকে এক সূত্রে গ্রথিত করার ক্ষেত্রে একটি সহায়ক শক্তির কাজ করবে। বর্তমানে বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশে সরকারী পৃষ্ঠপোশকতায় ফিক্হ ও ইফ্তার (ফতওয়া) ময়দানে কাজ চলছে। যেমন মিসরে "মাজমাউল বুহুস আল ইসলামীয়া" ও "মজলিসুল আলা আশ্শুয়ুনিল ইসলামিয়া"–এর পরিচালনাধীনে লাজনাতুল হুকুক (আইন কমিশন) কাজ করছে। সউদী আরবে কাজ করছে "মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী" রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর পরিচালনাধীনে। পাকিস্তানে মজলিসুল ফিকরিল ইসলামী (ইসলামী চিন্তা পরিষদ) এবং জর্দান, সিরিয়া, মরক্কো ও লেবাননে দারুল ইফতা কাজ করছে। বর্তমানে সমস্ত মুসলিম দেশের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত "ইসলামী ফিক্হ একাডেমী" সমস্ত মুসলিম দেশের বড় বড় ফকীহ ও ইসলামী আইন বিশারদদের সমন্বয়ে গঠিত হবার কারণে যে আইন প্রণয়ন করবে স্বাভাবিকভাবে তাতে সমগ্র ইসলামী বিশ্বের সম্মিলিত রায়ের প্রতিফলন হবে। আর এ যুগে যখন ইজতিহাদের পক্ষে আওয়াজ বুলন্দ হয়েছে তখন ব্যক্তিগত ইজতিহাদের পরিবর্তে সম্মিলিত ইজতিহাদের ওপরই জোর দেয়া হয়েছে বেশী। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামী চিন্তা এমন সংকটজনক পর্যায় অতিক্রম করছে যার ফলে ব্যক্তিগত ইজতিহাদের তুলনায় সম্মিলিত ইজতিহাদের মধ্যে কম রিস্‌ক বলে মনে হচ্ছে। এভাবে শরয়ী আইনের তৃতীয় উৎস 'ইজমা'কে এক্ষেত্রে কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। শরীয়তের কোনো প্রসংগে যুগের ফকীহদের ইজমা বা সর্বসম্মিলিত রায় সেই প্রসংগটি মেনে নেয়া সবার জন্য ওয়াজিব গণ্য করে। যতক্ষণ অন্য একটি ইজমা এসে একে 'মনসূখ' না করে দেবে ততক্ষণ এর কার্যকারিতা বহাল থাকবে।

ইসলামী ফিক্হ একাডেমীর কাজ শুরু হয়ে গেছে। এর কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে জেদ্দায়। চলতি নভেম্বর মাসে এর পরবর্তী বৈঠক শুরু হতে যাচ্ছে। এ

বৈঠকে একাডেমী তার ভবিষ্যত কর্মসূচী ও কর্মনীতি গ্রহণ করবে। একাডেমী যদি যথার্থ কাজ করার সুযোগ পায় তাহলে উম্মতে মুসলিমার জন্য তা আল্লাহর একটি বৃহত্তম নিয়ামতে পরিণত হবে। তবে আমাদের মতে কয়েকটি বিষয়ে তাকে আন্তরিকতার সাথে পদক্ষেপ নিতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

এক ঃ আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাতের ভিত্তিতে যে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

দুই ঃ কোন একটি বিশেষ ফিক্হর ওপর ফতোয়ার ভিত্তি না রেখে যে ফিক্হর উসূল ও দলীল–প্রমাণ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রসূলের অধিকতর নিকটবর্তী হবে এবং আধুনিক যুগের দাবী পূরণ করার ক্ষমতা যার মধ্যে বেশী থাকবে তাকেই গ্রহণ করতে হবে।

তিন ঃ ইবাদত সম্পর্কিত মাসায়েলের মধ্যে নতুন করে ইজতিহাদ করার চেষ্টা না করে সমস্ত প্রচেষ্টা মু'আমিলাত সম্পর্কিত মাসায়েল যেমন ব্যবসায় বাণিজ্য, আধুনিক অর্থনৈতিক বিষয়াবলী, শিল্প–কারখানা, কৃষি, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

চার ঃ আধুনিক টেকনোলজির কারণে যেসব নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে যেমন একজনের অংগ আরেক জনের শরীরে স্থাপন করা, টেস্ট টিউব বেবীর বৈধতা ও তার বৈধ বংশ নির্ণয় এবং মীরাসের সমস্যা, চিত্র নির্মাণ, সিনেমা ইত্যাদি বিষয়ে শরীয়াত সম্মত রায় দিতে হবে।

পাঁচ ঃ 'ফিক্হ একাডেমীর সমস্ত কার্যক্রমকে অবশ্যই রাজনৈতিক বিরোধের উর্ধে রাখতে হবে। এ ধরনের আন্তরজাতিক প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলাদলির অনুপ্রবেশ ঘটলে তা কেবল তার ধ্বংসকেই ত্বরান্বিত করবে।

মোটকথা ইসলামী ফিক্হ একাডেমী যে বর্তমান যুগে উম্মতে মুসলিমার জন্য একটি নিয়ামত তা একাডেমীর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে।

মুসলিম খৃস্টান সম্পর্ক কোন্ পথে?

ক্রুসেড যুদ্ধের পরে ইউরোপের খৃস্টান সমাজের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষের পাহাড় জমে ওঠে। এর প্রমাণ বিগত কয়েকশো বছরে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেখা তাদের অসংখ্য বইপত্র। এইসব বইপত্রের মাধ্যমে ইউরোপীয় জনসমাজের সামনে তারা ইসলামের চরম বিকৃতি সাধন করেছে। ইসলামের বিরুদ্ধে তারা বিভিন্ন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করেছে। ইসলামের মূল বক্তব্য ও চেহারাকে বিকৃত করেছে। শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ এনে তারা বিশ্বব্যাপী খৃস্টান–মুসলিম সম্পর্কের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু গত কয়েক বছর থেকে তাদের এই প্রচারণায় ভাটা পড়েছে। তারা ইসলামকে বুঝার চেষ্টা করছে এবং ইসলামের প্রতি তাদের আকর্ষণ বেড়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

চলতি শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই অবস্থার এই পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশেষ করে কয়েক বছর আগে ভ্যাটিকানের পোপ যখন মরক্কোর শাসক দ্বিতীয় হাসানের আমন্ত্রণক্রমে মরক্কো সফর করেন তখন খৃস্টান–মুসলিম সম্পর্ক একটি নতুন সমঝোতা ও সম্প্রীতির পরিবেশে প্রবেশ করে। ১৯৮০ সালে বাদশাহ হাসান আল কুদস লিবারেশান কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালনকালে ভ্যাটিকান সফর করেন। এর জবাবে ভ্যাটিকানের পোপের এই মরক্কো সফর।

পোপের এই সফর উভয় জাতির ভুল বুঝাবুঝি দূর করার ব্যাপারে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করে। ফ্রান্সের সংবাদ পত্রগুলো পোপের এই মরক্কো সফরের খবর যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে এবং এর ওপর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করে। পোপের এই ঐতিহাসিক সফরকালে মরক্কোর ৮০ হাজার লোক তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য পথে বের হয়ে পড়ে। পোপও মরক্কোয় প্রবেশ করে প্রথমে সিজদানত হয়ে ভূমিচুম্বন করেন তারপর আসসালামু আলাইকুম বাক্যের মাধ্যমে নিজের বক্তব্য শুরু করেন। বক্তৃতার মাঝখানে তিনি বলেন, আজ মুসলিম–খৃস্টান সংলাপ হচ্ছে সময়ের সবচাইতে বড় প্রয়োজন।

কোন খৃস্টীয় পোপের এটিই ছিল মুসলিম দেশে প্রথম সফর। খৃস্ট–মুসলিম সমঝোতার জন্য ইতিপূর্বেও ভ্যাটিকানে কিছু প্রচেষ্টা চলে। চলতি শতকের ষাটের দশকের শেষের দিকে এ উদ্দেশ্যে ভ্যাটিকানে "নিউ ক্রিশ্চিয়ান সেক্রেটারীয়েট" নামে একটি সেক্রেটারিয়েট কায়েম করা হয়। এই সেক্রেটারিয়েট থেকে ফরাসী ভাষায় একটি বই প্রকাশ করা হয়। তার নাম "খৃস্টান–মুসলিম সংলাপ সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ।" এর তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হয় ১৯৭০ সালে। এই বইতে খৃস্ট–মুসলিম সংলাপের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামের মৌল আকীদা–বিশ্বাসের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তার জবাবও এখানে দেয়া হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও ইনজীলের আলোচনা করা হয়েছে। এভাবে খৃস্ট জগতকে জানানো হয়েছে যে, মুসলমানরা আসলে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে একজন মহান পয়গাম্বর ও তাঁর মা মরিয়মকে সতী সাধ্বী নারী হিসেবে মানে।

ইতিপূর্বে চার্চ ও ইউরোপীয় খৃস্ট সম্প্রদায় ইসলাম সম্পর্কে যেসব মিথ্যা প্রচারণা চালিয়েছে তার ভুল স্বীকার করে নেবার জন্য এ বইতে আবেদন জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এইসব প্রপাগাণ্ডার কারণে সমগ্র ইসলামী দুনিয়া খৃস্টানদের প্রতি বিরূপ এবং তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। কাজেই সর্বপ্রথম ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে খৃস্টীয় জগতের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে।

এই বইটি প্রকাশের পর ১৯৭৪ সালে পোপ ভ্যাটিকান সফরের জন্য সউদী আরব সরকারকে মুসলিম আলেমদের একটি প্রতিনিধিদল পাঠাবার আমন্ত্রণ জানান। সে সময় বাদশাহ ফয়সল পোপের এ দাওয়াত গ্রহণ করেন। তিনি সরকারের পক্ষ থেকে সুযোগ্য আলেমদের একটি প্রতিনিধিদল ভ্যাটিকানে পাঠান। সেখানে এই প্রতিনিধি দলকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করা হয়। ইসলাম ও খৃস্টবাদের ওপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল সংখ্যক পাদ্রীর সমন্বয়ে গঠিত ভ্যাটিকানের প্রতিনিধিদল ও মুসলিম আলেমদের প্রতিনিধি দলের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় হয়।

মুসলিম প্রতিনিধি দলের প্রতি পোপের আন্তরিক ব্যবহারের প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, পোপ মুসলিম প্রতিনিধি দলকে জুমার নামায সানপোলের গির্জায় পড়ার জন্য আহবান জানান। কিন্তু প্রতিনিধি দল এ ব্যাপারে নিজেদের

অক্ষমতা প্রকাশ করে। কারণ ইতিপূর্বে রোমের ইসলামিক সেন্টার থেকে তাদেরকে আহবান জানানো হয়েছিল জুমার নামায সেখানে পড়ার জন্য এবং তারা সে আহবান গ্রহণ করেও নিয়েছিল।

এ সেমিনার পাঁচদিন পর্যন্ত চলে। সেমিনারের এক আলোচনায় সউদী প্রতিনিধি দলের সদস্য ডক্টর মারুফ দাওয়ালবী পোপ কার্নিভালের নিকট প্রতিবাদ জানান যে, ফ্রান্সের 'চার্চ' আলজিরিয়া থেকে হিজরতকারী মুসলমানদেরকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য ব্যাপক অভিযান চালাচ্ছে এবং বহু সংখ্যক মুসলমানকে তারা খৃষ্টান বানিয়ে নিয়েছে। প্যারিসের শহরতলিতে তাদের জন্য তিনটি চার্চও নির্মাণ করা হয়েছে। তাঁর এই বক্তৃতার ত্বরিত ফল দেখা দেয়। সেমিনার শেষে প্রতিনিধি দলকে বিদায় দেবার সময় পোপ বিমান বন্দরে যে ভাষণ দেন তাতে বলেনঃ

"আমরা সেই রাতেই ফায়সালা করেছিলাম মুসলিম দুনিয়ায় ক্যাথলিক ধর্মের প্রচার বন্ধ করে দেবো। আমরা আশা করি, আপনারা একদিন আসবেন এবং আমাদের কাছে সুসংবাদ পেশ করবেন।"

অতপর পোপের নির্দেশে প্যারিসের শহরতলির সেই চার্চ তিনটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয় এবং সেগুলো মুসলমানদের হাতে সোপর্দ করা হয়। তারপর থেকে এই মসজিদ তিনটি মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে চলে আসছে।

এই মুসলিম-খৃষ্টান সংলাপের ফলে আশা করা গিয়েছিল যে, অন্ততপক্ষে এশিয়ায় ও আফ্রিকায় খৃষ্টবাদের প্রচারে ভাটা পড়বে এবং বিভিন্ন খৃষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় মুসলমানদের মধ্যে তাদের প্রচার সীমিত করে দেবেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

আল–কুরআন সমগ্র মানব জাতির জন্য যে দাওয়াত পেশ করেছে তাতে ইসলামকেই আল্লাহর একমাত্র দীন, ধর্ম ও জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনয়ন দানের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। ইসলাম ছাড়া দুনিয়ার অন্য সমস্ত ধর্মকে মিথ্যা, বানোয়াট ও বিকৃত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এ সত্বেও ইসলাম তার অভ্যুদয়ের প্রথম দিন থেকেই দুনিয়ার সকল ধর্মের প্রতি সহনশীল মনোভাব পোষণ করে এসেছে। কুরআনের বক্তব্য মতে সমগ্র মানবজাতি এক আদমের সন্তান। আবার কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ – (البقره : ٢٨٥)

"নবীদের মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করি না।"

এটা সকল ধর্মের প্রতি মর্যাদাবোধের প্রমাণ। হাদীসে অন্য ধর্মের দেবদেবীকে গালিগালাজ করতে এবং তাদের ধর্মস্থানগুলোর ক্ষতি করতে নিষেধ করা হয়েছে। এর চাইতে সহনশীল ধর্মীয় বোধ আর কী হতে পারে?

এ জন্য ইসলাম দুনিয়ার সমগ্র মানব জাতির কাছে নিজের দাওয়াত পেশ করলেও এবং ইসলাম ছাড়া অন্য সমস্ত ধর্মের মৌলিক গলদগুলো দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরলেও বাতিল ধর্মগুলো বা তাদের আরাধ্য দেবতাদের সম্পর্কে কখনো অশালীন উক্তি করেনি।

প্রত্যাদিষ্ট ধর্মগুলোর মধ্য থেকে ইহুদী ও খৃস্ট ধর্মের সাথে ইসলামের মোকাবিলা হয় প্রথম দিন থেকে। কিন্তু মুসলমানরা কোনদিন ইহুদী ও খৃস্টানদের সাথে অমর্যাদাকর আচরণ করেনি। বিশাল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিরাট অংশে মুসলমানরা নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু তারা খৃস্টানদের বলপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করিয়েছে এমন কোন দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতা খুললে চোখে পড়বে না। বরং কোন কোন প্রদেশের মুসলিম গভর্নর অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণকারী নও মুসলিমদের ওপর একটা বিশেষ ধরনের ট্যাক্স লাগাতেন। উমাইয়া খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসনামলে এই ধরনের সকল ট্যাক্স রহিত করা হয়। এমনকি যে জেরুসালেমের স্বত্বাধিকার

নিয়ে মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে শত শত বছর ধরে রক্তক্ষয়ী ক্রুসেড যুদ্ধ চলে। সেই যুদ্ধে এক সময় মুসলমানরা জেরুসালেম নগরী অধিকার করলে নগরীর সমস্ত খৃষ্টান বাসিন্দাকে নিজেদের যাবতীয় ধন-সম্পদ নিয়ে নিশ্চিন্তে নগরী ত্যাগ করার অনুমতি দান করে। একজন নগরবাসীকেও হত্যা বা জুলুমের সহজ শিকারে পরিণত করা হয়নি। অন্যদিকে খৃষ্টানরা যখন নগরী পুনরুদ্ধার করে তখন নগরীতে প্রবেশ করেই ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ শুরু করে। মুসলমানদের রক্ত জেরুসালেমের রাজপথে স্রোতের মতো প্রবাহিত হয়।

অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে ইসলাম এর পুংখানুপুংখ বিধান দিয়েছে। সেই বিধান মতে তাদের সাথে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অন্যান্য ধর্মে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে ব্যবহারের ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। ফলে তারা নিজেদের স্বার্থানুকূলে ইচ্ছেমত ব্যবহার করে থাকে। আর সোজা কথায় বলা যায় যুদ্ধের পরিবেশে আক্রোশ ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করাই তাদের মূল লক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলাম তার আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকেই খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের সাথে যুক্তিপূর্ণ, ন্যায়ানুগ ও মানবিক ব্যবহার করে এসেছে। কিন্তু এর মোকাবিলায় খৃষ্টজগত মুসলমানদের সাথে কখনো মানবিক ও ন্যায়ানুগ ব্যবহার করেনি। তারা কখনো সঠিকভাবে ইসলামকে বুঝার চেষ্টা করেনি। ফলে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে তারা সব সময়ই ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খৃষ্টীয় শাসক সমাজের চাইতে পাদ্রী ও যাজক সমাজই ছিলেন মুসলমানদের প্রতি বেশী বিরুদ্ধভাবাপন্ন। খৃষ্টজগত যাতে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও নির্ভুল ধারণা লাভ করতে না পারে এজন্য তারা যতদূর সম্ভব বিকৃত চেহারায় ইসলাম ও মুসলমানদেরকে খৃষ্টানদের সামনে পেশ করেছে। এরপর গত চার পাঁচশ বছর থেকে মুসলমানদের ব্যাপক পতনের সুযোগ নিয়ে মুসলিম দেশগুলোয় তারা মিশনারী সংগঠনের জাল ছড়িয়ে দিয়ে এবং বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার ছদ্মাবরণে মুসলমানদের ব্যাপকভাবে খৃষ্টান বানাবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

চলতি শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে খৃষ্টান জগতে একটা বাস্তব উপলব্ধি আসে। ইসলামী পুনরজাগরণ আন্দোলনগুলো তাদেরকে বাস্তববাদী হতে বাধ্য করে। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের প্রপাগাণ্ডায় ভাটা পড়ে। ইতিমধ্যে ধর্মই খৃষ্টজগতে একটি অহেতুক বিষয়ে পরিণত হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের গির্জাগুলোয় ঘুঘু চরতে দেখা যায়। এদিকে ইসলামী বিশ্বের মসজিদগুলোয় নামাযীদের ঢল নেমে আসে। এ অবস্থা খৃষ্টান পাদরী ও যাজক

সম্প্রদায়কে মুসলমান ও ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের কার্যক্রম পুনরবিবেচনা করতে বাধ্য করে। যে খৃষ্ট জগতে পাদরী ও যাজক সমাজ ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু সেই খৃষ্টজগতে এই পাদরী ও যাজক সমাজকেই ইসলামের ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় পলিসি গ্রহণ করতে দেখা যায়। এ সম্পর্কে বিগত ৬ ডিসেম্বরের নিবন্ধে আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি।

কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, বিশ্ব খৃষ্ট ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ আসলে তাদের চিরাচরিত নীতি থেকে একটুও সরে আসেননি। গত কয়েক'শো বছর থেকে মুসলিম বিশ্বে তারা খৃষ্টবাদ প্রচারের জন্য যে অন্যায় ও দুরভিসন্ধিমূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন তার একচুলও নড়চড় হয়নি। শুধুমাত্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি মুসলিম দেশে তাদের গত এক দশকের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলেই একথা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এ দেশগুলোর মুসলমানরা দারিদ্র ও অশিক্ষা–এ দুটো অভিশাপের শিকার। আর এ দুটো ছিদ্র পথেই মুসলমানদের মধ্যে খৃষ্টীয় প্রচারণা চালানো হচ্ছে। মুসলমানদের সামনে খৃষ্টধর্মের যথার্থ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে নয় বরং তাদের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে একদিকে ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যার জাল বুনে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে এবং অন্যদিকে আর্থিক অভাব–অনটনের সুযোগ নিয়ে অর্থনৈতিক সাহায্য–সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে খৃষ্টধর্মের দিকে টেনে আনার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত চালানো হচ্ছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ছড়িয়ে আছে ১৩ হাজার ৫শ' দ্বীপের বিশাল এলাকা নিয়ে ইন্দোনেশিয়া। এর মধ্যে প্রায় এক হাজার দ্বীপে রয়েছে জনবসতি। এই জনবসতির প্রায় শতকরা ৯০ ভাগই মুসলমান। ১২ কোটি মুসলিম জন অধ্যুষিত এদেশটিকে সম্পূর্ণরূপে খৃষ্টবাদে দীক্ষিত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন চার্চ সম্প্রদায় ও ব্যাপ্টিস্ট মিশনের পক্ষ থেকে। এদের এই পরিকল্পনাগুলো যে কত ঠাণ্ডা মাথায় গ্রহণ করা হয়েছে তা এদের একটি সংস্থার রিপোর্ট দেখলেই বুঝা যাবে। ১৯৭৯ সালে ফ্রাইস মরণটিকা জাভা দ্বীপে আন্তঃ খৃষ্টধর্ম যাজক সম্প্রদায়ের একটি শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। শিক্ষা কেন্দ্রে ঘোষণা করা হয় যে, 'মরণটিকা' ২০০০ সাল শেষ হবার আগেই সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় ১০০০টি চার্চ গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছেন। শুভ সূচনা হিসেবে শিক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র ও কর্মচারীদের উদ্যোগে ১৯৭৯ সালের শেষ নাগাদ ২৭টি চার্চ স্থাপন করা হয়েছে বলে দাবী করা হয়। ২০১৫ সালের মধ্যে তারা ইন্দোনেশিয়ার প্রতি গ্রামে একটি করে চার্চ নির্মাণ

করতে সক্ষম হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তবে মরণটিকার শিক্ষাকেন্দ্রের রিপোর্টে বলা হয়, আমরা সবাই মিলে যদি এ কাজটি করি তাহলে এটা মোটেই অসম্ভব বিবেচিত হবে না। সবাই মিলে বলতে তারা বুঝিয়েছেন সমস্ত প্রটেস্টান্ট চার্চ, খৃষ্টীয় ধর্ম সম্প্রদায় ও আধা চার্চ সংগঠনগুলোর সমন্বিত শক্তিকে। তবে সম্ভবত এর মাধ্যমে পশ্চিমী দুনিয়ার বিশেষ করে আমেরিকান মিশনারী এজেন্সি ও চার্চগুলোর দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

খৃস্টান–মুসলিম সম্পর্কের ওপর ইংলণ্ডের লেস্টার থেকে প্রকাশিত "ফোকাস"–এর গত নবেম্বর সংখ্যার এক রিপোর্ট অনুযায়ী "মরণটিকা" হচ্ছে আমেরিকান যাজক সম্প্রদায়ের শিক্ষা কেন্দ্রগুলোরই একটি ফসল। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার ব্যাপ্টিস্ট মিশনগুলো সম্পর্কে তিনি শিক্ষালাভ করেন। মরণটিকা বলেন, সমগ্র ইন্দোনেশিয়াকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করাই হচ্ছে আমার স্বপ্ন।

ইন্দোনেশিয়ায় বর্তমানে খৃস্টধর্মের প্রভাব সম্পর্কে কেবল এতটুকু জানাই যথেষ্ট হবে যে, শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশে ক্যাথলিকদের পৃষ্ঠপোশকতায় যে দৈনিকটি বের হয় সেটি বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার সবচেয়ে বড় পত্রিকা। পত্রিকাটির বর্তমান প্রচার সংখ্যা ৫ লাখ।

শুধু ইন্দোনেশিয়ায় নয় দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে খৃস্টান বানাবার জন্য এমনিতর কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপপুঞ্জের মুসলিম এলাকায়ও মিশনারীরা এভাবে অসংখ্য চার্চ নির্মাণ করেছেন এবং দরিদ্র ও অভাবী মুসলমানদের খৃস্টান বানিয়ে চলছেন।

গত বছর আগস্ট মাসে তুরস্কের হাক্কারীর কাছে একটি পাহাড়ের গুহায় ১৯০০ বছর আগের ইনজীলের একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। সেকালে ব্যবহৃত পাপাইরাস কাগজের গায়ে লেখা এ পাণ্ডুলিপিটির ওজন পঞ্চাশ কেজি। আরামাই সুরইয়ানী ভাষায় লিখিত এই ইনজীলটিকে বারনাবাসের ইনজীল মনে করা হচ্ছে। পাণ্ডুলিপিটির পাঠোদ্ধারের কাজ চলছে জোরেশোরে। তুরস্কের সীমান্ত দিয়ে এটাকে সিরিয়ায় বা ইসরাঈলে পাচার করার চেষ্টা চলছিল। কিন্তু সীমান্ত রক্ষীরা পাচারকারীদের এ প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়।

ইনজীল মূলত পাঁচজনের লিখিত। তারা হচ্ছেন বারনাবাস, মথি, মারকাস, লূক ও ইউহেনা। এদের মধ্যে শেষোক্ত চারজনের লিখিত ইনজীলই খৃষ্টজগতে প্রচলিত। প্রথম জন অর্থাৎ বারনাবাসের ইনজীলকে খৃষ্টজগত পরবর্তীকালে অনভিপ্রেত ঘোষণা করে তার পাঠ ও প্রচারণা নিষিদ্ধ করে দেয়। অথচ এই পাঁচ জনের মধ্যে একমাত্র বারনাবাসই হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সরাসরি সাহাবী। তিনি নিজের ইনজীলে এ কথা দাবীও করেছেন। কিন্তু অন্য চারজন হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের সাহাবী ছিলেন না। তারা নিজেদের ইনজীলে একথা দাবীও করেননি। তারা চারজন ছিলেন গ্রীকভাষী। হযরত ঈসার ইন্তিকালের পর তারা ঈসায়ী ধর্মে দীক্ষিত হন। হযরত ঈসার বাণী ও কর্মের বিস্তারিত বিবরণ তারা সুরইয়ানী ভাষী ফিলিস্তিনী ঈসায়ীদের মাধ্যমে লিখিত আকারে নয়, মৌখিক ভাষ্যের সাহায্যে লাভ করেন। সেই সুরইয়ানী বিবরণগুলোকে তারা নিজেদের গ্রীক ভাষায় তরজমা করে নেন। এই চারজনের মধ্যে সবার ইনজীলই সত্তর ঈসায়ীর পরে অর্থাৎ হযরত ঈসার ইন্তিকালের দীর্ঘকাল পরে লিখিত হয়। আর ইউহেনার ইনজীল তো হযরত ঈসার ইন্তিকালের প্রায় এক'শো বছর পর সম্ভবত এশিয়া মাইনরের ইফুস শহরে লেখা হয়। যেসব সূত্র ও মাধ্যম থেকে এই চারটি ইনজীলের তথ্য বিবরণী সংগৃহীত হয়েছে সেগুলোর কোন উল্লেখও কোথাও করা হয়নি। এ থেকে এ কথা অনুমান করার কোন উপায়ই নেই যে, হযরত ঈসার কোন সাহাবীর কাছ থেকে তারা এ বিবরণগুলো প্রত্যক্ষভাবে শুনেছিলেন, না তাদের মাঝখানে আরো কোন মাধ্যম ছিল? এক মুখ থেকে

আর এক মুখে বিবৃত হয়ে লিখিত আকারে আসার আগে এগুলোর মধ্যে কি পরিমাণ বিকৃতি সাধিত হয়েছিল, তা জানারও কোন উপায় নেই। বিশেষ করে স্বেচ্ছায় নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ইনজীলের মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার রেওয়াজ ঈসায়ী ধর্ম নেতাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এটাকে তারা বৈধ মনে করতেন। এ অবস্থায় এ চারটি ইনজীলের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এর মোকাবিলায় বারনাবাস হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রথম বারোজন সাহাবীদের অন্তরভুক্ত ছিলেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি হযরত ঈসার সংগে ছিলেন। তিনি নিজের চোখে দেখা ঘটনাবলী এবং নিজের কানে শোনা বক্তব্য ও মন্তব্যসমূহ নিজের ইনজীলে লিপিবদ্ধ করেন। একথা তিনি নিজের ইনজীলেই উল্লেখ করেছেন। শুধু এই নয়, তিনি নিজের ইনজীলে একথাও লিখেছেন যে, দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বক্ষণে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর সম্পর্কে যে সব বিভ্রান্তি লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সেগুলো দূর করার দায়িত্বও তাঁর ওপর অর্পণ করে যান।

এই পাঁচটি ইনজীল পাশাপাশি রেখে পাঠ করার পর একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি একথা অবশ্যই অনুভব করবেন যে, অন্য চারজনের তুলনায় বারনাবাসের ইনজীলে ঘটনাবলী বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি যিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকেন এবং যিনি নিজের চোখে সব কিছু দেখেছেন, তার বক্তব্যের মধ্যে যে খুটিনাটি বিষয়েরও উল্লেখ আছে এবং ধারা বর্ণনার মধ্যে যে প্রাণের পরশ পাওয়া যায় বারনাবাসে তা অন্য চারটির তুলনায় পুরোপুরি উপস্থিত। বরং অন্য চারটির মধ্যে ঘটনাবলীর অসংলগ্নতা এবং বর্ণনাবলীর দুর্বোধ্যতা একটি বিরাট সমস্যা। পরবর্তীকালের ভাষ্যকারগণ এগুলোর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেছেন। এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা গোঁজামিলের আশ্রয় নিয়েছেন।

কিন্তু এর তুলনায় বারনাবাসের ইনজীলে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বাণী ও শিক্ষাগুলো বিস্তারিতভাবে ও যুক্তিপূর্ণ ভাষায় সুশৃংখল পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে। এখানে জোরেশোরে শিরকের প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করা হয়েছে, তওহীদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহর গুণাবলী, ইবাদাতের মৌল প্রাণসত্তা ও নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ কিতাবটি পাঠ করার পর হযরত ঈসার জীবন ও তাঁর শিক্ষাবলী যথার্থই আল্লাহর একজন নবীর উপযোগী বলে মনে হবে। এ কিতাবে তিনি নিজেকে একজন নবী হিসেবে পেশ করেছেন। আগের সমস্ত নবীদের সত্যতার সাক্ষ

দিয়েছেন এবং পরিস্কারভাবে একথা উল্লেখ করেছেন যে, নবীর শিক্ষা ছাড়া সত্যের সন্ধানলাভের আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। এ কিতাবে তিনি তওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের সেই একই আকীদা পেশ করেছেন, যা অন্য নবীগণ পেশ করে গেছেন। এখানে তিনি নামায, রোযা ও যাকাত দানের বিধান দিয়েছেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম প্রচারিত দীন যে নবীদের দীন ছিল এ কিতাবটি পড়লে তা একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সেন্ট পলের ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণের পর থেকেই এই কিতাবের বিরোধিতা শুরু। সেন্টপল ছিলেন একজন অফিলিস্তিনী ইহুদী। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় তিনি তাঁর বিরোধী ছিলেন। হযরত ঈসার ইন্তিকালের পর ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি রোমান, গ্রীক এবং অন্যান্য অইসরাইলী অইহুদীদের মধ্যেও হযরত ঈসার দ্বীনের প্রচার শুরু করেন, যা ছিল হযরত ঈসার নির্দেশের সম্পূর্ণ বিরোধী। অইসরাইলী ও অইহুদী জনতার গ্রহণোপযোগী করার জন্য তিনি এই দীনের সংস্কার সাধন করেন, এর মধ্যে নতুন নতুন আকীদা-বিশ্বাস ও বিধান সংযোজন করেন, যা হযরত ঈসার আকীদা ও বিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। হযরত ঈসার আল্লাহর পুত্র হবার ধারণা এবং ক্রুশবিদ্ধ হয়ে তিনি সমস্ত ঈসায়ীদের গুনাহর কাফফারা দিয়ে গেছেন-এ আকীদা তিনিই তৈরী করেন। সাধারণ মুশরিকদের মানসিকতার সাথে এ ধরনের আকীদার সামঞ্জস্য ছিল বেশী। কাজেই তাঁর এ আকীদা জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়ে যায় এবং ঈসায়ী ধর্ম বিস্তার লাভ করতে থাকে। হযরত ঈসার প্রথম যুগের অনুসারীরা এই বিদআতের বিরোধিতা করতে থাকেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অইসরাইলী ও অইহুদীদের থেকে এমন বিপুল সংখ্যক লোক ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করে যাদের কারণে হযরত ঈসার আসল শিক্ষা তলিয়ে যেতে থাকে। চতুর্থ শতকের শুরুতে ৩২৫ খৃষ্টাব্দে নিকিয়া কাউন্সিলে সেন্ট পলের ধর্মকে ঈসায়ী ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। রোমান সম্রাটের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর এই স্বীকৃতি চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

বারনাবাসের ইনজীল এই পোলীয় ঈসায়ী ধর্মের সম্পূর্ণ উল্টো রূপ তুলে ধরেছে। তাই ঈসায়ী চতুর্থ শতকের পর এই ইনজীলের ওপর নেমে আসে রাজরোষ। পোলীয় প্রভাবে ঈসায়ী গির্জা এই ইনজীলকে বেআইনী ও মিথ্যা ঘোষণা করে। ফলে এর সমস্ত কপি গায়েব হয়ে যেতে থাকে। ষোল শতকে পোপ সিক্সটাসের পাঠাগারে কেবলমাত্র এর একটি ইতালীয় অনুবাদ পাওয়া যায়। আঠার শতকের শুরুতে জন টোল্যাণ্ড নামক এক ব্যক্তি এ অনুবাদটির

সন্ধান পান। বিভিন্ন হাতে হাতে এটা ১৭৩৮ সালে ভিয়েনার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে এসে পৌছে। ১৯০৭ সালে এটির ইংরেজী অনুবাদ অক্সফোর্ডের ক্লেরিণ্ডন প্রেস থেকে ছাপা হয়। কিন্তু সম্ভবত মুদ্রণের পরপরই ঈসায়ী জগতের চেতনা জাগে যে, এ কিতাবটি তো তাদের ধর্মের শিকড়ই কেটে দেবে। ফলে সংগে সংগেই বাজার থেকে এর সমস্ত কপি তুলে নেয়া হয়। কিন্তু কিভাবে লণ্ডন মিউজিয়ামে এর একটি কপি সংরক্ষিত থেকে যায়। অষ্টাদশ শতকে এর একটি স্প্যানিশ অনুবাদ পাওয়া যেতো কিন্তু তাও এখন গায়েব। কুরআনের ইংরেজী ভাষ্যকার জর্জসীল তার অনুবাদ গ্রন্থে এই বারনাবাসের ইনজীলের উল্লেখ করেছেন। জর্জসীলের লেখা থেকেই মুসলিম বিশ্ব সর্ব প্রথম এই বারনাবাসের ইনজীল সম্পর্কে জানতে পারে। এর আগে বারো তেরো'শো বছরে মুসলমানদের লিখিত হাজার হাজার লাখো লাখো কিতাবে এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

আজ বারনাবাসের ইনজীলের বিরুদ্ধে খৃষ্ট জগতের সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে এই যে, এটা কোন মুসলমানের লেখা। কিন্তু ১৯০০ বছর আগের এই পাণ্ডুলিপিটি আজকের খৃষ্টানদের এ দাবীরও মৃত্যু ঘটাবে। আমরা এর অপেক্ষায় আছি।

৭২
রামের জন্মভূমি কি অযোধ্যায়?

বনী উমাইয়ার শাসন আমলে বাদশাহ ওলীদ ইবনে আবদুল মালিক দামেশকে একটি বিশাল মসজিদ তৈরী করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় জায়গা নিয়ে। মসজিদের জন্য যে জায়গাটি পছন্দ করা হয় সেখানে তার স্থান সংকুলান না হওয়ায় তিনি পাশের গির্জার জমি থেকে কিছু জমি কিনে নিতে চান। কিন্তু গির্জার পুরোহিত জমি দিতে অস্বীকার করেন। পুরোহিত বাদশাহকে বলে পাঠান, স্বেচ্ছায় আমরা এ জমি দিতে পারি না, তবে বাদশাহ যদি জোরপূর্বক জমি দখল করেন তাহলে তাঁর কুষ্ঠ রোগ হবে। কুষ্ঠরোগের ভয় দেখাবার কারণে বাদশাহ ক্ষেপে যান। তিনি জিদের বশবর্তী হয়ে এই বলে জমি দখল করেন যে, দেখি আমার কেমন করে কুষ্ঠ রোগ হয়। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের শাসনামলে খৃষ্টানরা এ বিষয়ে তাঁর কাছে অভিযোগ আনে। তিনি ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের অনুসারী। কাজেই মসজিদের যে অংশ গির্জার জমি নিয়ে তৈরী করা হয়েছিল সেটি তিনি ভেঙে ফেলার হুকুম দেন। গির্জার জমি গির্জাকে ফেরত দেন এবং সরকারী অর্থে গির্জাটি নতুন করে নির্মাণ করিয়ে দেন।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের এ ঘটনাটি ভারতের অযোধ্যায় কথিত রামের জন্মভূমিতে নির্মিত বাবরি মসজিদ প্রসংগে উত্থাপন করতে চাই। চারশো তিরাশি বছর আগে মসজিদটি এখানে নির্মিত হয়। সাম্প্রতিক কালে হিন্দুদের একটি অংশ থেকে এ দাবী উত্থাপিত হয়েছে যে, রামায়ণে কথিত শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি এখানে ছিল এবং সেই সুবাদে যে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল তাকে ভেঙে মসজিদে পরিণত করা হয়েছে। ভারত স্বাধীন হবার পরপরই হিন্দুদের একটি অতি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এ প্রসংগ নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা এটিকে মন্দিরে পরিণত করার দাবী জানায়। তাদের অতি বাড়াবাড়িতে ভীত হয়ে সেক্যুলার ভারত সরকার ১৯৪৯ সালে মসজিদটি তালাবদ্ধ করে দেন। গত বছর স্থানীয় এক আদালতের জজের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মসজিদটির তালা খুলে হিন্দুদের হাওয়ালা করে দেয়া হয়। এরপর থেকেই ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি চরমভাবে বিনষ্ট হয়। অবশ্যই ভারত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সেক্যুলার ভারতে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি কোনদিন ভালো পর্যায়ে ছিল না। হিন্দু-মুসলিম দাংগা সেদেশে নিত্যদিনকার

ব্যাপারে পরিণত হয়ে গেছে। আবার দাংগা করার জন্য হিন্দুদের মধ্যে কয়েকটি মিলিট্যান্ট দলেরও উদ্ভব হয়েছে। তাদের কাজই হচ্ছে ভারতভূমি থেকে মুসলমানদের সংখ্যা কমানো, তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়া এবং হিন্দু ভারতের 'মেন-স্ট্রীম' প্রধান স্রোতের মুখে তাদেরকে ভাসিয়ে দেয়া।

অযোধ্যার বাবরি মসজিদ নিয়ে এই হিন্দু সাম্প্রদায়িক দলগুলোই বাড়াবাড়ি করেছে এবং স্থানীয় আদালত তাদের কাছে নত হয়ে গেছে। নয়তো এই মসজিদ যে সত্যিই রামের জন্মভূমিতে নির্মিত মন্দির ভেঙে করা হয়েছে এর কোন প্রমাণ নেই। এমনকি খোদ রামায়ণের ঐতিহাসিকতাই প্রমাণসিদ্ধ নয়। দিল্লীর ঐতিহাসিক ডঃ আর, এল, শুক্লা তাঁর রামায়ণ সম্পর্কিত এক প্রবন্ধে এমন সব প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, যার ফলে রামায়ণ ও রাম উভয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দেহ জাগে। তিনি লিখেছেন ঃ "রামায়ণে প্রথম দিকে মাত্র ৬ হাজার শ্লোক ছিল। তারপর তা ১২ হাজারে এবং শেষে ২৪ হাজারে পৌঁছে গেছে। এই বৃদ্ধিগুলো কারা করেছেন তা আজো জানা যায়নি। আবার এই শ্লোকগুলো থেকে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়। শ্রীরাম চন্দ্রের যুগ মহাভারতের যুগ থেকে অনেক আগে এবং খৃষ্টপূর্ব আড়াই হাজর বছর বলা হয়। মহাভারতের যুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব এক হাজার বছরে সংঘটিত হয়। তারপর রামায়নে যে স্থানগুলোর উল্লেখ আছে সেখানে জনবসতির নিদর্শন পাওয়ার প্রয়োজন। এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে উত্তর প্রদেশের তিনটি স্থানে খনন কার্য চালানো হয়। ফয়জাবাদ জেলার অযোধ্যায়, এলাহাবাদ থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে তরঙ্গবীরপুরে এবং এলাহাবাদ শহরের ভরদ্বাজ আশ্রমে। আজ থেকে প্রায় ২৫ বছর আগে এই তিনটি স্থানে খননকার্য চালাবার পর সেখানে যে জনবসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে তা বড়জোর খৃষ্টপূর্ব সাতশো অব্দের। এখন যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, এই অযোধ্যা রামের শহর ছিল এবং এখানেই তার জন্ম, তাহলে খৃষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগের রামের সাথে তার কোন মিল নেই।"

দাক্ষিণাত্যের রাজমন্ত্রীর গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ মালাবী ভেংকটাতরনাম তাঁর "রামের ফেরাউন'' নামক গ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্র সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে অদ্ভুত তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি লিখেছেন, রামায়ণের বক্তব্য মতে শ্রীরামচন্দ্রের পিতা রাজা দশরথ ৬০ হাজার বছর রাজত্ব করেন এবং রাম রাজত্ব করেন ১১ হাজার বছর। আর সাধারণ বর্ণনা মতে শ্রীরামচন্দ্রের যুগ ছিল খৃষ্টের জন্মের ২৫ হাজার বছর পূর্বে। তাহলে

এক্ষেত্রে তাঁদের দুই পিতা পুত্রের রাজত্ব কালকে সামনে রাখলে তাদের যুগ হয় আজ থেকে ৯৮ হাজার অর্থাৎ প্রায় এক লাখ বছর আগে। এটা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য?

মিঃ ভেংকটাতরনাম আরো লিখেছেন, "ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো থেকেও শ্রীরামচন্দ্রের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রামায়ণে উল্লেখিত চিত্রকোট, রামটেক, পঞ্চবটী ইত্যাদি স্থানে এমন কোন জিনিস পাওয়া যায়নি যা থেকে শ্রীরামচন্দ্রের কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে। হিন্দুস্তানের এমন কোন প্রদেশ নেই যেখানকার দু'চারটি স্থানে শ্রীরামচন্দ্র পদার্পণ করেননি। তবে বিভিন্নস্থানে শ্রীরামচন্দ্রের নামে যে মন্দিরগুলো আছে ওগুলো পরবর্তীকালে ভক্তদের তৈরী। গোয়াদর থেকে দূরে পূবের দিকে একটি স্থানের নাম 'পর্ণশালা'। এখানে শ্রীরামচন্দ্র অবস্থান করেছিলেন বলা হয়। পর্ণশালা ও পঞ্চবটী এ দু'টি স্থান সম্পর্কে বলা হয়, এখান থেকে রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। এ দাবীগুলো নিছক কাল্পনিক ছাড়া আর কিছুই নয়।"

তিনি আরো লিখেছেন, "দশরথের বাস ছিল কোশলে সরযু নদীর তীরে। রাজধানী ছিল অযোধ্যায়। মনু নিজেই এ শহরটি গড়ে তুলেছিলেন। এ শহরের সুউচ্চ প্রাচীর ছিল। শহর রক্ষার জন্য ছিল চারদিকে বিশাল ও সুগভীর পরিখা। এখানে এমন সব যুদ্ধাস্ত্র ছিল যা একই সাথে এক'শো জনকে হত্যা করতে পারতো। বিরাট বিরাট মহল, সুদৃশ্য মঞ্জিল ও বিশাল ইমারত শহরটিকে স্বপ্নপুরীতে পরিণত করেছিল। তদানীন্তন বিশ্বে অযোধ্যা শহরের কোন নজির ছিল না।" এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ভেংকটাতরনাম লিখেছেন, "অযোধ্যা শহরের শান-শওকত, সৌন্দর্য, বিরাটত্ব ও শক্তিমত্তার যে বর্ণনা রামায়নে পাওয়া যায়, তার প্রমাণ দেবার জন্য একটি ইটও এখানে নেই। অযোধ্যা একটি ছোট্ট গ্রাম। সম্ভবত কোনকালে বিদেশাগত কিছু লোক এখানে বসতি গড়ে তুলেছিল এবং তাদের কাছ থেকেই রামের কাহিনী সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।" রামায়ণের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে তিনি একে ইতিহাস বা ধর্মগ্রন্থ না বলে কবির কাব্য ও কল্প কাহিনী বলাই অধিকতর সংগত বলে দাবী করেছেন।

ডঃ শুক্লা তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে লিখেছেন, "গৌতম বুদ্ধের আমলে অযোধ্যায় যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তার নিদর্শন পাওয়া যায় কিন্তু তার আগের কোন রাষ্ট্রের বা সভ্যতার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কাজেই যারা অযোধ্যার কোন স্থানকে রামের জন্মভূমি বলে বিশ্বাস করে তাদের এই

বিশ্বাসের প্রতি ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব থেকে কোন সমর্থন পাওয়া যাবে না।" মিঃ শুক্লা পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে লিখেছেন যে, "রামায়ণে বর্ণিত রাম ও রাবণের যুদ্ধের কোন নিদর্শনও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে সারা ভারতের কোথাও পাওয়া যায়নি।"

"রামের ফেরাউন" গ্রন্থের লেখক অধ্যক্ষ মালাবী ভেংকটাতরনাম রাম ও রামায়ণের গবেষণায় একটি নতুন ও অদ্ভুত তথ্য পরিবেশন করেছেন। তাঁর মতে "রামায়ণের কাহিনী মিসরের ফেরাউন দ্বিতীয় রামেসাসের কাহিনী থেকে গৃহীত। রাম নামটি মূলত হিন্দী থেকে গৃহীত নয়। বরং এটি সেমেটিক শব্দ। সিরিয়ার এক বাদশাহর নাম ছিল রাম। রামায়ণের দ্বিতীয় বড় চরিত্র হচ্ছে, সীতা। রামায়নের বর্ণনা মতে, রাজা জনক হাল চালাতে গিয়ে লাংগলের ফলায় মাটি থেকে সীতাকে লাভ করেন বলে তার নাম রাখা হয় সীতা। এর অর্থ কোন নারীর গর্ভজাত নয় বরং 'ধরিত্রী' মাতার সন্তান। কিন্তু সীতা আসলে একটি প্রাচীন মিসরীয় নাম। আজো মিসরে বিপুল বিত্ত ও মর্যাদার অধিকারী মহিলাদের নামের শেষে সীতা শব্দ জুড়ে দেয়া হয়। কায়রোর একটি মসজিদের নাম এখনো 'সীতাজেব' দেখা যায়।" 'ভেংকটাতরনাম' এভাবে রামায়ণের বিভিন্ন নামের সাথে মিসরীয় শব্দ ও নামের মিল দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"হিন্দুস্তানের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে এমন কোন আলামত পাওয়া যায় না, যা থেকে প্রমাণ করা যেতে পারে যে, শ্রী রাম চন্দ্রজী এ উপমহাদেশের কোন অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন। বরং এটি একটি মিসরীয় কাহিনী। ভারতীয় হিন্দুদের প্রকৃতি অনুযায়ী একে ভারতীয় ধর্মীয় রঙে রঞ্জিত করা হয়েছে।"

মিঃ ভেংকটাতরনামের এ দাবী কতদূর সত্য তা অবশ্যই গবেষণা সাপেক্ষ, তবে তিনি এ কাহিনী রচনার যে সময়কাল বর্ণনা করেছেন তা নিসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি দাবী করেছেন, রামায়ণের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসংগ এসেছে। যেমন রাম ও লক্ষণ বিশ্বামিত্রের সাথে রাক্ষসদের হত্যা করতে যাওয়ার পথে মিথিলায় পৌছলেন। সেখানে গৌতমের বড় ছেলে সত্যানন্দের সাথে সাক্ষাত হলো। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রামচন্দ্রজী গৌতম বুদ্ধের পরে আগমন করেছেন। এ কথা কি সত্য? অথবা রামায়ণের এ বর্ণনা সত্য নয়?

যদি এই গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধের পুত্রের উল্লেখ থাকে তাহলে বলতে হবে এটি খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের গ্রন্থ। আর যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, খৃষ্টের

জন্মের আড়াই হাজার বছর পূর্বে রামের জন্ম হয়েছিল তাহলে বলতে হয়, রামের জন্মের তিন হাজার বছর পর রামায়ণ লেখা হয়েছিল এবং কোন প্রকার সাক্ষ্য প্রমাণ এ গ্রন্থ লেখায় ভিত্তি হিসেবে কাজ করেনি। কেবলমাত্র শ্রুতির সহায়তায় এবং কিংবদন্তীর ভিত্তিতে এই মহাকাব্যটি রচনা করা হয়। এর পেছনে কোন ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ নেই।”

ভেংকটাতরনাম রামায়ণের স্ববিরোধিতা বর্ণনা করে বলছেন, “রামায়ণে উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রথমে নিরো বাল্মীকিকে এ কাহিনী শোনান। এই কাহিনী শোনাতে গিয়ে তিনি আসল ঘটনার গায় কি পরিমাণ রং লাগিয়েছেন তা বলা কঠিন। আবার বাল্মীকি নিজে হিন্দু ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিদেশাগত আগন্তুক। রামায়ণে বলা হয়েছে, নিরো ছিলেন ব্রহ্মার পুত্র। রামের এই কাহিনী শুনাবার জন্য ব্রহ্মা তাকে আকাশ থেকে বাল্মীকির কাছে পাঠিয়েছিলেন। এ কাহিনী শুনিয়ে নিরো আবার আকাশে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু রামায়নের এক জায়গায় বলা হয়েছে, চিত্রকোটে বাল্মীকির সাথে রামের দেখা হয়েছিল এবং সেখানে রাম তাকে নিজের কাহিনী শুনিয়েছিলেন। সেই কাহিনীই বাল্মীকি রামায়ণে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।”

বর্ণনার এই বৈপরীত্য মূল বিষয়ের ঐতিহাসিক প্রামাণ্যতাকেই দুর্বল করে দেয়। এহেন দুর্বল ভিত্তির ওপর একটি ধর্মীয় বিরোধ সৃষ্টি করা কতদূর সমীচীন হয়েছে, তা ভারতের যথার্থ ধর্মবুদ্ধি ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষের অবশ্যই চিন্তা করা উচিত। বাবরি মসজিদ গত ৪৮৩ বছর থেকে সেখানে আছে। এটা একটা ঐতিহাসিক ও জলজ্যান্ত সত্য। আর রামের জন্মভূমি হওয়ার বিষয়টার পেছনে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। সত্যিই যদি সেখানে রামের জন্মভূমি হতো এবং তার ওপর নির্মিত মন্দির যদি ঐতিহাসিক সত্য হতো, তাহলে নিবন্ধের শুরুতে আমরা বনী উমাইয়া যুগের যে ঘটনাটির কথা বলেছি সে মোতাবিক মুসলমানরা নিজেরাই এ মসজিদটি ভেঙে ফেলতো। কিন্তু এক দল সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগে আপ্লুত ব্যক্তি যেভাবে অন্য ধর্মের অবমাননা এবং তার মাধ্যমে নিজের ধর্মের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা চালাচ্ছে তাকে তো কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ সমর্থন করতে পারে না। এ অবস্থাটি সারা দুনিয়ার এবং বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে হিন্দুস্তানের ধর্মীয় ও জাতীয় ইমেজ ক্ষুণ্ন করবে এতে সন্দেহ নেই।

ইহুদী এমন একটি শব্দ যার সাথে জড়িত রয়েছে যাবতীয় কূটচক্র, ষড়যন্ত্র; চক্রান্ত, প্রতারণা ও গোপন সন্ত্রাস। ইহুদী চক্রান্তের জাল ছড়িয়ে আছে সারা দুনিয়ায়। হাজার হাজার বছর থেকে এ জাতিটি যাযাবরের মতো দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকা চার সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে আরব মুসলমানদের নির্বুদ্ধিতার খেসারত হিসেবে এই যাযাবর জাতিটি ফিলিস্তিনের লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে গৃহহারা করে সেখানে একটা ইহুদী রাষ্ট্র কায়েম করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীদের সবচেয়ে বড় আবাস গড়ে ওঠে। আমেরিকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পলিসি ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণে একথা আজ সবার জানা। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীদের আসল সংখ্যা কত কোন অ-ইহুদী ব্যক্তি এটা বলতে পারবে না। যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রত্যেক জাতির আলাদা আলাদা সংখ্যা জানাতে পারবে কিন্তু ইহুদীদের সংখ্যা জানাতে সক্ষম হবে না। আদমশুমারীর সময় ইহুদী জনসংখ্যার হিসেবটা ইহুদী প্রশাসকদের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ইহুদীরা অনবরত আমেরিকায় আসছে এবং সেখানে বসতি স্থাপন করছে। তাই যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের সঠিক সংখ্যা জানার জন্য মাঝে মধ্যে চেষ্টা করে কিন্তু যখনই এই চেষ্টা শুরু হয় তখনই ওয়াশিংটনের ইহুদী লবি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তথ্য সরবরাহ প্রক্রিয়া মাঝ পথেই থেমে যায়। ইহুদীরা নিজেদের শক্তি লুকিয়ে রাখে। এতেই তাদের কার্যোদ্ধারে সুবিধে হয়। রাজধানী ওয়াশিংটনে ইহুদী প্রভাব এত বেশী শক্তিশালী ও ব্যাপক যে, ইহুদী স্বার্থের পরিপন্থী কোন কিছু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ঘটে যাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

চল্লিশ বছর আগে ইহুদীদের দেশ ত্যাগ করে আমেরিকায় আসা দস্তুরমত একটা ইহুদী কারবারে পরিণত হয়েছিল। একটা ইহুদী সংগঠন এ কারবারটি চালায়। বেশীরভাগ ইউরোপের ইহুদীরাই আমেরিকায় আসে। আর ইউরোপের ইহুদীরা বিপ্লবী হিসেবে খ্যাত। এত বিপুলসংখ্যক ইহুদীর আমেরিকায় পাড়ি জমানোর ফলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। সাধারণ

আমেরিকানদের মধ্যে এখন এ দৃষ্টিভংগী গড়ে উঠছে যে, এই ইহুদীরা ইতিপূর্বে ইউরোপ মহাদেশকে ধ্বংস করার কাজ সম্পন্ন করে এসেছে, এবার আমেরিকার ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে। আমেরিকায় ইহুদীদের গোপন সোসাইটিগুলো ইহুদী পুনর্বাসনের যাবতীয় দায়িত্ব হাতে নিয়েছে।

ইহুদীবাদ একটা বংশ না ধর্ম? এ সম্পর্কে ইহুদীদের দৃষ্টিভংগী কি? ধর্মীয় ভিত্তি ছাড়াও ইহুদীরা নিজেদেরকে একটা স্বতন্ত্র মানবগোষ্ঠী মনে করে। এ সম্পর্কে কিছু আন্তরজাতিক ইহুদী চিন্তাবিদের মতামত এখানে উদ্ধৃত করছি, তা থেকে পাঠক সমাজ এ ব্যাপারে একটা সঠিক ধারণা লাভ করতে পারবেন।

একটি আন্তরজাতিক ইহুদী সংগঠনের সভাপতি (১৯০০-১৯০৪) লিউ এন লেভী লিখছেন ঃ "একজন ইহুদীর মূল চরিত্র কেবল তার ধর্ম থেকেই গড়ে ওঠে না। তার ধর্ম ও বংশকে পরস্পর থেকে আলাদা করা যায় না। ইহুদী আকীদায় বিশ্বাসী ব্যক্তি কেবল আকীদার ভিত্তিতে ইহুদী হয় না। অন্যদিকে একজন জন্মগত ইহুদী চিরকালই ইহুদী সে ইহুদী ধর্মের অনুগত থাক বা না থাক।"

মোসান হোসাইন ইহুদীদের একটি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। ইহুদীবাদের প্রোগ্রামগুলোকে প্রাচীনত্ব থেকে টেনে এনে তাকে আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত করার ক্ষেত্রে তার কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী। তিনি তার "রুম ও ইয়েরুশালেম" গ্রন্থে লিখছেন ঃ "ইহুদী নিছক একটি ধর্মের অনুসারীর নাম নয় বরং এর চাইতে আরো কিছু। যেমন তারা একটি বংশ, একটি গোষ্ঠী ও একটি জাতি।....... সব চাইতে বড় কথা হচ্ছে এই যে, ইহুদী ধর্ম আসলে ইহুদী দেশ প্রেমের নাম।"

আন্তরজাতিক ইহুদী পণ্ডিত ও লেখক সাইমন তার "ধর্ম ও জাতীয়তা গ্রন্থে" দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন ঃ "...... এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে দিতে চাই যে, ইহুদীর ধর্ম হচ্ছে তার জাতিপ্রীতি ও জাতিপূজা এবং স্বজাতিপ্রীতি হচ্ছে তার ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ।"

ইহুদীদের সাথে অতীতে যে সব অসম ব্যবহার করা হয়েছে সে ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে পূর্বোল্লিখিত ঐতিহাসিক ইহুদী ব্যক্তিত্ব মোসান তার গ্রন্থে লিখছেন, "ইহুদী হবার কারণে একজন ইহুদী যে জিনিসটা হাসিল করতে পারে না, ইহুদী জাতি একদিন তা হাসিল করবে। কারণ এটা একটা জাতি। আর এই জাতি অন্য অ-ইহুদী জাতিদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ

করছে, তারা যেন সতর্ক থাকে। কারণ আগামীর সংগ্রামে "তালিকাভুক্ত হবে আর একটি জাতির নাম। সেটা হচ্ছে ইহুদী জাতি।" এ জাতি যে কারোর বন্ধু বা শত্রু হতে পারে, যাকে সে যেভাবে নির্বাচিত করে। দুনিয়ায় ইহুদীদের দু'টো প্রোগ্রাম। একটা তারা অ-ইহুদী জাতিদের দেখাবার ইচ্ছা রাখে আর অন্যটা কেবল ইহুদীদের জন্যই নির্দিষ্ট-এটিই তাদের আসল প্রোগ্রাম। এ প্রোগ্রামটি সফল করার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। এর পেছনে আছে ইহুদীবাদের সমর্থন ও সহযোগিতা। এ প্রোগ্রামটিই ইহুদীদের জাতীয় ও বংশগত স্বাতন্ত্রের ধারক।

ইহুদীবাদ যখন যে কর্মসূচী গ্রহণ করে, তাতে অন্য জাতিরা কি মনে করবে বা তাদের মধ্যে এর কি প্রতিক্রিয়া হবে-এর কোন পরোয়াই ইহুদীরা করে না। ইহুদী নিজেকে নিজের জাতির মালিকানাধীন মনে করে। এই জাতির সাথে সে রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ। কাজেই মতবাদ তার এই সম্পর্কের পথে কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। সে হচ্ছে এই জাতির অতীতের উত্তরাধিকারী এবং তার ভবিষ্যতের রাজনৈতিক এজেন্ট। সে একটি বংশ ও জাতির সাথে সম্পর্ক রাখে। এই পৃথিবীতে সে এমন একটি সাম্রাজ্যের সন্ধানে ফিরছে যা হবে সব সাম্রাজ্যের থেকে বড় ও শক্তিশালী। তার রাজধানী ইয়েরুশালেম (জেরুসালেম) সারা দুনিয়ার ওপর কর্তৃত্ব করবে।"

বেঞ্জামিন ডিসরেইলি ছিলেন বৃটেনের একজন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ছিলেন ইহুদী। এজন্য তিনি গর্ব করতেন। তাঁর একটি বইতে তিনি সাডোনিয়া নামে একটি ইহুদী চরিত্র এনেছেন। সাডোনিয়া চরিত্রকে তিনি এমনভাবে সামনে এনেছেন যার মাধ্যমে এটা সহজেই অনুভব করা যায় যে, তিনি সাডোনিয়াকেই সাধারণ ইহুদীদের প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরতে চান। অবার তার পাশাপাশি আর একটি ইহুদী চরিত্র এনেছেন যার মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো কাপড়ে ঢাকা। সে হচ্ছে প্রটোকলের ইহুদী। তার চার দিকে আছে রহস্যজনক বেড়ী। তার হাতে এমন তার আছে যার সাহায্যে সে মানুষদের যাত্রার পুতুল নাচের মত নাচাচ্ছে।

'মুক্ত চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধি'-এটাও ইহুদী প্রটোকলেরই একটি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে তথাকথিত সব রকমের বাধা-বন্ধন মুক্ত স্বাধীন চিন্তার মাধ্যমে সমাজকে ধ্বংস করে দেয়া। যে সমাজে ইহুদীবাদের স্থান নেই সে সমাজকে ধ্বংস করার ক্ষমতা ইহুদীদের থাকা উচিত, এটাই হচ্ছে আন্তরজাতিক ইহুদীবাদের প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামের আওতায় ইহুদীবাদ সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

৭৪
আধুনিক সভ্যতা তার পূজারীদের গলার ফাঁস

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ মার্শাল বেটন তাঁর জাতির উদ্দেশে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন ঃ "তোমরা নিজেদের ভুলগুলো একটু পরিমাপ করে দেখো। কারণ তোমাদের পাপের পাল্লা অস্বাভাবিক রকম ভারী হয়ে গেছে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধগুলোকে তোমরা চরম নির্দয়ভাবে পদদলিত করেছো। তোমরা সন্তান চাও না। তাদের প্রতি তোমরা বিমুখ। পারিবারিক ব্যবস্থাকেও তোমরা ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছো। তোমরা প্রবৃত্তির দাস। পাগলের মতো তার পেছনে ছুটে চলেছো। এই প্রবৃত্তি পূজা তোমাদের মারাত্মক ধ্বংসের সম্মুখীন করবে। এখনো সময় আছে এই ধ্বংসের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করো। নিজের হাতে নিজের মৃত্যু পরোয়ানা লেখা থেকে বিরত হও।"

মার্শাল বেটন এ কথাগুলো বলেছিলেন আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে। এই চল্লিশ বছরের মধ্যে পানি অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। ফ্রান্সের সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংসের দিকে আরো বেশী এগিয়ে গেছে। সম্প্রতি সেখানকার এক জনমত জরিপে জানা গেছে ফরাসী অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৬২ জন একটি সন্তান লাভের জন্য হা হুতোশ করে মরছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে একটি সাইনবোর্ড লটকানো দেখা যায়। তাতে আছে একটি সুন্দর ফুটফুটে শিশুর ছবি আর তার নীচে লেখা ঃ "শুধু যৌন সম্ভোগের নাম জীবন নয় আমরা প্রকৃতির একটি সুন্দর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রকাশ।"

এ সাইনবোর্ডে ফ্রান্সের পারিবারিক জীবনের ভেতরের ছবি ফুটে উঠেছে। আসল পারিবারিক জীবন বলতে যে কিছুই নেই তা একদম সুস্পষ্ট। সংসারে যদি সন্তান না থাকে এবং মাত্র দু'টি নিছক যৌন জীবের মধ্যেই পারিবারিক জীবন সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তাকে সঠিক অর্থে পারিবারিক জীবন বলা যায় না। এই সাথে আর একটি দিকও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গত চার দশক ধরে পরিবার ছোট করার তথা জন্ম নিয়ন্ত্রণ করার পথে যেভাবে তারা দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলেছে তাতে এই প্রকৃতি বিরোধী পরিকল্পনাটি তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফ্রান্সের একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বড় চমৎকার বলেছেন, "আমরা জন্মশাসন ও স্বাধীন লাগামহীন যৌন উপভোগের মারাত্মক পরিণতি দেখে

নিয়েছি। এখন আমরা এমন দু'টি পথের সংগমস্থলে এসে দাঁড়িয়েছি, যেখান থেকে একটি পথ চলে গিয়েছে পরিচ্ছন্ন পারিবারিক জীবনের দিকে, সেখানে আছে নিশ্চিন্ততা, শান্তি এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক তৃপ্তি। আর একটি পথ চলে গিয়েছে ব্যাপক নৈরাজ্য ও ধ্বংসের দিকে। এখনও সময় আছে বুদ্ধিবাদের অন্ধকারে দিকভ্রান্তের মতো ছুটে চলা মানুষ নিজেকে প্রকৃতির বিধানের হাতে সোপর্দ করে দিয়ে মানসিক প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততার সম্পদ অর্জন করতে পারে, যাকে সে হামেশাই উপেক্ষা করে এসেছে।"

আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন ও ফ্রান্স এ চারটি দেশকে যদি আধুনিক সভ্যতার যথার্থ প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করানো যায় তাহলে মোটেই অতিশয়োক্তি হবে না। এ চারটি দেশই প্রকৃতির আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বুদ্ধিবাদের পথে ছুটে চলেছে। এর ফলে এখন তারা যে মারাত্মক পরিণতির মুখোমুখি হয়েছে এবং যে ক্ষতি ও সর্বনাশ চারদিক থেকে তাদেরকে ঘিরে নিয়েছে, তার হাত থেকে নিস্কৃতি লাভের কোন পথই তারা পাচ্ছে না। মদ পান রাশিয়ার জন্য এখন একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়ার সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের খবর অনুযায়ী প্রতি বছর অতিরিক্ত মদপানের দরুন রাশিয়ার দশ লাখ লোক অকালে প্রাণ হারাচ্ছে। সাইবেরিয়ার একটি রিসার্চ একাডেমী এ সিদ্ধান্তে পৌছেছে "মদপানের এই বদ অভ্যাসের কারণে মাত্র বারো থেকে পনের বছরের মধ্যে আমরা নিজেদের স্বাধীনতাও হারিয়ে ফেলতে পারি।"

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধি মস্কো থেকে খবর দিয়েছেন, বিগত ১লা জুন মস্কোর ৪০০ মদের দোকান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২০০ দোকানকে কেবলমাত্র প্রতিদিন ৫ ঘন্টা খোলা রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে ভদকার দাম শতকরা বিশ থেকে ত্রিশ ভাগ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। একুশ বছরের কম বয়সের লোকদের কাছে মদ বিক্রি করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ভদকা প্রস্তুতকারী ৩০০ কারখানা এখন থেকে ফলের রস তৈরী করবে। টাইমসের প্রতিনিধির মতে রুশী যুবকদের পরিপূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কমিউনিস্ট সরকারের এছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ ছিল না।

চলতি শতকের প্রথম দিকে আমেরিকাও এভাবে একবার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তার জনসমাজকে মদের ধ্বংসকারিতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। এ জন্য কড়া আইন প্রণয়ন করেছিল। প্রকাশ্যে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ হয়েছিল। বহু মদের কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে বিশেষ

ফলোদয় হয়নি। কয়েক বছরের মধ্যে আবার নিষেধাজ্ঞার আইন প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। ফলে বাধভাঙা বন্যার ন্যায় মদের প্রচলন অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে। আজতো মদ ছাড়া আমেরিকান সমাজ ব্যবস্থার কথা কল্পনাই করা যায় না। মদ ছাড়াও অন্যান্য নেশাজাত দ্রব্যগুলো আজকের আমেরিকান যুবক যুবতীদের জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ফলে সমগ্র আমেরিকান জাতিটাই নেশাখোর জাতি হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। অপরাধ প্রবণতা আমেরিকান সমাজদেহকে চতুরদিক থেকে বেষ্টন করে নিয়েছে। অবাধ যৌন জীবন এ সমাজের শান্তি শৃংখলা চিরতরে ধ্বংস করে দিয়েছে। তার ওপর মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এইডস–এর মতো প্রাণসংহারী যৌন ব্যাধি।

ওদিকে জন্ম শাসন ও অবাধ যৌন স্বাধীনতার ফলে ফ্রান্সের সমাজ জীবন নৈরাজ্যের শেষ প্রান্তে পৌছে গেছে। এখান থেকে মুক্তি লাভের আর কোন পথই সে খুঁজে পাচ্ছে না।

আধুনিক সভ্যতা একদিন তার যেসব অবদানের জন্য গর্ব করে বেড়াতো এবং তার পূজারীরা বিগত অন্তত এক শতাব্দীকাল থেকে যে জন্য নিজেদেরকে মহাসৌভাগ্যবান ভেবে আসছিল আর সারা দুনিয়ায় এর প্রসারে এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে আত্মনিয়োগ করেছিল, আজ তারা নিজেরাই একে নিজেদের গলার ফাঁস মনে করতে শুরু করেছে। প্রকৃতির যে আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে তারা আধুনিকতার লক্ষণ মনে করে আসছিল আজ তারই কাছে তাদের হেঁটমাথা হতে হচ্ছে।

এটা কোন নতুন কথা নয়। জাহেলী সভ্যতা সব সময়ই তার পূজারীদেরকে এমনি ভয়াবহ ও প্রাণ সংহারী পরিণতির সম্মুখীন করে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মানুষ এ থেকে শিক্ষা নেয় না। এক ভুলের পরে আর এক ভুল করে যায়। সত্য তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু তাকে গ্রহণ করার সৌভাগ্য তাদের হয় না। তবে জ্ঞানীরা অবশ্য এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। ফলে তারা নিষ্কৃতি পেয়ে যায়। তবে তাদের সংখ্যা অনেক কম।

হলিউডের চিত্রাভিনেত্রীর আক্ষেপ

তিনি হলিউডের একজন সফল অভিনেত্রী। আজ জীবনের পঞ্চাশ বছরে পা রেখে নিজেকে অসহায় মনে করছেন। তার কী নেই? আজো পঞ্চাশ বছর বয়সে তার কিছুরই অভাব নেই। যৌবনকে এখনো ধরে রেখেছেন তার শেষ সীমানায় হলেও বহু কসরত করে। মানুষের যা কিছু চাওয়া–পাওয়ার সবই তিনি অর্জন করেছেন। অঢেল ধন–দৌলত। খুব কম করে হলেও বলা যায় এক রাজার সম্পত্তি। খ্যাতি আকাশ ছুঁইছুঁই করে। মান–মর্যাদার তো সীমা–সরহদ নেই। একটি বিশেষ সার্কেলে বলতে গেলে ভক্তের দল প্রায় তাকে পূজোই করে। কিন্তু জীবনের এতো সব সম্পদ তার হাতের মুঠোয় থাকার পরও তার রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল কর্পূরের মতো। মানসিক প্রশান্তির অনুভূতি থেকে তিনি অবস্থান করছিলেন শত শত মাইল দূরে। যার ফলে জীবন ধারণ তার কাছে দোজখ বাসের রকমফেরই মনে হয়েছে। তার নিজের ভাষায় ঃ

"এখন সব কিছু অসহনীয় হয়ে উঠছে আমার কাছে। রাতের একাকীত্ব আমাকে কুরে কুরে খায়। এই একাকীত্বের অনুভূতি যখন আমার সমগ্র সত্তার ভিত্তিমূল ভীষণভাবে নাড়া দিতে থাকে তখন অনেক সময় আমি নিরুপায়ের মতো চিৎকার করে উঠি। কখনো কখনো সারাটা দিন আমি কেঁদে কেঁদে কাটাই। এখন বেশীর ভাগ দিন আমার এ ভাবেই কেটে যায়।..... পুরুষের অধীনতা মুক্ত হবার ব্যাপারে মেয়েরা এখন অনেক দুর এগিয়ে গেছে। নারী মুক্তি, নারী স্বাধীনতা আন্দোলন বেঁচে থাকে। এ আন্দোলন তাকে আজ একাকীত্বের নির্জন গুহার অভ্যন্তরে ঠেলে দিয়েছে...বেশী বেশী অর্থ উপার্জনের লালসা ও টেলিভিশন এ দু'টি জিনিস আমাদের সমাজের জন্য আযাবে পরিণত হয়েছে। আজ একজনের জন্য অন্যজনের দুঃখ ব্যথায় শরীক হওয়া, তার আকাংখা অনুভূতিকে স্বীকার করে নেয়া ও মর্যাদা দান করা তো দূরের কথা, একজনের সাথে অন্যজনের কথা বলারও সময় নেই।"

এ খেদোক্তি এবং কিছুটা আত্মোপলব্ধি করেছেন সম্প্রতি হলিউডের খ্যাতিমান চিত্র তারকা বরশি বারদু। তিনি ছিলেন অবাধ নারী মুক্তি আন্দোলনের অগ্রসৈনিক। নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও অবাধ যৌনতাকে তিনি

শিল্পের মর্যাদায় অভিসিক্ত করেছিলেন। কিন্তু আজ জীবনের পঞ্চাশটি সিঁড়ি অতিক্রম করার পর তিনি একথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে, নারী মুক্তি আন্দোলন মেয়েদের কাছ থেকে সবকিছুই ছিনিয়ে নিয়েছে। মেয়েরা আজ নিঃস্ব। ঘরে তাদের মর্যাদার আসন নেই আর বাইরের আসরে তারা খেলার পুতুল। অর্থ লুটবার উপকরণ তাদের করায়ত্ত। তারা ইচ্ছে করলে সবকিছু কিনে ফেলতে পারে। কিন্তু মনের শান্তি এবং সৎ ও ভদ্র সংগী এ-তো বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। তার আজকের এই নিঃস্বতার অনুভূতি তিক্ত অভিজ্ঞতার ফল। একজন পুরুষের অধীনতার পাশে আবদ্ধ থাকাকে ঘৃণা করে তিনি আজ জীবনের তিক্ততম উপলব্ধির সম্মুখীন হয়েছেন। নির্জনতা-একাকীত্ব আজ তাকে বন্য শূয়োরের মতো তাড়া করে ফিরছে। এই নিঃসংগতার জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য তিনি কুকুর পুষেছেন। কুকুরকে আদর করেছেন। নিজের মনের সমস্ত কথা তার সাথে বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পোষা কুকুর কখনো মানুষের বদল হতে পারে না।

তিনি অর্থ লুট করাকেই জীবনের লক্ষ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই আজ তার নাম হলিউডের ধনাঢ্য চিত্রাভিনেত্রীদের শীর্ষে। কিন্তু এ অর্থ আজ তার কোন কাজে আসছে না। তাই তিনি বাধ্য হয়ে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। অর্থের লালসা আজ আমাদের সমাজের জন্য আযাবে পরিণত হয়েছে। এটা আজ কেবল বরশি বারদুর একার অনুভূতি নয়, পশ্চিমের সমগ্র সমাজদেহ আজ এই রোগে আক্রান্ত। অর্থ লালসার পাগলা ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরার ক্ষমতা সেখানে কারোর নেই। এ পাগলা ঘোড়া কোথায় যে তাদের নিয়ে যাবে সে খবরও তারা রাখে না। যেমন চিত্রাভিনেত্রী বরশি বারদু আজ জীবনের কোন হদিস পাচ্ছেন না। পরিণত জীবনের শুরুতে সৎ সাথীর সন্ধান করার চাইতে অর্থের পাহাড়ের সন্ধানকেই তিনি লক্ষ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই আজ অসহায়ত্ত ও নিঃসঙ্গতা তার সাথী।

আমাদের দেশে যারা পশ্চিমী জীবন ধারাকে আদর্শ মনে করে দিন-রাত না পাওয়ার বেদনায় আক্ষেপ করতে থাকে, হলিউডের চিত্রাভিনেত্রীর মনের বেদনা তাদের কাছে কতটুকু কদর পাবে জানি না, তবে এ উপলব্ধি তাদেরও আসতে দেরী হবার কথা নয়। বঞ্চনা, অসামঞ্জস্য, লালসা, হৃদয়হীনতা, শোষণ, হাহাকার এই জীবনধারার অনিবার্য পরিণতি। দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা, প্রেম, ভালোবাসা, মানবতা ইত্যাদি মানবিক অনুভূতিগুলো সেখানে অপরিচিত হয়ে পড়েছে। পশ্চিমের সমস্ত সমাজটাই পরিণত হয়েছে একটি যন্ত্রে। আর যন্ত্রের কোন অনুভূতি থাকে না। মানুষ হয়ে গেছে অমানুষ। সংসার

ভেঙে পড়েছে। গৃহের অংগন শান্তির আবাস হবার পরিবর্তে হয়ে উঠেছে নিছক সাময়িক বিশ্রামাগার। রাত হলে কিছু লোক সেখানে এসে আরাম করে মাত্র। বয়স্করা নিজেদের বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত আর ভবিষ্যত বংশধররা তাদের 'আগামীকাল'–এর সন্ধানে দিশেহারা। এতো পাওয়ার পরও এই না পাওয়ার দুঃখ হতাশাই আজকের পশ্চিমা সমাজের ট্রাজেডি।

কিন্তু এর চাইতেও বড় ট্রাজেডির শিকার হয়েছি আমরা। আমাদের কাছে দেবার অনেক কিছু থাকতেও আমরা নিজেদের দেবার সামর্থ ভুলে গিয়ে পশ্চিমের পেছনে দৌড়ে চলেছি। অথচ আল্লাহর বিধান আমাদের কাছে রয়ে গেছে যা মানুষকে দুনিয়ার সমস্ত অভাব থেকে বেনিয়াজ করে দিতে পারে। কিন্তু তার কদর না করে আমরা তাদের পেছনে ছুটে চলছি, যাদের দেবার কোন সামর্থ্য নেই, যারা নিজেরা নিঃস্ব, হতমান। আমাদের নিজেদের সম্পদ ও শক্তির দিকে নজর দেয়া উচিত।

৭৬
ধর্ম পাশ্চাত্য জীবনে নতুন সাড়া জাগিয়েছে

বর্তমান যুগ বিশ্বমানবতার চরম উন্নতির যুগ বলে দাবী করা হয়। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও টেকনোলজিতে বর্তমান বিশ্ব যে উন্নতি লাভ করেছে, তাকে বর্তমান যুগ পরিসরে এক কথায় বিস্ময়কর বলা যায়। মানুষের ইতিহাসের সমস্ত পর্যায় আমাদের সামনে নেই। যতটুকু আছে তার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইতিপূর্বে কোনদিন মানবতা উন্নতির এই পর্যায়ে আরোহণ করেনি। ইতিপূর্বে যেসব বিষয় অসম্ভবের খাতায় লেখা ছিল, যেসব বিষয় নিয়ে মানুষ একদিন কল্পনার জাল বুনতো, তাও আজ সম্ভবপর হয়ে বাস্তবের রূপ নিয়ে মানুষের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পশ্চিমী বিশ্ব বিজ্ঞান ও টেকনোলজিতে যে উন্নতি লাভ করেছে, তাতে আমরা প্রাচ্যের অধিবাসীরা সত্যিই সাংঘাতিকভাবে প্রভাবিত হয়েছি এবং তাদের কাছে আমরা নিজেদেরকে অনেক ছোট মনে করতে শুরু করেছি। তাদের মারণাস্ত্র তৈরীর দুরন্ত প্রতিযোগিতা এবং মানবতাকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করার জন্য নিত্য–নতুন বোমা ও দূরপাল্লার অস্ত্র আবিষ্কার, বিশেষ করে তাদের সাম্প্রতিক কালের মহাশূন্য বিজয়ে ও গ্রহান্তরে অভিযান পরিচালনা এবং দুই পরাশক্তির বৈজ্ঞানিক ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব আজকের বিশ্বের একটি প্রতিষ্ঠিত ভয়াবহ সত্য।

কিন্তু এতসব উন্নতির পরও এমন একটি মহামূল্যবান বস্তু থেকে পাশ্চাত্য বঞ্চিত হয়েছে, যার কোন প্রতিবদল নেই। এ মহাবঞ্চনা তার শত শত বছরের জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, আবিষ্কার, পরিশ্রম ও অভিযান পরিচালনাকে একেবারেই অর্থহীন করে দিয়েছে। বরং উন্নতি ও অগ্রগতির অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে জীবনের একটি দিককে তারা এমনভাবে উপেক্ষা ও অবহেলা করেছে–যার ফলে তাদের সমগ্র জীবনটিই আজ হয়ে উঠেছে অন্তসারশূন্য। জ্ঞান গবেষণা ও বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের মাধ্যমে দুনিয়ার অন্য জাতিদের তারা অনেক কিছুই দিয়েছে কিন্তু নিজেরা বঞ্চিত হয়েছে একটি মহামূল্যবান সম্পদ থেকে। পশ্চিমের বহু সমাজ বিশেষজ্ঞ, চিন্তাবিদ ও গবেষক বারবার তাদের এই মহাবঞ্চনার দিকে পাশ্চাত্যবাসীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। পাশ্চাত্য জীবনের বাইরের চাকচিক্য ও

অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যের আড়ালে যে এক বিরাট অন্ধকার মরুসাগর লালিত হচ্ছে, তার প্রতি তারা বারংবার অংগুলি নির্দেশ করেছেন। পাশ্চাত্য এমন কি হারিয়েছে—যা তার আজকের সমগ্র উন্নতি অগ্রগতিকে অর্থহীন করে দিয়েছে? সে এমন কি মূল্যবান সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যার অভাবে তার হৃদয় অভ্যন্তরে অন্ধকারের পাহাড় জমে উঠেছে? এক কথায়, তার এই হারানো সম্পদটিকে বলা যায় 'ধর্ম'। বিগত কয়েক'শো বছরের উন্নতি ও অগ্রগতির আড়ালে পাশ্চাত্য বিশ্ব তার ধর্মবোধ হারিয়ে বসেছে।

পশ্চিমী দুনিয়ায় খৃষ্টবাদেরই রাজত্ব। খৃষ্টবাদে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সংকীর্ণমনতা এবং তাদের ধর্মীয় প্রভাব প্রতিপত্তির অপব্যবহারের ফলে সাধারণ পর্যায়ে ধর্ম সম্পর্কে চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের অগ্রগতিরও বিরোধিতা করেন। ফলে বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে অগ্রগতির সময় বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পর বিরোধী দুই প্রতিপক্ষ রূপে বিবেচিত হতে থাকে। দু'জন পরস্পরকে শত্রু ভাবতে থাকে। বিজ্ঞানের জগতে এই ধর্ম বিরোধী পরিবেশে পাশ্চাত্য দেশে বহু ধর্মবৈরী দার্শনিকের জন্ম হয়েছে। বহু ধর্ম বিরোধী, জড়বাদী দর্শন ও মতবাদের সূত্রপাত ঘটেছে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে। সেদেশে ধর্ম ও বিজ্ঞানের এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলেছে দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু এমন এক সময়ও ছিল যখন সেখানে আল্লাহ, ধর্ম, আকীদা, বিশ্বাস, আত্মা, আখেরাত ইত্যাদির প্রতি বিদ্রুপবাণ নিক্ষেপ করা হচ্ছিল এবং এই সংগে এগুলোর সপক্ষেও বেশ কিছু আওয়াজও বুলন্দ হচ্ছিল। কিন্তু সেদিকে কান দেবার লোক তখন খুব কমই ছিল। এর ফলে পশ্চিমী জগতের মানুষরা যখন একদিকে বস্তুগত উন্নতির উচ্চ পর্যায় অতিক্রম করছিল তখন অন্যদিকে তাদের ঘটছিল, অনবরত আত্মিক অবনতি। জাগতিক ও বস্তুগত দিক দিয়ে বিপুল উন্নতি সত্ত্বেও পাশ্চাত্যবাসীদের জীবনের এই সুস্পষ্ট বৈপরীত্য তাদেরকে আত্মিক দরিদ্রে পরিণত করে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বিশ্বের মানচিত্রে যেমন পরিবর্তন এসেছে তেমনি মানুষের মনেও এসেছে পরিবর্তন। সারা দুনিয়ার মানুষকে অনেক কিছুই চিন্তা করতে হয়েছে যুদ্ধের ধ্বংসকারিতা সম্পর্কে। মানুষ আত্মসমালোচনায়ও প্রবৃত্ত হয়েছে। নিজেদের অনেক চিন্তা মতবাদ সম্পর্কে তাদের পুনর্বিবেচনা করতে হয়েছে। বিরাট ধ্বংসযজ্ঞের পর ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে বিধ্বস্ত লোকদের আগের অনেক কথাই মনে পড়লো। অনেক ভুলে যাওয়া পরিভাষা, অনেক গভীর তত্ত্বকথা স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠলো। অর্থাৎ আল্লাহ, ধর্ম,

আখেরাত, আত্মা, আধ্যাত্মিক জীবন ইত্যাদি পুরাতন কথাগুলো তাদের মনে নতুন করে দোলা দিল। এ শব্দগুলোর তাৎপর্য এবং মানব জীবনে এগুলোর গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু হলো। এই আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মোপলব্ধির মধ্যে পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ সমাজ বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, পাশ্চাত্যের অবনতি শুরু হয়ে গেছে। এই অবনতি ঠেকাবার আর কোন পথ নেই। প্রাচ্য থেকেই হবে এখন আশার নতুন সূর্যোদয়। বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক টয়েনবী থেকে শুরু করে পরবর্তী বহু পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ প্রাচ্যের চিন্তাধারা ও জীবন যাপন পদ্ধতিকেই পাশ্চাত্যের মুক্তির দিশারী বলে চিহ্নিত করেছেন। বিগত কয়েক দশক থেকে পাশ্চাত্যের বহু চিন্তাবিদ ও শ্রেষ্ঠ লেখক ধর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে অনবরত লিখে আসছেন। বর্তমানে সেখানে লেখা হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মের ওপর বইপত্র। এ বইপত্রও সংখ্যায় নেহাত কম নয়। এর মধ্যে কিছু বইপত্র যে ধর্মের বিরুদ্ধে যাচ্ছে না তাও বলা যায় না। কিছু কিছু লেখক ধর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাকে ভাববাদ, কুসংস্কার ইত্যাদিও বলছেন। কিন্তু তাদের অনুভূতি ও অধ্যয়ন যথেষ্ট গভীর নয়। তবে ধর্ম সম্পর্কে লিখিত অধিকাংশ বইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় একটা গভীর অনুসন্ধিৎসা ও সত্যকে তালাশ করার একটা চিরন্তন আকাংখার অনুসরণ।

লর্ড নর্থবর্ণ আজকের পাশ্চাত্য বিশ্বের এমনি একজন গভীর মননশীল চিন্তাবিদ। তার একটি বই বের হয়েছে RELIGION IN MODERN WORLD. ধর্ম সম্পর্কে চমৎকার বইগুলোর মধ্যে এটিও একটি। এ বইতে আধুনিক মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সমস্যাগুলোই আলোচিত হয়েছে। যেমন ধরুন-ধর্ম, আধুনিকতা, আল্লাহর উদ্দেশ্য, ঐতিহ্য ও ঐতিহ্যহীনতা, আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক ও প্রাচীন আর্টের অধপতন ও আজকের যুগের গভীরতা, আদর্শিক ধ্বংসকারিতা এবং আমি কে? একশো দশ পৃষ্ঠার এ বইয়ের পরিসর ক্ষুদ্র হলেও আলোচনায় গভীর চিন্তা ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। বইটির প্রত্যেকটি বাক্য আন্তরিকতার জারক রসে সিঞ্চিত। ফলে তা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনে প্রভাব বিস্তার করার এবং তার সংশয়ের জটিল গ্রন্থিগুলো খুলে ফেলার জন্য সতত সচেষ্ট। এ বইটি পাঠককে এমন এক আলোর সন্ধান দেয় যে আলো ছাড়া মানুষ তার জীবন পথে চলার ক্ষমতা রাখে না এবং যে আলো তার জীবনে প্রবাহিত করে শান্তির অমিয় ধারা।

পাশ্চাত্যবাসীদের এই নতুন উপলব্ধি প্রতিদিন গভীরতর হতে চলেছে। ধর্মবোধ ও আত্মিক উন্নতি ছাড়া জাগতিক সকল উন্নতিই আজ তাদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। তাই খৃষ্ট ধর্ম ছাড়া আল্লাহর সত্য দীন ইসলামের প্রতিও তাদের আগ্রহ প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

মুসলমানদের হাজার বছরের রাজতান্ত্রিক শাসনে ধীরে ধীরে ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি থেকে বিচ্যুতি বেড়ে গেলেও মূলগতভাবে ইসলামী চিন্তা ও জীবনধারার সাথে তুলনামূলকভাবে মুসলমানদের যোগ ছিল বেশী। কিন্তু বিগত তিন চারশো বছরে পাশ্চাত্য চিন্তা ও সভ্যতার উত্থান ও বিস্তার মুসলমানদের পতনশীল চিন্তা ও জীবনধারায় বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে নিয়ে বিশ শতকের প্রথম দিকে অর্ধ শতকের বেশী সময় মুসলিম চিন্তায় এক ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে। এ মহাবিপর্যয়ের রেশ এখনো চলছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো মুসলিম দেশে ইসলামী আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। এর মাধ্যমে ইসলামী পুনরুজ্জীবনের কাজ চলছে। এখন ইসলামী জীবনদর্শন ও চিন্তাদর্শের ভিত্তিতে মুসলমানদের চিন্তাদর্শন ও জীবনধারা পুনরগঠনের সময় এসে গেছে।